হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

সম্পাদনায়

গীতা দত্ত

সুখময় মুখোপাধ্যায়

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

কলেজ স্ট্রিট মার্কেট।। কলকাতা সাত

প্রকাশিকা
শ্রীমতী গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ-১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট ❑ কলকাতা ৭০০ ০০৭

লিপি বিন্যাস
এ পি সি লেজার
৬১ মহাত্মা গান্ধী রোড ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর
শ্রী কার্তিক কুণ্ডু ও শ্রী তরুণ কুণ্ডু
ইউনিক কলার প্রিন্টার্স
২০এ পটুয়াটোলা লেন ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
রমেন আচার্য

প্রথম এশিয়া সংস্করণ
শ্রাবণ ৩০, ১৪০৪ ❑ আগস্ট ১৫, ১৯৯৭

মূল্য
৫০.০০

জন্ম
সেপ্টেম্বর ২, ১৮৮৮

মৃত্যু
এপ্রিল ১৮, ১৯৬৩

সূচীপত্র

মুখ আর মুখোশ

প্রথম

মানুষ চুরি

চঞ্চল হয়ে উঠেছে কলকাতা শহর।

কলকাতার চঞ্চলতা কিছু নতুন কথা নয়। বসন্ত, ডেঙ্গু, ফ্লু, বেরিবেরি, প্লেগ, কলেরা ও টাইফয়েড প্রভৃতি জীবাণু প্রায়ই এখানে বেড়াতে এসে তাকে করে তোলে চঞ্চল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামেও সে অচঞ্চল থাকতে পারে না। আজকাল উড়োজাহাজি-বোমার ভয়েও সে চঞ্চল হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। কিন্তু আমি ও রকম চঞ্চলতার কথা বলছি না।

মাসখানেক আগে শ্যামলপুরের বিখ্যাত জমিদার কমলকান্ত রায়চৌধুরী কলকাতায় এসেছিলেন বড়দিনের উৎসব দেখবার জন্যে। তাঁর একমাত্র পুত্রের নাম বিমলাকান্ত। বয়স দশ বৎসর। একদিন সকালে সে বাড়ি সংলগ্ন বাগানে খেলা করছিল। তারপর অদৃশ্য হয়েছে হঠাৎ।

লোহার ব্যবসায়ে বাবু পতিতপাবন নন্দী ক্রোড়পতি হয়েছেন বলে বিখ্যাত। তাঁর টাকা অসংখ্য বটে, কিন্তু সন্তান সংখ্যা মাত্র দুটি। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলেটির বয়স মোটে আট বৎসর। পাড়ারই ইস্কুলে সে পড়ে। কিন্তু একদিন ইস্কুলে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। তার পরদিনও না, তারও পরদিনও না। তারপর বিশ দিন কেটে গিয়েছে, আজ পর্যন্ত তার আর কোন খবরই পাওয়া যায়নি।

দুর্জয়-গড়ের করদ মহারাজা স্যর সুরেন্দ্রপ্রতাপ সিংহ বাহাদুর বড়দিনে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হচ্ছেন যুবরাজ বিজয়প্রতাপ, বয়স চার বৎসর মাত্র। গত পরশু রাত্রে ধাত্রী গঙ্গাবাঈ যুবরাজকে নিয়ে ঘুমোতে যায়। কিন্তু গেল-কাল সকালে উঠে দেখে, বিছানায় যুবরাজ নেই। সারা রাজবাড়ি খুঁজেও যুবরাজকে পাওয়া যায়নি। রাত্রির অন্ধকার যুবরাজকে যেন নিঃশেষে গ্রাস করে ফেলেছে! গঙ্গাবাঈ কোনরকম সন্দেহের অতীত। তার বয়স ষাট বৎসর; ওর মধ্যে পঞ্চাশ বৎসর কাটিয়েছে সে দুর্জয়-গড়ের প্রাসাদে। বর্তমান মহারাজা পর্যন্ত তার হাতেই মানুষ।

সুতরাং অকারণেই কলকাতা চঞ্চল হয়ে ওঠেনি। এক মাসের মধ্যে তিনটি শ্রেষ্ঠ পরিবারের বংশধর অদৃশ্য! চারিদিকে বিষম সাড়া পড়ে গিয়েছে। ধনীরা শঙ্কিত, জনসাধারণ চমকিত, পুলিসরা ব্যতিব্যস্ত!

খবরের কাগজরা যো পেয়ে পুলিসের বিরুদ্ধে মহা আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। এমনকি গুজব শোনা যাচ্ছে যে, দুর্জয়-গড়ের যুবরাজের অন্তর্ধানের পর গভর্নমেণ্টেরও টনক নড়েছে। সরকারের তরফ থেকে পুলিসের উপরে এসেছে নাকি জোর হুম্‌কি!

কিন্তু পুলিস নতুন কোন তথ্যই আবিষ্কার করতে পারেনি। সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের তিন-তিনটি বংশধর একমাসের ভিতরে নিরুদ্দেশ হয়েছে—ব্যস, এইখানেই সমস্ত খোঁজাখুঁজির শেষ। তারা কেন অদৃশ্য হয়েছে, কেমন করে অদৃশ্য হয়েছে এবং অদৃশ্য হয়ে আছেই বা কোথায়, এ সমস্তই রহস্যের ঘোর মায়াজালে ঢাকা।

কলকাতায় মাঝে মাঝে ছেলেধরার উৎপাত হয় শুনি। কিন্তু ছেলেধরারা ধনী গরিব বাছে বলে শুনিনি। তারা ছেলে ধরত নির্বিচারে এবং গরিবেরই ছেলে চুরি করবার সুযোগ পেত বেশি। এও শোনা কথা যে, সন্ন্যাসীরা নিজেদের চ্যালার সংখ্যা বাড়াবার ও বেদেরা নিজেদের দলবৃদ্ধি করবার জন্যেই ওভাবে ছেলে চুরি করে। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছেলেধরার গুজব সব বাজে হুজুগ বলে প্রমাণিত হয়েছে, এ সত্যও কারুর জানতে বাকি নেই।

কিন্তু এবারের ঘটনাগুলো নতুন রকম। প্রথমত, চুরি যাচ্ছে কেবল ধনীদেরই সন্তান। দ্বিতীয়ত, তিনটি ছেলেই আপন আপন পিতার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। তৃতীয়ত, কেউ যে এদের ধরে নিয়ে গিয়েছে এমন কোন প্রমাণও নেই।

হেমন্ত নিজের চিরদিনের অভ্যাস মতো ইজিচেয়ারে অর্ধশয়ান অবস্থায় দুই চোখ মুদে আমার কথা ও যুক্তি শুনে যাচ্ছিল নীরবে, হঠাৎ ঘরের কোণে ফোন-যন্ত্র বেজে উঠল ক্রিং ক্রিং ক্রিং!

হেমন্ত যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চেয়ার ত্যাগ করে ঘরের কোণে গিয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে বললে, "হ্যালো! কে? ও! হ্যাঁ, আমি অধম হেমন্তই! প্রণত হই অ্যাসিস্টেন্ট্ কমিশনার সাহেব! আপনার পদোন্নতির জন্যে 'কনগ্রাচুলেশন!' তারপর? ব্যাপার কি, হঠাৎ 'ফোনে'র সাহায্য নিয়েছেন কেন? নতুন কোন মামলা হাতে নেবার ইচ্ছা আমার আছে কিনা? দেখুন, মানুষের আশা হচ্ছে অনন্ত, কিন্তু সাধ্য সীমাবদ্ধ। মামলাটা কি, আগে শুনি। দুর্জয়-গড়ের হারা-যুবরাজের মামলা? না মশাই, স্বাধীনভাবে অত বড় মামলা হাতে নিতে আমার ভয় হচ্ছে। আপনাদের আড়ালে থেকে কাজ করি, সে হচ্ছে আলাদা কথা; কারণ সেটা দাবা-বোড়ের উপর চাল বলে দেওয়ার মতন সোজা। আপনারা থাকতে আমি কেন? কি বললেন, খোদ মহারাজের ইচ্ছে, মামলাটা আমি গ্রহণ করি? বলেন কি, আমি এত বড় বিখ্যাত লোক হয়ে গেছি? ... আমার কোন আপত্তি শুনবেন না? দুর্জয়-গড়ের প্রাইভেট সেক্রেটারির সঙ্গে দশ মিনিটের মধ্যে এখানে এসে আমাকে আক্রমণ করবেন? বেশ, আক্রমণ করুন, ক্ষতি নেই; কিন্তু আত্মরক্ষা করবার জন্যে যদি 'না' বলবার প্রয়োজন হয়, তাহলে আমার মুখ বন্ধ থাকবে না, এটা কিন্তু আগে থাকতেই বলে রাখলুম!"

দ্বিতীয়

দুর্জয়-গড়ের মামলা

রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে হেমন্ত আমার কাছে এসে বললে, "রবীন, সব শুনলে তো?"

"হ্যাঁ। পুলিসের সতীশবাবু তাহলে তোমার ঘাড়েই মামলাটা চাপাতে চান?"

হেমন্ত জবাব দিলে না। নিজের চেয়ারে বসে পড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবতে লাগল। তারপর বললে, "এ মামলাটা ঘাড়ে নেওয়া কি আমার পক্ষে উচিত হবে?"

"কেন হবে না?"

"স্বাধীনভাবে কখনও কাজ বা এ রকম মামলা নিয়ে কখনও নাড়াচাড়া করিনি।"

—"তাতে কি হয়েছে, শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্!"

—"তুমি ভুল করছ রবীন! আমি ঠিক গোয়েন্দা নই, অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্র। যদিও এই বিশেষ বিজ্ঞানটিকে আমি গ্রহণ করেছি একশ্রেণীর আর্ট হিসাবেই। হয়তো তুমি বলবে বিজ্ঞানের সঙ্গে আর্টের বা কলার সম্পর্ক নেই, কিন্তু ভুলে যেও না যেন, প্রাচীন ভারতে চৌর্যবৃত্তিকেও চৌষট্টি কলার অন্যতম কলা বলে গ্রহণ করা হত। চুরি করা যদি আর্ট হয়, চোর ধরাও আর্ট হবে না কেন? সতরাং এক হিসাবে আমি আর্টেরই সেবক। গোয়েন্দারূপে নাম কেনবার জন্যে আমার মনে একটুও লোভ নেই—যদিও অপরাধ-বিজ্ঞান হচ্ছে আমার একমাত্র hobby বা ব্যসন! পুলিসের সঙ্গে থাকি, কেননা হাতেনাতে পরীক্ষা করবার সুযোগ পাই এইমাত্র! পেশাদার গোয়েন্দার মতন দুর্জয়-গড়ের মহারাজ বাহাদুরের হুকুম তামিল করতে যাব কেন?"

"হেমন্ত আরও কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাড়ির সামনে রাস্তায় একখানা মোটর এসে দাঁড়ানোর শব্দ শুনে চুপ মেরে গেল।

মিনিট খানেক পরেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার সতীশবাবুর সঙ্গে একটি সাহেবি পোশাক পরা ভদ্রলোক—তাঁর মুখখানি হাসিখুশিমাখা, সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা। বয়স চল্লিশের ভিতরেই।

সতীশবাবু বললেন, "মিঃ গাঙ্গুলি, ইনিই হচ্ছেন হেমন্তবাবু, আর উনি ওঁর বন্ধু রবীনবাবু।...

... হেমন্তবাবু, ইনি হচ্ছেন মিঃ গাঙ্গুলি, দুর্জয়-গড়ের মহারাজা বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারি।"

অভিবাদনের পালা শেষ হল।

মিঃ গাঙ্গুলি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, "হেমন্তবাবু আপনার বয়স এত অল্প! এই বয়সেই আপনি এমন নাম কিনেছেন!"

হেমন্ত হাসিমুখে বললে, "আমি যে নাম কিনেছি, আমার পক্ষেই এটা আশ্চর্য সংবাদ!"

মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, "বিলক্ষণ! আপনি নাম না কিনলে মহারাজা বাহাদুর আপনাকে নিযুক্ত করবার জন্যে এত বেশি আগ্রহ প্রকাশ করতেন না।"

মিঃ গাঙ্গুলি সরলভাবে হেমন্তের সুখ্যাতি করবার জন্যেই কথাগুলো বললেন, কিন্তু ফল হল উল্টো। হেমন্তের মুখ লাল হয়ে উঠল। রূঢ়স্বরে সে বললে, "নিযুক্ত? নিযুক্ত মানে কি?"

মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, "যুবরাজের মামলাটা মহারাজা বাহাদুর আপনার হাতেই অর্পণ করতে চান। এজন্যে তিনি প্রচুর পারিশ্রমিক দিতে রাজি আছেন। মামলার কিনারা হলে যথেষ্ট পুরস্কারও—"

ক্রুদ্ধস্বরে বাধা দিয়ে হেমন্ত বলে উঠল, "ধন্যবাদ! মিঃ গাঙ্গুলি, মহারাজা বাহাদুরকে গিয়ে জানাবেন, হেমন্ত চৌধুরী জীবনে পারিশ্রমিক বা পুরস্কারের লোভে কোন কাজ করেনি! সতীশবাবু, এ মামলার সঙ্গে আমি কোন সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছা করি না।"

সতীশবাবু ভাল করেই হেমন্তকে চিনতেন, তিনি বেশ বুঝলেন তার ঘা লেগেছে কোথায়। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "মিঃ গাঙ্গুলি, হেমন্তবাবু আমাদের মতন পেশাদার নন, উনি এ লাইনে এসেছেন স্রেফ শখের খাতিরে, টাকার লোভে কিছু করেন না!"

মিঃ গাঙ্গুলি অপরাধীর মত সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, "মাপ করবেন হেমন্তবাবু, আমি না জেনে আপনার সেন্টিমেন্টে আঘাত দিয়েছি।"

মিঃ গাঙ্গুলির বিনীত মুখ ও ভীত কথা শুনে এক মুহূর্তে হেমন্তের রাগ জল হয়ে গেল। সে হো হো করে হেসে উঠে বললে, "মিঃ গাঙ্গুলি, কোন ভয় নেই, আমার সেন্টিমেন্ট আপনার আঘাত সামলে নিয়েছে।... ওরে মধু, জলদি চা নিয়ে আয় রে, মিঃ গাঙ্গুলিকে বুঝিয়ে দে, তিনি কোন অসভ্য গোঁয়ারগোবিন্দের পাল্লায় এসে পড়েননি!"

অনতিবিলম্বেই মধু এসে টেবিলের উপরে চায়ের সরঞ্জাম ও খাবারের থালা সাজিয়ে দিয়ে গেল।

চা-পর্ব শেষ হলে পর হেমন্ত বললে, "মিঃ গাঙ্গুলি, খবরের কাগজে যুবরাজের অন্তর্ধান হওয়ার যে বিবরণ বেরিয়েছে, তার উপরে আমরা নির্ভর করতে পারি কি?"

—"অনায়াসে। এমনকি কাগজওয়ালারা আমাদের নতুন কিছু বলবার ফাঁক রাখেনি।"

—"ফাঁক নিশ্চয়ই আছে। কারণ কাগজওয়ালাদের কথা মানলে বিশ্বাস করতে হয় যে, যুবরাজের রক্ত-মাংসের দেহ সকলের অগোচরে হঠাৎ হাওয়া হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছে।"

সতীশবাবু হেসে বললেন, "না, অতটা বিশ্বাস করবার দরকার নেই। কারণ ঘটনাস্থলে আমি নিজে গিয়েছি। মহারাজা বাহাদুর গড়িয়াহাটা রোডের একখানা খুব মস্ত বাগানবাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। যুবরাজের ঘর বাড়ির শেষ প্রান্তে, দোতলায়। বাড়ির চারিদিকে আট ফুট উঁচু পাঁচিল। একে এই 'ব্ল্যাক-আউটে'র অন্ধকার, তায় কুয়াশা ভরা শীতের রাত। তার উপরে বাগানটাও পুরনো গাছপালায় ঝুপসী। বাইরের কোন লোক অনায়াসেই পাঁচিল টপকে সকলের অগোচরে যুবরাজের ঘরের তলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে।"

মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, "কিন্তু দোতলায় যুবরাজের ঘরের ভিতরে সে ঢুকবে কেমন করে?"

—"অত্যন্ত সহজে।"

—"সহজে? আপনি কি ভুলে যাচ্ছেন, গঙ্গাবাঈ বলেছে, ঘরে ঢুকে সে দরজায় খিল লাগিয়ে দিয়েছিল? আর সকালে উঠে খিল খুলেছিল নিজের হাতেই?"

—"গঙ্গাবাঈয়ের সাবধানতা হয়েছিল একচক্ষু হরিণের মতো। যুবরাজের ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন 'বাথরুমে'র দরজাটা ছিল খোলা। বাগান থেকে মেথর আসবার জন্যে 'বাথরুমে'র পিছনে যে কাঠের সিঁড়িটা ছিল, বাইরের যে কোন লোক সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে প্রথমে 'বাথরুমে,' তারপর যুবরাজের ঘরে ঢুকতে পারে।"

হেমন্ত বললে, "যাক, যুবরাজের অন্তর্ধানের রহস্যটা যখন পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন এতদিন পরে আমার আর ঘটনাস্থলে যাবার দরকার নেই। এখন কথা হচ্ছে, এ চুরি করলে কে?"

সতীশবাবু বললেন, "অন্য সময় হলে আমি রাজবাড়ির লোককেই সন্দেহ করতুম, কিন্তু আপাতত সেটা করতে পারছি না।"

হেমন্ত বললে, "কেন?"

—"এই মাসেই এর আগে কলকাতায় একই রকম আরও দুটো ঘটনা হয়ে গেছে। ও দুটো ঘটনা যখন ঘটে, দুর্জয়-গড়ের মহারাজা বাহাদুর তখন কলকাতায় পদার্পণ করেননি। সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে, শহরে এমন একদল দুষ্টের আবির্ভাব হয়েছে, ছেলে-চুরি করাই হচ্ছে যাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আমার মতে, এই তিনটে ঘটনা একই দলের কীর্তি।"

—"আমিও আপনার মতে সায় দি। কিন্তু চোর-চরিত্রের একটা রহস্য আমরা সকলেই জানি। প্রত্যেক শ্রেণীর চোর নিজের বিভাগ ছাড়া অন্য বিভাগে হাত দিতে চায় না। যারা সাইকেল চুরি করে, বার বার ধরা পড়েও তারা চিরদিনই সাইকেল-চোরই থেকে যায়। আর একদলের বাঁধা অভ্যাস, রাতে গৃহস্থের ঘরে ঢুকে যা কিছু পাওয়া যায় চুরি করে পালানো। এমনি নানা বিভাগের নানা বিশেষজ্ঞ চোর আছে—কদাচ তারা আপন আপন অভ্যাস ত্যাগ করে। কিন্তু এরকম ছেলে-চোরের দল এদেশে নতুন নয় কি?"

মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, "শুনেছি, আমেরিকায় এ রকম ছেলে-চোরের উৎপাত অত্যন্ত বেশি!"

সতীশবাবু বললেন, "হ্যাঁ, কাগজে আমিও পড়েছি বটে।"

হেমন্ত বললে, "সতীশবাবু আপনি কল্পনা করতে পারবেন না যে, আমেরিকার ধনকুবেররা এই সব ছেলে-চোরের ভয়ে কতটা তটস্থ হয়ে থাকে! তাদের ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে মাইনে করা প্রাইভেট ডিটেকটিভরা। তবু প্রায় নিত্যই শোনা যায়, এক এক ধনকুবেরের ছেলে চুরি যাচ্ছে আর চোরেদের কাছ থেকে চিঠি আসছে—হয় এত টাকা দাও, নয় তোমার ছেলেকে মেরে ফেলব!"

সতীশবাবু বললেন, "কিন্তু আমাদের এই চোরের দলের উদ্দেশ্য কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তিন তিনটি ধনীর বংশধর চুরি গেল, কিন্তু কোনক্ষেত্রেই নিষ্ক্রয়ের টাকা আদায় করবার জন্যে চিঠি আসেনি!"

হেমন্ত বললে, "এখনও আসে নি বটে, কিন্তু শীঘ্রই আসবে বোধ হয়।"

—"এ কথা কেন বলছেন?"

—"আমার যা বিশ্বাস, শুনুন বলি। এই ছেলে-চুরিগুলো যে একজনের কাজ নয়, সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। কারণ লক্ষ্য করলেই আন্দাজ করা যায়, প্রত্যেক ক্ষেত্রে গৃহস্থদের অভ্যাস প্রভৃতির দিকে ভাল করে নজর রেখেই কাজ করা হয়েছে। এজন্যে দীর্ঘ কাল আর একাধিক লোকের দরকার। কিন্তু মূলে আছে যে একজনেরই মস্তিষ্ক তাতেও আর সন্দেহ নেই। সে নিশ্চয়ই এদেশে নতুন, কিংবা অপরাধের ক্ষেত্রে নেমেছে এই প্রথম। কারণ এ শ্রেণীর অপরাধ কলকাতায় আগে ছিল না। সেই লোকটিই একদল লোক সংগ্রহ করে বেছে বেছে ছেলে চুরি আরম্ভ করেছে। তার বাছাইয়ের মধ্যেও তীক্ষ্ণদৃষ্টির পরিচয় আছে। গরিবের ছেলে নয়, সাধারণ ধনীর ছেলেও নয়—যারা অদৃশ্য হয়েছে তারা প্রত্যেকেই পিতার একমাত্র পুত্র। এই নির্বাচন ব্যাপারেও একমাত্র মস্তিষ্কের সন্ধান পাওয়া যায়। হ্যাঁ, সতীশবাবুর একটা কথা মানতেই হবে। এ চোর দুর্জয়-গড়ের রাজবাড়ি সম্পর্কীয় লোক না হতেও পারে। কারণ মহারাজা সদলবলে কলকাতায় আসবার অনেক আগেই ঠিক একই রকম ট্রেডমার্ক-মারা আরও দুটো ছেলে চুরি হয়ে গেছে। সতীশবাবু বলছেন, চোরের উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু আমার মতে, চেষ্টা করলেই সেটা বোঝা যায়। এই ছেলে-চোরদের দলপতি বড়ই চতুর ব্যক্তি। অপরাধ-ক্ষেত্রে সে নতুন পথ অবলম্বন করেছে বলেই সন্দেহ হচ্ছে, হয়তো সে রীতিমতো শিক্ষিত ব্যক্তি। এখনও সে যে নিজের উদ্দেশ্য জাহির করেনি, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, পুলিসকে সে গোলকধাধায় ফেলে রাখতে চায়। চোর যে নিষ্ক্রয়ের টাকা আদায়ের লোভেই

চুরি করেছে এ সত্য গোড়াতেই প্রকাশ করতে সে রাজি নয়। কারণ এই সূক্ষ্মবুদ্ধি শিক্ষিত চোর জানে, প্রথমেই পুলিস আর জনসাধারণ ছেলে-চুরির উদ্দেশ্য ধরে ফেললে, কেবল তার স্বার্থসিদ্ধির পথই সংকীর্ণ হয়ে আসবে না, তার ধরা পড়বার সম্ভাবনাও থাকবে যথেষ্ট। তাই সে পুলিস আর জনসাধারণের অন্ধতা দূর করতে চায়নি। কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই জানবেন, আজ হোক—কাল হোক, চোরের উদ্দেশ্য আর বেশিদিন গোপন হয়ে থাকবে না। সতীশবাবু, আজ এই পর্যন্ত। আমাকে আরও কিছু ভাববার সময় দিন। কাল সকালে একবার বেড়াতে বেড়াতে এদিকে আসতে পারবেন? আপনার সঙ্গে আমার গোপন পরামর্শ আছে।''

তৃতীয়

'কোড'

পরের দিন সকাল বেলায় চা-পানের পর হেমন্ত অন্যান্য দিনের মতন আমার সঙ্গে গল্প করলে না, ইজিচেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে দুই চোখ মুদে ফেললে। বুঝলুম, নতুন মামলাটা নিয়ে সে এখন মনে মনে জল্পনা-কল্পনায় নিযুক্ত।

টেবিলের উপর থেকে ''বিশ্বদর্পণ'' পত্রিকাখানা তুলে নিলুম। সমস্ত কাগজখানার উপরে চোখ বুলিয়ে গেলুম, কিন্তু পড়বার মতন খবরের একান্ত অভাব। এমনকি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যুদ্ধ বেধেছে ইউরোপে, তারও খবরগুলো কী একঘেয়ে! প্রতিদিনই যুদ্ধের খবর পড়ি আর মনে হয়, যেন কতকগুলো বাঁধা বুলিকেই বারংবার উল্টেপাল্টে ব্যবহার করে টাটকা খবর বলে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে।

বাংলা কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভের রচনা পাঠ করা সময়ের অপব্যবহার মাত্র। তার ভাষা ভাব যুক্তি সমস্তই জাহির করে দেয় যে, সম্পাদক প্রাণপণে কলম চালিয়ে গেছেন কেবলমাত্র পেটের দায়ে বাধ্য হয়ে। রোজ তাঁকে লিখতে হবেই, কারণ সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলো হচ্ছে সংবাদপত্রের 'শোভার্থে' এবং পাদপূরণের জন্যে।

তারপর বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় দৃষ্টিপাত করলুম। আমার মতে বাংলা সংবাদপত্রের সবচেয়ে সুখপাঠ্য বিষয় থাকে তার বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠাগুলোয়। তার প্রধান কারণ বোধহয় বাংলার কাগুজে লেখক বা সহকারী সম্পাদকদের মসীকলঙ্কিত কলমগুলো এ বিভাগে অবাধ বিচরণ করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত।

ছত্রে ছত্রে কী বৈচিত্র্য! মানুষের মনোবৃত্তির কতরকম পরিচয়! কেউ বলছেন, চার আনায় এক ভরি সোনা বিক্রি করবেন! কেউ বা এমন উদার যে, ট্যাঁকের কড়ি ফেলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করবেন যে কোন দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ! কেউ প্রচার করছেন, তিনি বুড়োকে ছোঁড়া করবার উপায় আবিষ্কার করে ফেলেছেন! কোথাও বৃদ্ধ পিতা পলাতক পুত্রকে অন্বেষণ করছেন। কোথাও প্রাচীন বর তৃতীয় পক্ষের বউ পাবার জন্যে বলছেন, তিনি বরপণ চান না!...এসব পড়তে পড়তে চোখের সামনে কত রঙের কত মজার ছবি জেগে ওঠে! মনে হয়, দুনিয়া কি অপূর্ব!

হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপনের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। সেটি এই :

"রাজকুমার, তুমি মোহন-বাবুকে দ্বীপবাড়িতে লইয়া উপস্থিত হইও। তাহার সঙ্গে পরে উৎসবের কর্তব্য, বাবুরা পত্রে সমস্ত জানাইবেন।"

ভাষাটা লাগল কেমন কটমট, আড়ষ্ট। দেশে ডাকঘর ও সুলভ ডাকটিকিট থাকতে কেউ এমন বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থ আর সময় নষ্ট করতে চায় কেন? সাধারণ পত্র তো এই খবরের কাগজের আগেই যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছতে পারত! বিজ্ঞাপনদাতাদের নির্বুদ্ধিতা দেখে নিজের মনেই বললুম, "আশ্চর্য!"

হেমন্ত চোখ খুলে বললে, "কি আশ্চর্য, রবীন? আবার নতুন ছেলে চুরি গেল না কি?"

—"না, কে একটা লোক কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজের নির্বুদ্ধিতা জাহির করেছে।"

—"দেখি" বলে হেমন্ত হাত বাড়ালে, কাগজখানা আমি তার দিকে এগিয়ে দিলুম।

হেমন্ত বিজ্ঞাপনটার দিকে তাকিয়ে প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট কাল স্থির ও নীরব হয়ে বসে রইল।

আমি বলুলম, "কি হে, তোমার ভাব দেখলে মনে হয়, তুমি যেন মহাকাব্যের রস আস্বাদন করছ!"

হেমন্ত সোজা হয়ে উঠে বসে বললে, "তাই করছি রবীন, তাই করছি! তবে কাব্য নয়, নাটক!"

—"নাটক?"

—"হ্যাঁ, একটি অপূর্ব নাটকের অভিনেতাদের কথা ভাবছি।"

—"ওই বিজ্ঞাপন দেখে?"

—"এটি সাধারণ বিজ্ঞাপন নয়।"

—"তবে?"

—"এটি হচ্ছে 'কোড'-এ অর্থাৎ সাঙ্কেতিক শব্দে লেখা একখানি পত্র।"

—"কী বলছ তুমি?"

—"পৃথিবীতে কতরকম পদ্ধতিতে সাঙ্কেতিক লিপি রচনা করা যেতে পারে, সে সম্বন্ধে খানকয় বই আমার লাইব্রেরিতে আছে। এই সাঙ্কেতিক লিপিতে খুব সহজ একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।"

—"আমাকে বুঝিয়ে দাও।"

—"এই সাঙ্কেতিক লিপিতে প্রত্যেক শব্দের পরের শব্দকে ত্যাগ করলেই আসল অর্থ প্রকাশ পাবে। এর বিরামচিহ্নগুলো—অর্থাৎ কমা, দাঁড়ি প্রভৃতি ধর্তব্য নয়, ওগুলো ব্যবহার করা হয়েছে কেবল বাইরের চোখকে ঠকাবার জন্যে। এখন পড়ে দেখ বুঝতে পার কি না!"

কাগজখানা নিয়ে পড়লুম :

"রাজকুমার মোহন-দ্বীপবাড়িতে উপস্থিত। তাহার পরে কর্তব্য পত্রে জানাইবেন।"

বললুম, "হেমন্ত, কথাগুলোর মানে বোঝা যাচ্ছে বটে। কিন্তু এই কথাগুলো বলবার জন্যে সাঙ্কেতিক শব্দের প্রয়োজন হল কেন?"

হেমন্ত ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে বললে, "এখনই ঠিক স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি না। তবে খানিকটা আন্দাজ করলে ক্ষতি নেই। 'রাজকুমার' অর্থে না হয় ধরলুম রাজার কুমার

কিন্তু 'মোহন-দ্বীপবাড়ি' বলতে কি বোঝাতে পারে? ওটা কি কোন স্থান বা গ্রামের নাম? তা---"

ধাঁ করে আমার মাথায় একটা সন্দেহ খেলে গেল, তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে আমি বলে উঠলুম, "হেমন্ত! তুমি কি বলতে চাও, দুর্জয়-গড়ের যুবরাজের অর্ন্তধানের সঙ্গে এই সাঙ্কেতিক পত্রের কোন সম্পর্ক আছে?"

—"এখনও অতটা নিশ্চিত হতে পারিনি। তবে যুবরাজ অদৃশ্য হয়েছেন আজ তিনদিন আগে। এর মধ্যেই সাঙ্কেতিক লিপিতে 'রাজকুমার' শব্দটি দেখে মনে খানিকটা খটকা লাগছে বইকি! চিঠিখানা পড়লে মনে হয়, কেউ যেন কারুকে গোপনে জানাতে চাইছে—রাজপুত্রকে আমরা মোহন-দ্বীপবাড়িতে এনে হাজির করেছি। এর পর আমরা কি করব আপনি পত্রের দ্বারা জানাবেন। রবীন, আমার এ অনুমান অসঙ্গত কিনা, তা জানবার কোনই উপায় নেই।"

আমি বললুম, "কিন্তু ডাকঘর থাকতে এভাবে চিঠি লেখা কেন?"

—"ওরা বোধহয় ডাকঘরকে নিরাপদ মনে করে না। হয়তো ভাবে, ডাকঘরের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পুলিসের যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয়।"

—"যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তার সঙ্গে পত্রপ্রেরক নিজে মুখোমুখি দেখা করেও তো সব বলতে পারে?"

—"তাও হয়তো নিরাপদ নয়। ধর, দলপতিকেই সব জানানো দরকার। কিন্তু দলপতি থাকতে চায় দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সকলের চোখের আড়ালে। যে শ্রেণীর সন্দেহজনক লোক তার পরামর্শে যুবরাজকে চুরি করেছে, ও শ্রেণীর সঙ্গে প্রকাশ্যে সম্পর্ক রেখে সে পুলিসের দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চায় না।...রবীন, আমাদের অনুমান যদি ভুল না হয় তাহলে বলতে হবে যে, বাংলা দেশের এই আধুনিক ছেলেধরা বিলাতি ক্রিমিনালদের অনুসরণ করতে চায়। বিলাতি অপরাধীরাও এইভাবে সাঙ্কেতিক লিপি লিখে খবরের কাগজের সাহায্যে পরস্পরের সঙ্গে কথা চালাচালি করে।...কিন্তু, কিন্তু, 'মোহন-দ্বীপবাড়ি' কোথায়?"

—"ও নাম এর আগে আমি কখনও শুনিনি।"

—"হুঁ; দ্বীপ...দ্বীপ— এ শব্দটার সঙ্গে যেন জলের সম্পর্ক আছে। 'দ্বীপবাড়ি' মানে কি? দ্বীপের মধ্যে কোন বাড়ি? তাহলে কথাটা কি এই দাঁড়াবে—অগ্রদ্বীপ বা কাকদ্বীপের মতন মোহন নামে দ্বীপের মধ্যেকার কোন বাড়িতে আছেন এক রাজকুমার? কি বল হে?"

—"হয়তো তাই।"

—"ধেৎ, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করাও বিড়ম্বনা, তুমি নিজে কিছু মাথা ঘামাবে না, খালি করবে আমার প্রতিধ্বনি!"

—"তার বেশি সামর্থ আমার তো নেই ভাই!"

হেমন্ত চিন্তিতমুখে কিছুক্ষণ মৌন হয়ে রইল। তারপর হঠাৎ সমুজ্জ্বল মুখে বলে উঠল, "ঠিক, ঠিক! পত্রপ্রেরক কারুর কাছে জানতে চেয়েছে, অতঃপর কি করা কর্তব্য—কেমন?"

—"হ্যাঁ।"

—"তাহলে ওই খবরের কাগজের স্তম্ভেই এর উত্তরটাও তো প্রকাশিত হতে পারে?"

—"সম্ভব।"

—"রবীন, তুমি জানো, আমাদের বিশেষ বন্ধু চিন্তাহরণ চক্রবর্তী হচ্ছে 'বিশ্বদর্পণে'র সম্পাদক?"

—"তা আবার জানিনা, প্রত্যেক বছরেই 'বিশ্বদর্পণে'র বিশেষ বিশেষ সংখ্যার জন্যে আমাকে কবিতা আর গল্প লিখতে হয়!"

—"তবে চিন্তাহরণই এবারে তার নামের সার্থকতা প্রমাণিত করবে।"

—"মানে?"

—"আমাদের চিন্তা হরণ করবে। অর্থাৎ এই সাঙ্কেতিক লিপির উত্তর 'বিশ্বদর্পণে' এলেই সেখানা আমাদের হস্তগত হবে।"

—"কিন্তু তাহলে কি চিন্তাহরণের সম্পাদকীয় কর্তব্যপালনে ত্রুটি হবে না?"

—"আরে রেখে দাও তোমার ও সব ছেঁদো কথা! এমন বিপজ্জনক অপরাধী গ্রেপ্তারে সাহায্য করলে তার পুণ্য হবে হে, পুণ্য হবে! চললুম আমি চিন্তাহরণের কাছে!"

চতুর্থ

মোহন নামক দ্বীপ

হেমন্ত যখন বিশ্বদর্পণ কার্যালয় থেকে ফিরে এল, তখন বিপুল পুলকে নৃত্য করছে তার দুই হাসিমাখা চক্ষু!

বললুম, "কি হে, ভারি খুশি যে!"

হেমন্ত ধপাস করে তার ইজিচেয়ারের উপর বসে পড়ে বললে, "চেয়েছিলুম মেঘ, পেয়ে গেলুম জল!"

—"অর্থাৎ?"

—"শোনো। ভেবেছিলুম, চিন্তাহরণকে আজ খালি ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে বলে আসব যে, এ ধরনের কোন সাঙ্কেতিক পত্র এলেই সে যেন তার কথাগুলো লিখে নিয়ে মূল চিঠিখানা আমাকে দেয়। কারণ এত তাড়াতাড়ি উত্তর আসবার কল্পনা আমি করিনি। কিন্তু আমি যাবার মিনিট পাঁচেক আগেই একজন দারোয়ান এসে সাঙ্কেতিক লিপির উত্তর আর বিজ্ঞাপনের টাকা দিয়ে গেছে! যদি আর একটু আগে যেতে পারতুম!"

—"তাহলে কি হত?"

—"আমিও যেতে পারতুম দারোয়ানের পিছনে পিছনে। তার ঠিকানা পেলে তো আর ভাবনাই ছিল না, তবে যেটুকু পেয়েছি তাই-ই যথেষ্ট!"

উত্তরটা দেখবার জন্যে আমি সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিলুম। হেমন্ত আমার হাতে দিলে একখানা খুব পুরু, খুব বড় আর খুব দামী খাম। তার ভিতরে ছিল এই চিঠি :

"রাজকুমার, নব-দ্বীপেই জবান-বন্দী দেওয়া হউক। জানিও, তোমার এই কলিকাতায় ছাপাখানার কাজ বন্ধ নাই।"

—"পড়লে?"

—"হুঁ। কিন্তু নবদ্বীপেই সব গুলিয়ে যাচ্ছে যে।"

"কিচ্ছু গুলোবে না। নব দ্বীপ আর জবান বন্দীর মাঝে হাইফেন আছে দেখছ না, তার মানে 'নব' আর 'জবান' আলাদা আলাদা শব্দ বলে ধরা হয়েছে। এইবার একটা অন্তর বাজে শব্দ ফেলে দিয়ে পড় দেখি!"

এবারে পড়লুম :

"রাজকুমার দ্বীপেই বন্দী হউক। তোমার কলিকাতায় কাজ নাই।"

—"রবীন, দুটো বিজ্ঞাপনেরই পাঠ উদ্ধার করলে তো? এখন তোমার মত কি?"

আমি উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলুম, "বন্ধু, তোমাকে 'বন্ধু' বলে ডাকতে পারাও সৌভাগ্য! ধন্য তোমার সূক্ষ্মদৃষ্টি! এই বিজ্ঞাপনের প্রথমটা হাজার হাজার লোকের চোখে পড়েছে, তাদের মধ্যে কত পুলিসের লোকও আছে—যারা চোর ধরবার জন্যে মনে মনে খুঁজে বেড়াচ্ছে সাত-পৃথিবী! কিন্তু পাঠোদ্ধার করতে পেরেছ একমাত্র তুমি!"

—"আমাকে একেবারে সপ্তম স্বর্গে তুলে দিও না রবীন, পৃথিবীর জ্যান্তো মানুষকে স্বর্গে পাঠানো শুভাকাঙ্ক্ষীর কাজ নয়। আগেই বলেছি এ 'কোড'টা হচ্ছে অত্যন্ত সহজ। যে কোন লোক লক্ষ্য করলেই আসল অর্থ আবিষ্কার করতে পারে। কিন্তু তা না পারবার একমাত্র কারণ হবে, অধিকাংশ লোকই বিজ্ঞাপনটা হয়তো পড়বেই না, যারা পড়বে তারাও এর গূঢ় অর্থ বোঝবার চেষ্টা করবে না।...এখন কাজের কথা হোক। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, আমার অনুমানই সত্য। বিজ্ঞাপনের রাজকুমারই হচ্ছে দুর্জয়-গড়ের যুবরাজ?"

—"তাতে আর সন্দেহই নেই।"

—"আর যুবরাজকে কোন দ্বীপে বন্দী করে রাখা হয়েছে। সম্ভবত তার নাম মোহন-দ্বীপ।"

—"তারপর?"

—"তারপর আরও কিছু জানতে চাও তো, ওই চিঠির কাগজ আর খামখানা পরীক্ষা করো।"

খাম আর কাগজখানা বার বার উল্টে-পাল্টে দেখে আমি বললুম, "বৃথা চেষ্টা করে হাস্যাস্পদ হতে ইচ্ছা করি না। যা বলবার, তুমিই বল।"

—"উত্তম। প্রথমে দেখো, খাম আর কাগজ কত পুরু আর দামী। গৃহস্থ তো দূরের কথা, বাংলা দেশের বড় বড় ধনী পর্যন্ত ও রকম দামী খাম-কাগজ ব্যবহার করে না। যে ওই চিঠি লিখেছে সে ধনী কিনা জানি না, কিন্তু সে যে অসাধারণ শৌখিন মানুষ তাতে আর সন্দেহ নেই। এটাও বোঝা যাচ্ছে, সাধারণ অপরাধীর মতন সে নিম্নস্তরের লোকও নয়। কেমন?"

—"মানলুম।"

—"চোখ আর আলোর মাঝখানে রেখে কাগজখানা পরীক্ষা করো।"

ভিতরে সাদা অক্ষর ফুটে উঠল। বললুম, "লেখা রয়েছে Made in California!"

—"হুঁ। আমি যতদূর জানি, ক্যালিফোর্নিয়ায় তৈরি ও রকম খাম আর চিঠির কাগজ কলকাতায় পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে ভাল করে খোঁজ নিয়ে সন্দেহ দূর করব। আপাতত ধরে নেওয়া যাক, এই খাম আর কাগজ কলকাতার নয়।"

—"তাতে কি বোঝায়?"

—"তাতে এই বোঝায় যে, ছেলে-চোরদের দলপতি আমেরিকা প্রত্যাগত।"

—"তুমি কোন প্রমাণে এই পত্রলেখককে দলপতি ধরে নিচ্ছ?"

—"এই লোকটা দলপতি না হলে, প্রথম পত্রের লেখক এর কাছে তার কর্তব্য কি জানতে চাইত না।"

—"ঠিক!"

—"এখন কি দাঁড়াল দেখা যাক। আমেরিকা থেকে কলকাতায় এমন একজন লোক ফিরে এসেছে, যে ধনী আর খুব শৌখিন। আমেরিকায় kidnapping বা ধনীর ছেলে চুরি করা হচ্ছে একটা অত্যন্ত চলতি অপরাধ।—বছরে বছরে সেখানে এমনই কত ছেলেই যে চুরি যায় তার সংখ্যা নেই। সেই দুষ্ট বুদ্ধি মাথায় নিয়ে আমেরিকা ফেরৎ এই লোকটি কলকাতায় এসে এক নূতন রকম অপরাধের সৃষ্টি করেছে। সে সাহেব বা ভারতের অন্য জাতের লোক নয়, কারণ বাংলায় চিঠি লিখতে পারে। নিশ্চয়ই সে ভদ্রলোক আর শিক্ষিত। সে নিজের একটি দল গঠন করেছে। খুব সম্ভব এই দলের অধিকাংশ লোকই পাকা আর দাগী অপরাধী বা নিম্নশ্রেণীর সন্দেহজনক লোক, কারণ দলপতি প্রকাশ্যে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছুক নয়, পুলিসের নজরে পড়বার ভয়ে।"

আমি চমৎকৃত কণ্ঠে বললুম, "একটি তিন-চার লাইনের বিজ্ঞাপন তোমাকে এত কথা জানিয়ে দিলে!"

হেমন্ত মাথা নেড়ে বললে, "কিন্তু এ সমস্তই মেঘের প্রাসাদ ভাই, মেঘের প্রাসাদ! বাস্তবের এক ঝড়ে এরা যে কোন মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে! এসব এখনও প্রমাণরূপে ব্যবহার করা অসম্ভব, কারণ পরিণামে হয়তো দেখা যাবে, এর অনেক কিছুই আসল ব্যাপারের সঙ্গে মিলছে না!"

আমি বললুম, "তবু আশা করি তুমি অনেকটা অগ্রসর হয়েছ।"

—"হয়তো এগিয়ে গিয়েছি,—কিন্তু অন্ধকারের ভিতরে। কে এই আমেরিকা ফেরৎ লোক? মোহন-দ্বীপ কোথায়?... ঠিক, ঠিক! দেখ তো 'গেজেটিয়ার'খানা খুঁজে!"

তখনই বই এনে খুঁজে দেখলুম। কিন্তু ভারতের কোথাও মোহন-দ্বীপের নাম পাওয়া গেল না।

হেমন্ত বললে, "হয়তো ওটা স্থানীয় নাম। কিংবা ছেলে-চোরের দল কোন বিশেষ স্থানকে নিজেদের মধ্যে ওই নামে ডাকে।"

বৈঠকখানার বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

হেমন্ত বললে, "সাবধান রবীন! তুমি বড় পেট-আলগা! বোধহয় সতীশবাবু আসছেন, তাঁর কাছে এখন কোন কথা নয়—কারণ এখনও আমি নিজেই নিশ্চিত হইনি!"

পঞ্চম

ঘন ঘন সাদা মোটর

হ্যাঁ, সতীশবাবুই বটে। ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হেমন্তবাবু, ভেবেচিন্তে হদিশ পেলেন কিছু?"

হেমন্ত হাসতে হাসতে বললে, "হদিশ? হুঁ-উ, পেয়েছি বইকি!"

—"কি?"

—"হদিশ পেয়েছি কল্পনার—যেটা কবিবর রবীনেরই একচেটে।"

—"বুঝলুম না।"

—"রবীনের মতন আমি কবিতা লিখছি না বটে, তবে কল্পনা-ঠাকুরাণীর আঁচল ধরে বাছা বাছা স্বপনের ছবি দেখছি। তাতে আমার সময় কাটছে, কিন্তু পুলিসের কোন কাজে তারা লাগবে না।"

আসন গ্রহণ করে সতীশবাবু বললেন, "কিন্তু আমরা বহু কষ্টে দু'একটি তথ্য আবিষ্কার করেছি; দেখুন, আপনার কাজে লাগে কিনা!"

—"ধন্যবাদ। আমি উৎকর্ণ হয়ে রইলুম।"

—"যে রাত্রে দুর্জয়-গড়ের যুবরাজ অন্তর্হিত হন, ঘাঁটির পাহারাওয়ালা দেখেছিল, রাত তিনটের সময়ে একখানা সাদা রঙের বড় আর ঢাকা-মোটরগাড়ি গড়িয়াহাটা রোড দিয়ে দক্ষিণ দিকে ছুটে যাচ্ছে।"

—"এটা খুব বড় তথ্য নয়।"

—"না। তারপর রাত প্রায় শ'-তিনটের সময়ে ঠিক ওইরকম একখানা বড়, সাদা রঙের আর ঢাকা গাড়ি দেখেছিল টালিগঞ্জের কাছে আর এক পাহারাওয়ালা।"

—"তারপর?"

—"রাত সাড়ে তিনটের কাছাকাছি ডায়মন্ড হারবার রোডে অবিকল ওইরকম একখানা গাড়ি যাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে।"

—"সাদা রঙের গাড়ি?"

—"হ্যাঁ। তারপর রাত চারটের পর বাঁসড়ার কাছেও এক চৌকিদার ওইরকম একখানা গাড়ি যেতে দেখেছে।"

—"তারপর, তারপর?" হেমন্তের কণ্ঠ উত্তেজিত।

—"ভোরবেলায় দেখা যায়, ক্যানিং-এর দিক থেকে ওইরকম একখানা সাদা গাড়ি ফিরে আসছে। গাড়ির ভিতরে ছিল কেবল ড্রাইভার। সেখানা ট্যাক্সি।"

হেমন্ত দাঁড়িয়ে উঠে সাগ্রহে বললে, "সেই ট্যাক্সির কোন খোঁজ পেয়েছেন?"

—"না। তার নম্বর জানা যায়নি। তবে অনুসন্ধান চলছে।"

—"এই তথ্যটাকে আপনি সন্দেহজনক মনে করছেন কেন?"

—"রাত তিনটের পর থেকে সকাল পর্যন্ত, এই সময়টুকুর ভিতরে ঘটনাস্থলের কাছ থেকে ক্যানিং পর্যন্ত চার-চারবার দেখা গেছে একইরকম সাদা রঙের বড় গাড়ি। ওসব জায়গায় অত রাতে একে তো গাড়ি প্রায়ই চলে না, তার উপরে সাদা ট্যাক্সিও খুব সাধারণ নয়। সুতরাং সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক নয় কি?"

—"নিশ্চয়, নিশ্চয়! সতীশবাবু, ওই ট্যাক্সির ড্রাইভারকে দেখবার জন্যে আমারও দুই চক্ষু তৃষিত হয়েছে!... হুঁ, ক্যানিং ক্যানিং! গাড়িখানা সকালবেলায় ক্যানিংয়ের দিক থেকে ফিরছিল?"

—"হ্যাঁ।"

—"তারপরেই আরম্ভ সুন্দরবনের জলপথ, না সতীশবাবু?"

—"হ্যাঁ। সে জলপথ সুন্দরবনের বুকের ভিতর দিয়ে একেবারে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পৌঁছেছে।"

—"আচ্ছা, আসুন তাহলে আবার কল্পনার মালা গাঁথা যাক—এবারে দু'জনে মিলে।"

—"তার মানে?"

—"প্রথমে না হয় ধরেই নেওয়া যাক, অপরাধীরা দুর্জয়-গড়ের যুবরাজকে নিয়ে ওই ট্যাক্সিতে চড়েই পালাচ্ছিল। ধরুন তারা ক্যানিংয়েই গিয়ে নেমেছে। আপনি কি মনে করেন, তারা এখনও সেখানেই আছে?"

—"না। ক্যানিং, কলকাতা নয়। তার সমস্তটা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে। কিন্তু কোথাও অপরাধীদের পাত্তা পাওয়া যায়নি।"

—"ধরুন, স্থলপথ ছেড়ে অপরাধীরা অবলম্বন করেছে জলপথ। কিন্তু জলপথে তারা কোথায় যেতে পারে?"

সতীশবাবু সচকিত স্বরে বললেন, "তাই তো হেমন্তবাবু, আপনার এ ইঙ্গিতটা যে অত্যন্ত মূল্যবান! এটা তো আমরা ভেবে দেখিনি!"

—"তারা কোথায় যেতে পারে? সমুদ্রে?"

—"সমুদ্রে গিয়ে তাদের লাভ? নৌকায় চড়ে অকূলে ভাসবার জন্যে তারা যুবরাজকে চুরি করেনি!"

—"তবে?"

—"হয়তো তারা কোন দ্বীপে-টিপে গিয়ে উঠেছে, কিংবা জলপথে খানিকটা এগিয়ে পাশের কোন গাঁয়ে-টায়ে নেমে পড়েছে।"

—"আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তারা উঠেছে কোন দ্বীপের উপরেই।"

—"আপনার দৃঢ়বিশ্বাসের কারণ কি?"

—"আমি প্রমাণ পেয়েছি। অকাট্য প্রমাণ!"

—"বলেন কি মশাই! এতক্ষণ তো আমায় কিছুই বলেননি?"

—"বলিনি, তার কারণ এতক্ষণ আমার প্রমাণকে অকাট্য বলে মনে করতে পারিনি।"

হেমন্ত তখন একে একে 'বিশ্বদর্পণে'র সেই বিজ্ঞাপন কাহিনীর সমস্তটা বর্ণনা করলে। অপরাধীদের দলপতি সম্বন্ধে তার ধারণাও গোপন রাখলে না।

প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে সতীশবাবু বলে উঠলেন, "বাহাদুর হেমন্তবাবু, বাহাদুর! দলে দলে পুলিস দেশে দেশে ছুটোছুটি করে মরছে, আর আপনি এই ছোট্ট বৈঠকখানার চার দেওয়ালের মাঝখানে ইজিচেয়ারে বসে এর মধ্যেই এতখানি অগ্রসর হতে পেরেছেন!"

—"না মশাই, আমাকে একবার ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে 'বিশ্বদর্পণে'র আপিসে ছুটতে হয়েছিল!"

—"ওকে আবার ছোটা বলে নাকি? ও তো হাওয়া খেতে যাওয়া!"

আমি বললুম, "কিন্তু মোহন-দ্বীপ কোথায়?"

সতীশবাবু বললেন, "ও দ্বীপের নাম আমিও এই প্রথম শুনলুম।"

হেমন্ত বললে, "সমুদ্রের কাছে সুন্দরবনের নদীর মোহনায় আমি ছোটবড় অনেক দ্বীপ আছে। ছেলে-চোরের দল হয়তো ওদেরই মধ্যে একটা কোন অনামা দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে আর নিজেদের মধ্যে তাকে ডাকতে শুরু করেছে এই নতুন নামে।"

"খুব সম্ভব তাই। কিন্তু ওখানকার সমস্ত দ্বীপের ভিতর থেকে এই বিশেষ দ্বীপটিকে আবিষ্কার করা তো বড় চারটিখানি কথা নয়!"

"না। তার ওপরে ওভাবে খোঁজাখুঁজি করলে বিপদের সম্ভাবনা আছে।"

"কি বিপদ?"

"অপরাধীরা একবার যদি সন্দেহ করে যে, পুলিসের সন্দেহ গিয়েছে ওই দিকেই, তাহলে যুবরাজকে হত্যা করে তাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ লুপ্ত করে দ্বীপ থেকে সরে পালাতে পারে!"

"তবেই তো!"

"তার চেয়ে আর এক উপায়ে খোঁজ নেওয়া যাক। মনে হচ্ছে ছেলে-চোররা প্রায়ই ক্যানিং থেকে নৌকো ভাড়া নিয়ে ওই দ্বীপে যায়। আমার বিশ্বাস, ক্যানিংয়ের মাঝিদের কাছে ওখানে সন্ধান নিলে মোহন-দ্বীপের পাত্তা পাওয়া অসম্ভব নয়।"

সতীশবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, "ঠিক, ঠিক, ঠিক!"

"সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় চলুক ছেলে-চোরদের সর্দারের সন্ধান। কি বলেন?"

"আমাকে আর জিজ্ঞাসা করছেন কেন? যা বলবার তা তো আপনিই বাতলে দিচ্ছেন?"

"কিন্তু আপাতত আমাদের আবিষ্কার আমাদের মধ্যেই ধামাচাপা থাক।"

ষষ্ঠ

দুর্জয়-গড়ের উদারতা

তিনদিন কেটে গেল। ছেলে-চোরদের সম্বন্ধে আর নতুন কিছুই জানা গেল না।

হেমন্তের সমস্ত মস্তিষ্ক-জগৎ জুড়ে বিরাজ করছে আমেরিকা ফেরৎ এক অদেখা অজানা [illegible] ব্যক্তি এবং মোহন-নামক কোন অচেনা দ্বীপ!

কিন্তু অনেক মাথা খাটিয়েও কোনরকম সুরাহা হল না; আমেরিকার ভদ্রলোক করতে লাগলেন পুরোদস্তুর অজ্ঞাতবাস এবং মোহন-দ্বীপ হয়ে রইল রূপকথারই মায়া-দ্বীপের মতন [illegible]।

এর মধ্যে মিঃ গাঙ্গুলির আর্বিভাব হচ্ছে এবেলা-ওবেলা। দোটানায় পড়ে ভদ্রলোকের '[illegible]' বড়ই কাহিল হয়ে উঠেছে। ওদিকে পুত্রশোকাতুর মহারাজা, আর এদিকে অচল অটল হেমন্ত। মহারাজা যতই ব্যস্ত হয়ে মিঃ গাঙ্গুলিকে পাঠিয়ে দেন নতুন কোন আশাপ্রদ তথ্য পাবার জন্যে, হেমন্ত শোনায় ততই নিরাশার কথা, কিংবা কখনও কখনও হয়ে যায় অক্টারলনি মনুমেন্টের মতন নিস্তব্ধ। বেশি পীড়াপীড়ি করলে শান্ত মুখে ফুটিয়ে তোলে দ্য ভিঞ্চির আঁকা মোনালিসার হাসি!

কাল বৈকালে এসে মিঃ গাঙ্গুলি একটা চমকপ্রদ সংবাদ দিয়ে গেছেন।

দুর্জয়-গড়ের মহারাজা বাহাদুর পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। যুবরাজের সন্ধান যে দিতে পারবে ওই পুরস্কার হবে তারই প্রাপ্য।

হেমন্ত বললেন, "মিঃ গাঙ্গুলি, দুর্জয়-গড়ের বার্ষিক আয় কত?"

—"কুড়ি লক্ষ টাকা।"

—"মহারাজ তাহলে দুর্জয়-গড়ের যুবরাজের মূল্য স্থির করেছেন, পঁচিশ হাজার টাকা?"

—"পঁচিশ হাজার টাকা! একি বড় দুটিখানি কথা!" গাঙ্গুলি বললেন, দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতন বিস্ফারিত করে।

—"দেখুন মিঃ গাঙ্গুলি, পুরস্কারের ওই পঁচিশ হাজার টাকার ওপরে আমার লোভ হচ্ছে না, এ কথা বললে মিথ্যা বলা হবে। কিন্তু যদি কেউ অর্থলোভে যুবরাজকে চুরি করে থাকে তাহলে ওই পঁচিশ হাজার টাকাকে সে তুচ্ছ মনে করবে বোধহয়!"

—"আমি কিন্তু তা মনে করতে পারছি না মশাই! সাধ হচ্ছে, আপনার মতন শখের ডিটেকটিভ সেজে আমিও যুবরাজের সন্ধানে কোমর বেঁধে লেগে যাই! আমার মতে পঁচিশ হাজার টাকাই জীবনকে রঙিন করে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট!"

—"মোটেই নয়, মোটেই নয়! যারা যুবরাজকে চুরি করেছে তারা যদি নিষ্ক্রয় আদায় করতে চায়, তাহলে চেয়ে বসবে হয়তো পাঁচ লক্ষ টাকা!"

প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় গাঙ্গুলি বললেন, "এঁ-অ্যাঁ!"

—"দশ-পনের লাখ চাইলেও অবাক হব না!"

—"বাপ!" দুর্দান্ত বিস্ময়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় গাঙ্গুলি চেয়ার থেকে প্রায় পড়ে যান আর কি!

আমি হেসে ফেলে বললুম, "ও কি মিঃ গাঙ্গুলি, চোরেরা নিষ্ক্রয় চাইলেও অতগুলো টাকা তো আপনার সিন্দুক থেকে বেরুবে না! আপনি অমন কাতর হচ্ছেন কেন?"

—"আমি কাতর হচ্ছি, মহারাজের মুখ মনে করে।"

—"কেন? যাঁর বিশ লাখ টাকা আয়—"

—"আরে মশাই, এক কোটি টাকা আয় হলেও পঁচিশ হাজার পুরস্কার ঘোষণা করা আমাদের মহারাজার পক্ষে অশ্রুতপূর্ব উদারতা!"

—"ও! তিনি বুঝি একটু—"

—"একটু নয় মশাই, একটু নয়, —ওর নাম কি—যতদূর হতে হয়! গেল বছরে মহারাজা তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধ সেরেছিলেন তিন হাজার টাকায়! বুঝেছেন মশাই, মাত্র তিন হাজার টাকা—বাপ-মায়ের কাজে বাঙালি গৃহস্থরাও যা অনায়াসে ব্যয় করে থাকে!"

আমি বিপুল বিস্ময়ে বললুম, "কী বলছেন! এত বড় ডাকসাইটে মহারাজা—"

—"ওই মশাই, ওই! নামের ডাকে গগন ফাটে, কিন্তু মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত!"

হেমন্ত বললে, "কিন্তু, শুনেছি মহারাজা বাহাদুর প্রায় ফি-বছরেই ইউরোপ-আমেরিকায় বেড়াতে যান। তার জন্যে তো কম টাকার শ্রাদ্ধ হয় না!"

—হ্যাঁ, আমাদের মহারাজার একটিমাত্র শখ আছে, আর তা হচ্ছে দেশ বেড়ানো। কিন্তু কি রকম হাত টেনে, কত কম টাকায় তিনি যে তাঁর ওই শখ মেটান, শুনলে আপনারা বিশ্বাস

[illegible] না! আরে দাদা, ছোঃ ছোঃ! বিলাতি মুল্লুকে গিয়ে তিনি প্রবাদবিখ্যাত Marvellous [illegible] Kingএর নামে রীতিমতো কলঙ্কলেপন করে আসেন!"

"তাই নাকি? এমন ব্যাপার!"

"তবে আর বলছি কি! যুবরাজের জন্যে কেউ যদি পাঁচ লাখ টাকা নিষ্ক্রয় চায়, তাহলে [illegible] প্রেসার' বেড়ে আমাদের মহারাজ দাঁতকপাটি লেগে মূর্ছিত হয়ে পড়বেন! আর দশ লাখ [illegible] চাইলে? তিনি হয়তো বলে বসবেন—যুবরাজকে আর ফিরিয়ে আনবার দরকার নেই! [illegible] দুর্জয়-গড়ের যুবরাজের জন্যে তিনি যে পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, [illegible] তো রূপকথার মতন অসম্ভব কথা!"

—"তাহলে বলতে হবে, যুবরাজের জন্যে মহারাজের বিশেষ প্রাণের টান নেই!"

"টান আছে মশাই, টান আছে! পুত্রের শোকে তিনি পাগলের মতন হয়ে গেছেন! তবে [illegible] শোকে বড় জোর তিনি পাগল হতে পারেন, কিন্তু টাকার শোকে তাঁর মৃত্যু হওয়াও [illegible] নয়!"

"আপনারা নিয়মিত মাইনে-টাইনে পান তো?"

"তা পাই না বললে পাপ হবে। মহারাজা যাকে যা দেব বলেন, ঠিক নিয়মিতভাবেই [illegible] কিন্তু অতবড় করদ মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি আমি, মাইনে কত পাই জানেন? [illegible] দেড়শটি টাকা!"

তারপর খানিকক্ষণ আমরা কেউ কোনও কথা কইলুম না।

গাঙ্গুলি বললেন, "আজ আবার আর এক ফ্যাসাদে পড়েছি মশাই! রবীনবাবু হয়তো [illegible] একটু উপকার করতে পারবেন।"

আমি বললুম, "আদেশ করুন।"

"আদেশ নয়, অনুরোধ। মহারাজা বাংলা কাগজগুলোয় ওই পঁচিশ হাজার পুরস্কারের [illegible] একটা বিজ্ঞাপন দিতে চান। সেটা লেখবার ভার পড়েছে, আমার ওপরে। রবীনবাবু তো [illegible] লেখক, খুব অল্প কথায় কি ভাবে লিখলে বিজ্ঞাপনটা বড় না হয়—অর্থাৎ খরচ হয় [illegible] সেটা উনি নিশ্চয়ই বলে দিতে পারবেন! আমি মশাই মাতৃভাষায় একেবারে [illegible]দিগ্গজ, কলম ধরেছি কি গলদঘর্ম হয়ে উঠেছি!"

আমি হেসে বললুম, "বেশ তো, আমি বলে যাই—আপনি লিখে যান!"

আমি মুখে মুখে বিজ্ঞাপন রচনা করতে লাগলুম, গাঙ্গুলি সেটা লিখে নিয়ে বললেন, "তার [illegible] আর এক বিপদ আছে। মহারাজার হুকুম হয়েছে, বাংলা দেশের সমস্ত প্রধান প্রধান [illegible] আর সাপ্তাহিকে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু কাগজওয়ালারা হচ্ছে অন্য [illegible] বাসিন্দা, সব কাগজের নামধাম আমি জানি না তো!"

আমি বললুম, "তা শহরে প্রধান প্রধান দৈনিক আর সাপ্তাহিকের সংখ্যা পনের-বিশখানার [illegible]। তাদের নামধামও আমি জানি।"

গাঙ্গুলি সভয়ে বলে উঠলেন, "এই রে, তবেই সেরেছে!"

"কি ব্যাপার? ভয় পেলেন কেন?"

"ভয় পাব না, বলেন কি? দুর্জয়-গড় তো বাংলাদেশ নয়, সেখানে বাঙালি কর্মচারী

বলতে সবেধন নীলমণি একমাত্র আমি। পনের-বিশখানা বিজ্ঞাপন আমাকে যদি নিজের হাতে copy করতে হয়—"

হেমন্ত হেসে বললে, "নির্ভয় হোন, মিঃ গাঙ্গুলি! বিজ্ঞাপনটা এখানেই রেখে যান, copy করবার লোক আমার আছে।"

একগাল হেসে মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, "আঃ, বাঁচলুম! আপনার মঙ্গল হোক! এই টেবিলের ওপরে রইল কাগজখানা। বৈকালে এর copyগুলো আর কাগজের নাম ঠিকানা নেবার জন্যে আমি লোক পাঠিয়ে দেব। তাহলে আসি এখন? নমস্কার!"

গাঙ্গুলি দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, "কিন্তু দেখবেন মশাই, আমার মুখে মহারাজার যে চরিত্র বিশ্লেষণ শুনলেন, সেটা যেন—"

আমি হেসে উঠে বললুম, "ভয় নেই, সে কথা আমরা মহারাজকে বলে দেব না!"

গাঙ্গুলি প্রস্থান করলেন। হেমন্ত বিজ্ঞাপনটা তুলে নিয়ে পড়তে লাগল। মিনিট দুয়েক পরে তারিফ করে বললে, "চমৎকার, চমৎকার!"

আমি একটু গর্বিতস্বরে বললুম, "কি হে, আমার বিজ্ঞাপনের ভাষাটা তাহলে তোমার ভাল লেগেছে?"

আমার আত্মপ্রসাদের উপরে ঠাণ্ডা জল নিক্ষেপ করে হেমন্ত প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বললে, "মোটেই না, মোটেই না!"

—"তবে তুমি চমৎকার বললে বড় যে?"

—"আমি মিঃ গাঙ্গুলির হাতের লেখা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। চমৎকার, চমৎকার!"

রাগে আমার গা যেন জ্বলতে লাগল।

সপ্তম

ছেলেধরার লিখন

হেমন্তের সঙ্গে আজ আমিও মহারাজা বাহাদুরের ওখানে গিয়েছিলুম।

যুবরাজের জন্যে মহারাজা এমন অস্থির হয়ে উঠেছেন যে, হেমন্তকে বাধ্য হয়ে তাঁর কাছে যেতে হল।

মহারাজা প্রথমেই জানতে চাইলেন, তদন্ত কতদূর অগ্রসর হয়েছে।

হেমন্ত গুপ্তকথা কিছুতেই ভাঙলে না। কেবল বললে, সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে এবং তার চেষ্টা হয়তো ব্যর্থ হবে না।

এ রকম উড়ো কথায় মহারাজা খুশি হলেন না, রাগ করে বাঙালি পুলিস ও গোয়েন্দাদের উপরে কতকগুলো মানহানিকর বিশেষণ প্রয়োগ করলেন।

পুত্রবিচ্ছেদে ব্যাকুল মহারাজার এই বিরক্তি হেমন্ত নিজের গায়ে মাখলে না, হাসিমুখেই বিদায় নিয়ে চলে এল।

হেমন্তের বাড়িতে এসে দেখি, তার বৈঠকখানার ভিতরে সতীশবাবু ঠিক পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতোই এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত ছুটোছুটি করছেন।

হেমন্তকে দেখেই বলে উঠলেন, "বেশ মশাই, বেশ! এদিকে এই ভয়ানক কাণ্ড, আর ওদিকে আপনি দিব্যি হাওয়া খেয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন?"

হেমন্ত হেসে বললে, "হাওয়া খেতে নয় সতীশবাবু, গালাগাল খেতে গিয়েছিলুম!"

—"মানে?"

—"মানে দুর্জয়-গড়ের মহারাজা বাহাদুরের মতে দুনিয়ায় অকর্মণ্যতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ হচ্ছে বাঙালি পুলিস আর—"

—"আরে রেখে দিন আপনার দুর্জয়-গড়ের তর্জনগর্জন! এদিকে ব্যাপার কি জানেন?"

—"প্রকাশ করুন।"

—"আপনার ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য হল। শ্যামলপুরের জমিদারের কাছে ছেলেচোরদের চিঠি এসেছে।"

—"কমলাকান্ত রায়চৌধুরীর কাছে? তাঁরই একমাত্র পুত্র তো সর্বপ্রথমে চুরি যায়?"

—"হ্যাঁ। এই দেখুন।"

সতীশবাবুর হাত থেকে পত্রখানা নিয়ে হেমন্ত তার কাগজ পরীক্ষা করে বললে, "সেই একই কাগজ—Made in Kalifornia! ভাল।"

চিঠিখানা সে উচ্চস্বরে পাঠ করলে :

শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত রায়চৌধুরী

সমীপেষু—.

মহাশয়,

আমরা দুরাশয় নই। আপনার পুত্র আমাদেরই কাছে আছে। তাহার সমস্ত কুশল।

কিন্তু তাহাকে আর অধিক দিন আমাদের কাছে রাখিতে ইচ্ছা করি না।

পুত্রের মূল্যস্বরূপ মহাশয়কে এক লক্ষ মাত্র টাকা দিতে হইবে। চেক নয়, দশহাজার টাকার দশখানি নোট দিলেই চলিবে।

আগামী পনেরই তারিখে রাত্রি দশটার সময়ে টালিগঞ্জের রেলওয়ে ব্রিজের উপরে আমাদের লোক আপনার টাকার জন্য অপেক্ষা করিবে।

মনে রাখিবেন, আপনি যদি পুলিসে খবর দেন এবং আমাদের লোক ধরা পড়ে কিংবা কেহ উহার পশ্চাৎ অনুসরণ করে, তাহা হইলে আপনার পুত্রকে হত্যা করিতে আমরা একটুও কুণ্ঠিত করিব না।

যদি যথাসময়ে টাকা পাই, তবে তাহার পর সাত-আট দিনের মধ্যেই আপনার পুত্রকে আমরা বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিব। এইটুকু বিশ্বাস আমাদের করিতেই হইবে।

আগামী পনেরই তারিখে টাকা না পাইলে বুঝিব, মহাশয়ের পুত্রকে ফিরাইয়া লইবার ইচ্ছা নাই। তাহার পর আপনার পুত্রের ভালমন্দের জন্য আমরা দায়ী হইব না।

ইতি—

হেমন্ত বললে, "চিঠির তলায় নাম নেই। এ শ্রেণীর ভদ্রলোকেরা বিনয়ের অবতার। নিজেদের নাম জাহির করবার জন্যে মোটেই লালায়িত নন।"

সতীশবাবু বললেন, "এখন উপায় কি বলুন দেখি?"

—"পনেরই তো আসছে কাল। কমলাকান্তবাবুর টাকা দেবার শক্তি আছে?"

—"আছে। টাকা তিনি দিতেও চান। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি চান ছেলেচোরদের ধরতেও। সেটা কি করে সম্ভব হয়? চিঠিখানা পড়লেন তো?"

—"হুঁ। চোরদের দূত ধরা পড়লে বা কেউ তার পিছু নিলে কমলাকান্তবাবুর ছেলে বাঁচবে না।"

—"কিন্তু কমলাকান্তবাবু ছেলেকেও বাঁচাতে, অপরাধীদেরও ধরতে চান। এ কিন্তু অসম্ভব বলে বোধ হচ্ছে। কারণ এটাও তিনি বলেছেন যে, ছেলে যতদিন চোরদের হস্তগত থাকবে, ততদিন আমরা কিছুই করতে পারব না।"

—"তাহলে তাদের দূতকে ছেড়ে দিতে হয়।"

—"হ্যাঁ। তারপর যেদিন তারা ছেলে ফিরিয়ে দিতে আসবে সেই দিনের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়।"

—"না সতীশবাবু, সেটা আরও অনিশ্চিত। অপরাধীরা বড় চালাক। তারা কবে, কখন কি উপায়ে ছেলে ফিরিয়ে দেবে, সে সব কিছুই জানায়নি। হয়তো তারা বখশিশ দিয়ে পথের কোন লোককে ডেকে, কমলাকান্তবাবুর ঠিকানায় তাঁর ছেলেকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে। তাকে গ্রেপ্তার করেও আমাদের কোন লাভ হবে না। যদি আমাদের কিছু করতেই হয়, তবে কাল—অর্থাৎ পনের তারিখেই করতে হবে।"

—"তাহলে অপরাধীদের দূত ধরা পড়বে, কমলাকান্তবাবুর লক্ষ টাকা বাঁচবে, কিন্তু তাঁর ছেলেকে রক্ষা করবে কে?"

—"মাথা খাটালে পৃথিবীর যে কোনও বিপদ থেকে উদ্ধারলাভের উপায় আবিষ্কার করা যায়। একটু সবুর করুন সতীশবাবু, আগে চা আসুক, প্রাণ-মন স্নিগ্ধ হোক, তারপর চায়ের পেয়ালায় তুমুল তরঙ্গ তুলতে কতক্ষণ!...ওরে মধু, চা!"

যথাসময়ে চা এল। একটা পেয়ালা তুলে নিয়ে এক ঢোক পান করে হেমন্ত বললে, "আ, বাঁচলুম! সক্কালবেলায় দুর্জয়-গড়ের চা পান করে দেহের অবস্থা কি কাহিলই হয়ে পড়েছিল!"

সতীশবাবু বললেন, "সে কি মশাই! রাজবাড়ির চায়ের নিন্দে!"

—"মশাই কি সন্দেহ করেন যে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ চা তৈরি হয় কেবল রাজা-রাজড়ার বাড়িতেই? মোটেই নয়, মোটেই নয়! দামী আর খাঁটি 'চায়না'র 'টি-পটে' ঐশ্বর্যের সদর্প বিজ্ঞাপন থাকতে পারে, কিন্তু সুস্বাদু চা যে থাকবেই এমন কোন বাঁধা আইন নেই। চা যে-সে হাতে তৈরি হয় না। ভাল চা তৈরি করার সঙ্গে হার্মোনিয়াম বাজানোর তুলনা চলে। ও দুটোই যেমন সহজ, তেমনই কঠিন। এ দুই ক্ষেত্রেই গুণী মেলে একশ জনে একজন। আমার মধু চাকর হচ্ছে পয়লা নম্বরের চা-কর।"

সতীশবাবু বললেন, "আপাতত আপনার চায়ের ওপরে এই বক্তৃতাটা বন্ধ করলে ভাল হয় না?"

চায়ে শেষচুমুক মেরে ইজিচেয়ারে হেলে পড়ে হেমন্ত অর্ধমুদিত নেত্রে বললে, "ব্যস্ত হবেন না সতীশবাবু! আমার মুখে বাক্যধারা ঝরছে বটে, কিন্তু আমার মস্তিষ্কের ভেতরে উথলে উঠছে চিন্তার তরঙ্গমালা!"

—"আমরা পুলিস, প্রমাণ চাই।"

—"প্রমাণ? বেশ, দিচ্ছি! আসছে কাল রাত দশটার সময়ে টালিগঞ্জের রেলওয়ে ব্রিজের উপরে ছেলেচোরদের দূত আসবে।"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"কমলাকান্তবাবুর লোক তার হাতে লক্ষ টাকার নোট সমর্পণ করবে।"

—"তারপর?"

—"আমাদের—অর্থাৎ পুলিসের চর যাবে তার পিছনে পিছনে।"

—"ধেৎ, পর্বতের মূষিক প্রসব! চোরদের চিঠিতে—"

—"কি লেখা আছে আমি তা ভুলিনি মশাই, ভুলিনি! পুলিসের চর এমনভাবে দূতের পিছনে যাবে, সে একটুও সন্দেহ করতে পারবে না।"

—"দূত যদি অন্ধ আর নির্বোধ না হয়, তাহলে সে ঠিক ধরতে পারবে, কে তার পিছু নিয়েছে।"

—"না, ধরতে পারবে না। এখানে আপনারা বিলাতি পুলিসের পদ্ধতি অবলম্বন করুন।"

—"পদ্ধতিটা কি শুনি।"

—"রাত দশটার ঢের আগে ঘটনাস্থলের চারিদিকে তফাতে তফাতে দলে দলে গুপ্তচর ঘোরাফেরা করবে। মনে রাখবেন, পাঁচ-দশ জনের কাজ নয়। তারপর যথাসময়ে চোরদের দূত আসবে, টাকা নেবে, স্বস্থানের দিকে প্রস্থান করবে। দূর থেকে তাকে অনুসরণ করবে আমাদের প্রথম চর। দূতের লক্ষ্য নিশ্চয়ই তার উপরে পড়বে—পড়ুক, ক্ষতি নেই। আমাদের প্রথম চর খানিক এগিয়েই দেখতে পাবে আর একজন নতুন লোককে—অর্থাৎ আমাদের দ্বিতীয় চরকে। প্রথম চর, দ্বিতীয়কে ইঙ্গিতে দূতকে দেখিয়ে দিয়ে নিজে পিছিয়ে পড়বে বা অন্যদিকে চলে যাবে। চোরেদের দূত সেটা দেখে ভাববে, সে মিছেই সন্দেহ করেছিল। ওদিকে আমাদের দ্বিতীয় চর কতকটা পথ পার হয়েই পাবে আমাদের তৃতীয় চরকে। তখন সেও তৃতীয়ের উপরে কার্যভার দিয়ে নিজে সরে পড়বে। এই ভাবে তৃতীয়ের পর চতুর্থ, তারপর দরকার হলে পঞ্চম বা ষষ্ঠ চর চোরেদের দূতের পিছু নিলে সে কিছুই সন্দেহ করতে পারবে না।"

—"চমৎকার আধুনিক পদ্ধতি। কিন্তু তারপর?"

—"আমাদের আপাতত জানা দরকার কেবল চোরদের কলকাতার আস্তানাটা। এখন দূতকে গ্রেপ্তার করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ চোরেদের কবলে আছে তিন তিনটি বালক। তারা যে কলকাতায় নেই এটা আমরা জানি। আগে তাদের ঠিকানা বার করি, তারপর অন্য কথা। কলকাতায় চোর ধরতে গিয়ে তাদের যদি মরণের মুখে এগিয়ে দিই, তাহলে আমাদের অনুতাপ করতে হবে। রোগী মেরে রোগ সারানোর মানে হয় না।"

অষ্টম

গল্পস্বল্প

কাল গেছে পনেরই তারিখ। রাত দশটার সময়ে কাল টালিগঞ্জে নিশ্চয়ই একটা কিছু রোমাঞ্চকর নাট্যাভিনয় হয়ে গেছে। খবরটা জানবার জন্যে উৎসুক হয়ে আছে মন।

সতীশবাবু কাল রাতেই খবর দিতে আসবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু হেমন্ত রাজি হয়নি। সে বললে, "আপনি হয়তো আসবেন রাত বারটার সময়ে। কিন্তু আপনার খবরের চেয়ে আমার ঘুমকে আমি বেশি মূল্যবান মনে করি। রাতের পর সকাল আছে, এর মধ্যেই খবরটা বাসি হয়ে যাবে না নিশ্চয়।"...

যথাসময়ে শয্যাত্যাগ, আহার ও নিদ্রা—হেমন্ত সাধ্যমত এ নিয়ম রক্ষা করবার চেষ্টা করত। অথচ জরুরি কাজের চাপ পড়লে তাকেই দেখেছি দুই-তিন রাত্রি বিনা নিদ্রায় অনায়াসেই কাটিয়ে দিতে।

সে বলত, "নিয়ম মেনে শরীরধর্ম পালন করি বলেই আমার দেহের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে reserved শক্তি। যারা অনিয়মের মধ্যেই জীবন কাটায় তাদের দেহে কেবল রোগ এসেই বাসা বাঁধে—reserved শক্তি থেকেও তারা হয় বঞ্চিত।"

সকালে বসে হেমন্তের সঙ্গে গল্প করছিলুম। হেমন্ত বলছিল, "মানুষের জীবনে দৈবের প্রভাব যে কতখানি, আমরা কেউই সেটা ভেবে দেখবার চেষ্টা করি না। গোটাকয়েক দৃষ্টান্ত দিই, দেখ। প্রথমে ধর—আলেকজান্ডার দি গ্রেটের কথা। তিনি মারা গিয়েছিলেন যৌবনেই। অল্প বয়সে সিংহাসন পেয়েছিলেন ব'লে হাতে পেলেন তিনি অসীম ক্ষমতা আর তাঁর পিতার হাতে তৈরি সুশিক্ষিত সৈন্যদল। তাঁর পিতা রাজা ফিলিপ অসময়ে দৈবগতিকে গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দেন। সে সময়ে তিনি যদি হঠাৎ মারা না যেতেন, যদি বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত রাজ্যচালনা করতেন, তাহলে আলেকজান্ডার কখনও দিগ্বিজয়ী নাম কেনবার অবসর পেতেন কিনা সন্দেহ!... ভেবে দেখ, বিলাতের বালক কবি চ্যাটার্টনের কথা। সবাই বলে, দরিদ্রের ঘরে না জন্মালে তিনি তখনকার ইংলন্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হতে পারতেন। পৃথিবীর অনেক কবিই ধনী বা রাজার কৃপাদৃষ্টি লাভ করে লক্ষ্মীকে প্রসন্ন করে সরস্বতীর সেবা করে গেছেন ষোড়ষোপচারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও চ্যাটার্টন দৈবের সাহায্য লাভ করেননি। ফলে অনাহারের জ্বালা সইতে না পেরে বালক বয়সেই তিনি করলেন আত্মহত্যা—অত বড় প্রতিভার ফুল শুকিয়ে গেল ফোটবার আগেই।... রোম সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী থিয়োডোরার কথা মনে কর। তিনি ছিলেন অজানা অনামা বংশের মেয়ে, পথের ধুলোয় পড়ে কাটত তাঁর দিন। দৈবের মহিমায় হঠাৎ একদিন সম্রাটের সুনজরে পড়ে থিয়োডোরা হলেন সম্রাজ্ঞী! এমনই কত আর নাম করব? রবীন, আজ যাদের তুমি নিম্নশ্রেণীর অপরাধী বলে জান, খোঁজ নিলে দেখবে—তাদের অনেকেই হয়তো দৈবর হাতের খেলনা হয়ে এমন ঘৃণ্য নাম কিনেছে। দৈবগতিকে তাদের অজ্ঞাতসারেই তারা যদি একটি বিশেষ ঘটনার আবর্তের মধ্যে গিয়ে না পড়ত তাহলে আজ তারা বাস করতে পারত সমাজের উচ্চস্তরেই। আবার দেখ, আমাদের দলের অনেকেই বিখ্যাত ডিটেকটিভ হয়ে ওঠে, খুব রহস্যময় মামলারও কিনারা করে ফেলে, কিন্তু তারও মূলে

থাকে দৈবের খেলাই। আপাতত যে মামলাটা আমরা হতে নিয়েছি, এখনও সেটার কোন কিনারা হয়নি বটে, কিন্তু এখনই দৈব আমাদের সহায় হয়েছে।"

—"তুমি সাঙ্কেতিক শব্দে লেখা সেই বিজ্ঞাপনটার কথা বলছ বোধহয়?"

—"হ্যাঁ। এ মামলায় সেইটেই হচ্ছে starting point, দৈব যদি আমার সহায় হয়ে ওই সূত্রটাকে এগিয়ে না দিত, তাহলে আমি এ মামলার কিনারা করবার কোন আশাই করতে পারতুম না। খালি বুদ্ধি আর তীক্ষ্নদৃষ্টি থাকলেই হয় না রবীন, সেই সঙ্গে চাই দৈবের দয়া। তুমি দেখে নিও, এই মামলার অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রধান প্রমাণ হবে সেই সাঙ্কেতিক বিজ্ঞাপনটাই।"

"অপরাধী যে ধরা পড়বে, এ বিষয়ে তোমার কোন সন্দেহই নেই?"

—"এক তিলও না। যে কোন দেশের পুলিসের দপ্তর দেখলে তুমি আর একটা সত্যকথা জানতে পারবে।"

—"কি?"

—"অতিরিক্ত চালাকি দেখাতে গিয়ে আজ পর্যন্ত কত বড় বড় অপরাধী পুলিসের হাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে! ধর, এই ছেলেচোরের কথা। ডাকঘরের সাহায্য নিলে আমাদের পক্ষে আজ একে আবিষ্কার করা অসম্ভব হত। ডাকের চিঠিতেও সে সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করতে পারত, সে চিঠি ভুল ঠিকানায় গেলে বা পুলিসের হাতে পড়লেও খুব সম্ভব কেউ তার পাঠোদ্ধার করবার চেষ্টা করত না।"

ঠিক এই সময়ে রাস্তায় মোটর দাঁড়ানোর শব্দ হল। অনতিবিলম্বে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন সতীশবাবু—চোখে-মুখে তাঁর হাসির উচ্ছ্বাস!

—"কি মশাই, খবর কি?"

—"কেল্লা ফতে!"

নবম

সর্দারের বাহাদুরি

হেমন্ত বললে, "কেল্লা ফতে কিরকম? আপনি কি আসল আসামীকেও ধরে ফেলেছেন?"

সতীশবাবু বললেন, "পাগল! নিজের দিক না সামলে ভীমরুলের চাকে হাত দিই কখনও?"

—"তবে?"

—"তাদের আড্ডা আবিষ্কার করেছি।"

—"কি করে?"

—"আপনার ফন্দিটা কাজে লাগিয়ে। হেমন্তবাবু, এমনই নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি দেখিয়েই তো আপনি আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছেন! আপনার ফন্দিটা কাজ করেছে ঘড়ির কাঁটার মতো, চোরেদের দূত কোন সন্দেহ করতে পারেনি।"

—"ফন্দিটা আমার নয় সতীশবাবু, ওটা আমি শিখে এসেছি বিলাত থেকে। কিন্তু যাক সে কথা। এখন আপনার কথা বলুন।"

সতীশবাবু টুপি খুলে বসে পড়ে বললেন, “ওদের দূত যথাস্থানেই এসেছিল।”

—“তারপর সে টাকা নিয়েছে?”

—“হ্যাঁ। তারপর আমাদের চর—না চর বললে ঠিক হবে না—চরেরা তার পিছু নেয়।”

—“সে কোনদিকে যায়?”

—“রসা রোড় ধরে আসে উত্তর দিকে। তারপর প্রায় রাসবিহারী এভিনিউয়ের মোড়ের কাছে এসে একখানা মস্ত বাড়ির ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়।”

—“বাড়িখানার উপরে পাহারা বসিয়েছেন তো?”

—“নিশ্চয় বাড়িখানার নাম ‘মনসা ম্যানসন’—অন্ধকার, বাহির থেকে মনে হয় না ভিতরে মানুষ আছে।”

—“যে লোকটা এসেছিল তাকে দেখতে কেমন?”

—“রাতে ভাল করে তার চেহারা দেখা যায়নি। তবে সে খুব লম্বা-চওড়া আর তার পোশাক হিন্দুস্তানির মতো।

—“এইবার গোপনে সন্ধান নিতে হবে যে, ও বাড়িতে কে থাকে। তারপর—”

টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। নিজের কথা অসমাপ্ত রেখেই হেমন্ত উঠে গিয়ে রিসিভার নিয়ে মুহূর্ত পরে মুখ ফিরিয়ে বললে, “সতীশবাবু, থানা থেকে আপনাকে ডাকছে।”

সতীশবাবু ‘রিসিভার’ নিয়ে বললেন, “হ্যালো! হ্যাঁ, আমি।...কি বললে? অ্যাঁ, বল কি? বল কি?” তিনি অভিভূতের মতন আরও খানিকক্ষণ থানার কথা শুনলেন, তারপর বদ্ধস্বরে “আচ্ছা” বলে ‘রিসিভার’টা রেখে দিয়ে যখন আবার আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর চোখের আলো নিবে গেছে এবং ভাবভঙ্গি একেবারে অবসন্নের মতো।

হেমন্ত একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সতীশবাবুর মুখের পানে তাকালে, কিন্তু কিছু বললে না।

সতীশবাবু ধপাস করে চেয়ারের উপরে বসে পড়ে করুণ স্বরে বললেন, “হেমন্তবাবু, খাঁচা খালি—পাখি নেই!”

—“পাখি উড়ল কখন?”

তিক্তকণ্ঠে সতীশবাবু বললেন, “আরে মশাই, পাখি ধরতে গিয়েছিলুম আমরা খালি খাঁচায়। আজ সকালে আমাদের চর খবর নিয়ে জেনেছে যে, ‘মনসা ম্যানসন’ হচ্ছে ভাড়াটে বাড়ি, কিন্তু আজ তিনমাস খালি পড়ে আছে।”

—“অর্থাৎ চোরেদের দূত সদর দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে খিড়কির দরজা দিয়ে সরে পড়েছে। কেমন, এই তো?”

—“ঠিক তাই। আমাদের কাদা ঘেঁটে মরাই সার হল!”

—“সর্দারজি, সাবাস!”

—“সর্দার? সর্দার আবার কে?”

—“এই ছেলেচোরদের সর্দার আর কি! বাহাদুর বটে সে! আমাদের এত শেয়ালের পরামর্শ, এত তোড়জোড়, এত ছুটোছুটি, সাফল্যের লাফালাফি, কালনেমির লঙ্কা ভাগ, তার এক ছেলেভোলানো সহজ চালে সব ব্যর্থ হয়ে গেল। শত্রুর চেয়ে নিজেদের বেশি বুদ্ধিমান মনে করার শাস্তি হচ্ছে এই! আমি মানসনেত্রে বেশ নিরীক্ষণ করতে পারছি, আমাদের

বোকামির দৌড় দেখে সর্দারজি মহা কৌতুকহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে দুই হাতে পেট চেপে কার্পেটের উপরে গড়াগড়ি খাচ্ছেন! হাসো সর্দারজি, হাসো! স্বীকার করছি আমরা গর্দভের নিকটাত্মীয়—আমরা হেরে ভূত!"

সতীশবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "থামুন মশাই, থামুন! এটা ঠাট্টা-তামাশার বিষয় নয়!"

হেমন্ত এইবারে জোরে অট্টহাস্য করে বললে, " গোয়েন্দাগিরি হচ্ছে একটা বড় রকমের 'স্পোর্ট'! পরাজয়কে আমি হাসিমুখেই গ্রহণ করতে পারি। যে কখনও পরাজিত হয়নি, সে বিজয়গৌরবেরও যথার্থ মর্যাদা বুঝতে পারে না!"

সতীশবাবু ভার ভার মুখে বললেন, "খেলা? বেশ, কেমন খেলোয়াড় কে, দেখা যাবে! আপনার ওই সর্দারজি এখনও টের পাননি যে, আমাদের হাতের তাস এখনও ফুরিয়ে যায়নি! দেখি টেক্কা মারে কে!"

হেমন্ত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, "আমাদের হাতে এখনও কি কি তাস আছে মশাই? নতুন কোন তাস পেয়েছেন নাকি?"

—"নিশ্চয়! সে খবরটাও আজ দিতে এসেছি। জবর খবর!"

—"বলেন কি—বলেন কি? ঝাড়ুন আপনার জবর খবরের ঝুলি!"

হেমন্তের উৎসাহ দেখে সতীশবাবুর ম্লান ভাবটা মুছে গেল ধীরে ধীরে। তিনি বললেন, "এ খবরটা যে পেয়েছি তারও মূলে আছেন আপনি, কারণ এদিকেও আপনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।"

হেমন্ত বলে উঠল, "ওহো, বুঝেছি!"

—"না কখখনো বোঝেননি!"

—"নিশ্চয় বুঝেছি!"

—"কি করে বুঝলেন?"

—"অনুমানে।"

—"কি বুঝেছেন?"

—"ক্যানিংয়ের এক মাঝির খোঁজ পেয়েছেন?"

—"ঠিক!"

—"জানি। কলকাতায় পাখির খাঁচা যখন খালি, জবর খবর আসতে পারে তখন কেবল ক্যানিং থেকেই।"

—"তাই! খবরটা পেয়েছি কাল রাতেই।"

—"খবরটা শুনি।"

—"পুলিস খোঁজাখুঁজি করে জলিল নামে এক বুড়ো মাঝিকে বার করেছে। সে নাকি আজ তিনমাসের ভিতরে চারবার এক এক দল লোককে নিয়ে সমুদ্রের মুখে জামিরা নদীর একটা দ্বীপে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। আবার আসবার সময়ে ওই দ্বীপ থেকেও যাত্রী তুলে এনেছে।"

—"তারা যে সন্দেহজনক ব্যক্তি, এটা মনে করছেন কেন?"

—"তারও কারণ আছে। প্রথমত, জলিল বলে, ও অঞ্চলে সে আগেও গিয়েছে কিন্তু ওই দ্বীপে যে মানুষ থাকে এটা তার জানা ছিল না। দ্বিতীয়ত, লোকগুলো যতবার গিয়েছে এসেছে

ততবারই তাকে প্রচুর বখশিশ দিয়ে বলেছে, তাদের কথা সে যেন আর কারুর কাছে প্রকাশ না করে। এটা কি সন্দেহজনক নয়?"

—"এ প্রমাণ সন্দেহজনক হলেও খুব বেশি সন্তোষজনক নয়।"

—"শুনুন, আরও আছে। গত দোসরা তারিখে দুর্জয়-গড়ের যুবরাজ হারিয়ে গেছেন, এ কথা মনে আছে তো? তেসরা তারিখের খুব ভোরে—অর্থাৎ সূর্যোদয়ের আগেই চারজন লোক জামিরা নদীর ওই দ্বীপে যাবার জন্যে জলিলের নৌকো ভাড়া করে। তাদের সঙ্গে ছিল একটি বছর চার বয়সের সুন্দর শিশু। জলিল বলে, শিশুটি ঘুমোচ্ছিল আর সারা পথ সে তার সাড়া পায়নি, নৌকোর ভিতেরেই তাকে লেপ চাপা দিয়ে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। নৌকোর যাত্রীরা জলিলকে বলেছিল, শিশু অসুস্থ। কিন্তু আমার বিশ্বাস তাকে অজ্ঞান করে রাখা হয়েছিল কোন রকম ঔষধ প্রয়োগেই। ...কি বলেন হেমন্তবাবু, ওই শিশুই যে দুর্জয়-গড়ের যুবরাজ, একথা কি আপনার মনে লাগে?"

হেমন্তের মুখের ভাবান্তর হল না। সে মিনিট তিনেক স্থির হয়ে বসে রইল নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার মতো। তারপর আচম্বিতে আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে সতীশবাবুর একখানা হাত সজোরে চেপে ধরে বললে, "উঠুন—উঠুন, এইবারে চাই action!"

সতীশবাবু আর্তস্বরে বললেন, "আরে মশাই, হাত ছাড়ুন, হাত ছাড়ুন, গেল যে! হাতখানার দফারফা হল যে!"

হেমন্ত তাড়াতাড়ি সতীশবাবুর হাত ছেড়ে দিলে।

সতীশবাবু হাতখানা ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, "ওঃ! আপনারা দুই বন্ধু যে ভদ্র-গুণ্ডা, তা আমি জানি মশাই, জানি! কুস্তিতে, বক্সিংয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন, তাও খবরের কাগজে পড়েছি। কিন্তু যত তাল আমার ওপরে কেন, আমি কি জামিরা নদীর মোহন-দ্বীপের ছেলেধরা?...কি রবীনবাবু, মুখ টিপে টিপে হাসা হচ্ছে যে বড়? আপনিও এগিয়ে আসনু না, action বলে গর্জন করে আমার আর একখানা হাত ভেঙে দিন না!"

আমি হেসে ফেলে বললুম, "ও অভিপ্রায় আমার আছে বলে মনে হচ্ছে না!"

হেমন্ত লজ্জিতমুখে বললে, "ক্ষমা করবেন সতীশবাবু, মনের আবগেটা আমার হাত দিয়ে বেরিয়ে গেল!"

—"বাপ! ভবিষ্যতে মনের আবেগ মনের মধ্যেই চেপে রাখলে বাধিত হব।...হ্যাঁ, এখন কি বলতে চান, বলুন! কিন্তু কাছে আসবেন না, আপনি উত্তেজিত হয়েছেন!"

হেমন্ত বললে, "আজই মোহন-দ্বীপের দিকে নৌকো ভাসাতে হবে!"

দশম

শাপভ্রষ্ট দ্রৌপদী

সতীশবাবু একটু ভাবলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "তা হয়না হেমন্তবাবু।"

—"কেন হয়না?"

"কেবল যে যাত্রার আয়োজন করতে হবে, তা নয়। আমার হাতে আরও গুরুতর কাজ আছে, সেগুলোর ব্যবস্থা না করে আমার কলকাতা ছাড়া অসম্ভব!"

—"তবে কবে যেতে পারবেন?"

—"চেষ্টা করলে কাল যেতে পারি।"

—"বেশ, তাই। কিন্তু সঙ্গে বেশি লোকজন নেবেন না।"

—"যাচ্ছি বাঘের বাসায়, বেশি লোকজন নেব না মানে?"

—"অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। শত্রুদেরও চর থাকতে পারে, তারাও আমাদের ওপরে যে নজর রাখছে না, এ কথা বলা যায় না। একটা বিপুল জনতা যদি ক্যানিংয়ের ওপরে ভেঙে পড়ে, তাহলে মোহনদ্বীপেও গিয়ে হয়তো দেখব, পাখিরা বাসা ছেড়ে উড়ে পালিয়েছে!"

—"সেকথা সত্যি। কিন্তু দলে হালকা হয়েও সেখানে যাওয়া তো নিরাপদ নয়! কে জানে তারা কত লোক সেখানে আছে?"

—"ভারে কাটার চেয়ে ধারে কাটা ভাল। আমরা কাল রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে জন বার লোক মিলে দু'খানা নৌকোয় চেপে যাত্রা করব। আপনি সেই ব্যবস্থা করুন। সঙ্গে যাদের নেবেন তারা যেন বাছা বাছা হয়। অবশ্য সকলকেই সশস্ত্র হয়ে যেতে হবে।"

—"কিন্তু চাকর-বামুনও তো নিয়ে যাওয়া দরকার? আমাদের কাজ করবে কে?"

—"চাকর-বামুন? ক্ষেপেছেন নাকি? আমরা নিজেরাই হব নিজেদের চাকর, আর রান্নার ভার নেবে, রবীন।"

—"রবীনবাবু? উনি তো কবি, খালি কলম নাড়েন, হাতা-খুন্তি নাড়বার শক্তি ওঁর আছে নাকি?"

—"ভয় নেই সতীশবাবু, হাতা-খুন্তি নেড়ে রবীন যে হাঁড়ি-কড়ার ভেতরেই বস্তুহীন কবিতা রচনার চেষ্টা করবে না, সে কথা আমি জোর গলায় বলতে পারি। রবীনকে চেনেন না বলেই আপনি এত ভাবছেন! কিন্তু ও খালি গোলাপফুল দেখে গোলাপি ছড়া বাঁধে না, কুমড়ো ফুল চয়ন করে ব্যাসন সহযোগে ফুলুরি বানাতেও ও কম ওস্তাদ নয়! ও বোধ হয় শাপভ্রষ্ট দ্রৌপদী, পুরুষ দেহ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে মর্তধামে!"

—"হ্যাঁ রবীনবাবু, এসব কি সত্যি? হরি আর হরের মতো আপনিও কি একসঙ্গে কবি আর cook?"

আমি বললুম, "হেমন্তের অত্যুক্তির কথা ছেড়ে দিন—ওর জীবনের সেরা আনন্দ হচ্ছে আমাকে নিয়ে রঙ্গ-ব্যঙ্গ করা। কিন্তু কবি আর লেখকরা যে রাঁধতে জানেন না, আপনার এমন বিশ্বাস কেন হল? ফ্রান্সের বিখ্যাত লেখক আলেকজাণ্ডার ডুমার নাম শুনেছেন?"

—"ওই যিনি 'মন্টি ক্রিস্টো' আর 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স' লিখেছেন?"

—"হ্যাঁ। তাঁর একহাতে থাকত কলম, আর এক হাতে হাতা। একসঙ্গে তিনি মনের আর দেহের প্রথম শ্রেণীর খোরাক জোগাতে পারতেন!"

ঠিক এই সময় আবার একখানা মোটর আমাদের বাড়ির দরজায় এসে থামল, সশব্দে। তারপরেই দ্রুতপদে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন মিঃ গাঙ্গুলি—তাঁর দৃষ্টি উদভ্রান্ত।

সতীশবাবু বললেন, "মিঃ গাঙ্গুলি, আপনার মুখচোখ অমনধারা কেন?"

গাঙ্গুলি বললেন, "আপনাকে আমি চারিদিকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর আপনি কিনা, এখানে বসে ষড়যন্ত্র করছেন!"

সতীশবাবু বললেন, "ভুল হল মিঃ গাঙ্গুলি! পুলিশ ষড়যন্ত্র করে না, ষড়যন্ত্র ধরে! কিন্তু আপনাকে দেখে যে বিপদগ্রস্ত বলে মনে হচ্ছে!"

গাঙ্গুলি একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললেন, "বিপদ বলে বিপদ। মহারাজা বাহাদুর একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন!"

—"কেন, কেন?"

—"হেমন্তবাবু, শেষটা আপনার কথাই সত্যি হল!"

হেমন্ত বিস্মিতকণ্ঠে বললে, "আমার কথা সত্যি হল? সে আবার কি?"

—"চোর ব্যাটারা পনের লক্ষ টাকার দাবি করে মহারাজা বাহাদুরকে বিষম এক পত্রাঘাত করেছে! ব্যাটারা খালি চোর নয়—গুণ্ডা, খুনে, ডাকু!"

সতীশবাবু লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "কি সর্বনাশ, কি সর্বনাশ!"

হেমন্ত কোনরকম বিস্ময় প্রকাশ করলে না। খালি বললে, "চিঠিখানা কোথায়?"

—"এই যে, আমার কাছে।" পকেট থেকে পত্র বার করে তিনি হেমন্তের হাতে দিলেন।

হেমন্ত চেঁচিয়ে ইংরেজিতে টাইপ করা যে চিঠিখানা পড়লে, তার বাংলা মানে দাঁড়ায় এই :

"মহারাজা বাহাদুর,

যুবরাজকে যদি ফেরত চান তাহলে আগামী চব্বিশ তারিখে আমাদের দূতের হাতে পনের লক্ষ টাকা অর্পণ করবেন।

চব্বিশ তারিখে রাত্রি ঠিক বারটার সময়ে গড়িয়াহাটা লেকের 'লেক ক্লাবের' পিছনকার রাস্তায় আমাদের দূত অপেক্ষা করবে।

কিন্তু সাবধান, যদি পুলিশে খবর দেন, কিংবা আমাদের দূতকে ধরবার বা তার পিছনে আসবার চেষ্টা করেন, তাহলে আমরা যুবরাজকে হত্যা করতে বাধ্য হব।

পনের লক্ষ টাকা আমাদের হস্তগত হবার পর এক সপ্তাহের মধ্যে যুবরাজকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে পাবেন। আমরা টাকা না পেলে যুবরাজের জীবনাশঙ্কা আছে। ইতি—

সতীশবাবু বললেন, "প্রায় একই রকম চিঠি। কেবল এখানা ইংরেজিতে লেখা আর টাইপ করা।"

বিষম চমকে উঠে গাঙ্গুলি বললেন, "ও বাবা, এরকম আরও চিঠি আপনারা পেয়েছেন নাকি?"

হেমন্ত বললে, "হ্যাঁ। এমনই এক চিঠি লিখে ভয় দেখিয়ে ছেলেধরারা শ্যামলপুরের জমিদারেরও কাছ থেকে এক লাখ টাকা নিয়ে গেছে।"

—"আর আপনারা হাত গুটিয়ে সঙের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন?"

সতীশবাবু বললেন, "চোরের শর্তগুলো ভুলে যাচ্ছেন কেন? আমাদের কি হাত বার করবার উপায় আছে?"

—"হুঁ, তাও বটে—তাও বটে! একটু গোলমাল করলেই ছুঁচোরা আবার ছেলে খুন করব বলে ভয় দেখায়! তা পারে, বেটারা সব পারে—গুণ্ডা, খুনে, ডাকু! এই এক চিঠিই আমাদের অত

পড়ে মহারাজা বাহাদুরকে একদম কাত করে দিয়েছে—যাকে বলে প্রপাতধরণীতলে আর কি!"

সতীশবাবু বললেন, "আজ ষোলই। আর সাতদিন পরেই চব্বিশে।"

হেমন্ত বললে, "মহারাজা কি করবেন স্থির করেছেন? পুলিসে যখন খবর দিয়েছেন, তাঁর কি টাকা দেবার ইচ্ছে নেই?"

গাঙ্গুলি দুই চোখ বড় করে বললেন, "ইচ্ছে? এক কথায় পনের লক্ষ টাকা জলে দেবার ইচ্ছে হবে আমাদের মহারাজার? বলেন কি মশাই? কিন্তু এখন তাঁকে দেখলে আপনাদের দুঃখ হবে। একসঙ্গে ছেলে হারাবার আর টাকা হারাবার ভয়ে একেবারে তিনি ভেঙে পড়েছেন, কি করবেন বুঝতে না পেরে আপনাকে আর সতীশবাবুকে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।"

সতীশবাবু বললেন, "আমরা যাচ্ছি বটে, কিন্তু দিতে পারি খালি এক পরামর্শ। যুবরাজকে বাঁচাতে হলে টাকা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

কথাটা গাঙ্গুলির মনের মতো হল না। মাথা নেড়ে বললেন, "না মশাই, ও পাপীদের কথায় বিশ্বাস নেই। তারপর অতগুলো টাকা হাতিয়েও যুবরাজকে যদি ছেড়ে না দেয়?"

হেমন্ত বললে, "তবু ওদের কথা মতোই কাজ করতে হবে।"

একাদশ

যাত্রা

ইষ্টকময়ী কলিকাতা নগরীর কঠোর বুকের ভিতর থেকে একেবারে এসে পড়েছি নদীর কলসঙ্গীতে জীবন্ত প্রকৃতির কোলে। চিরদিন কাব্যচর্চা করি। এখানে এসে মনে হচ্ছে, ফিরে এসেছি যেন স্বদেশে।

এরমধ্যে বলাবর মতন ঘটনা কিছুই ঘটেনি। যতক্ষণ কলকাতায় ছিলুম, মহারাজা বাহাদুরের হাহুতাশ বাণী বহন করে মিঃ গাঙ্গুলি এসে আক্রমণ করেছেন বারংবার এবং কালকের ও আজকের দুপুরের মধ্যে হেমন্তকে বাধ্য হয়ে রাজবাড়িতে ছুটতে হয়েছে পাঁচবার। মহারাজের কথা কিন্তু সেই একই : হয় লাখ পাঁচেক টাকার বিনিময়ে যুবরাজকে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা কর, নয় অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে যুবরাজকে উদ্ধার কর—পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কারের উপরেও আমি দেব আরও পঁচিশ হাজার টাকা!

মাঝখানে পড়ে গাঙ্গুলি বেচারার অবস্থা যা হয়েছে! তাঁকে দেখলে দুঃখ হয়। তিনি হচ্ছেন ফিটফাট ব্যক্তি, ইস্তিরি করা পোশাকের প্রতি ভাঁজটি পর্যন্ত অটুট রেখে চলাফেরা ওঠাবসা করেন পরম সাবধানে এবং জামার বোতাম ঘরে থাকে সর্বদাই একটি করে টাটকা ফুল। কিন্তু ভীষণ অধীর মহারাজা বাহাদুরের ঘনঘন হুমকি বা হুকুমের চোটে দিকবিদিক জ্ঞানহারার মতন দৌড়ঝাঁপ করে করে মিঃ গাঙ্গুলির পোশাকের ইস্তিরি গেছে নষ্ট হয়ে এবং বোতামের ফুল গিয়েছে কোথায় ছিটকে পড়ে! যতবারই দেখেছি, ততবারই তিনি হাঁপাচ্ছেন এবং এই শীতেও রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলছেন, "পাগলারাজার পাল্লায় পড়ে আত্মারাম বুঝি খাঁচা ছাড়া হয়—এ চাকরি আমার পোষাবে না মশাই, পোষাবে না!"

যাক, মহারাজার কবল থেকে মুক্তিলাভ করে আমরাও যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। তাঁকে কোন খবর না দিয়েই সরে পড়েছি। কেবল মিঃ গাঙ্গুলিকে চুপিচুপি বলে এসেছি, সতীশবাবু ছুটি পেয়ে 'চেঞ্জে' যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে আমরাও দু'চার দিনের জন্যে হাওয়াটা একটু বদলে আসছি।

গাঙ্গুলি অত্যন্ত দমে গিয়ে বললেন, "অ্যাঁ, এই দুঃসময়ে একলা আমাকে মহারাজার খপ্পরে ফেলে আপনারা দেবেন পিটটান? আমার অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখেছেন কি?"

—"আমাদের ভাববার দরকার নেই। জীবের স্বধর্ম আত্মরক্ষা করা। আপনিও আত্মরক্ষা করুন।"

—"আর দুর্জয়-গড়ের মামলা?"

—"মহারাজকে বলুন, টাকা দিয়ে যুবরাজকে ফিরিয়ে আনতে, আমরা দু'চারদিন পরেই এসে আসামীকে ধরবার চেষ্টা করব।"

গাঙ্গুলি গজগজ করতে করতে চলে গেলেন, "আসামীর কথা নিয়ে আপনারা মাথা ঘামাতে চান, ঘামাবেন। আমার আর সহ্য হচ্ছে না। এ চাকরি আমি ছেড়ে দেব—বাপ!"

যথাসময়ে সদলবলে কলকাতার ধুলো-ধোঁয়া-ধুমধাড়াক্কা পিছনে ফেলে শহর-ছাড়া বিজন পথে এগিয়ে চললুম।

রাত আঁধারে চুপিচুপি কালো জলে ভাসল আমাদের দুই নৌকো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটেনি—এমন কি আমরা যে কোন অপ্রীতিকর ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিনি, এ বিষয়েও কিছুমাত্র সন্দেহ নাস্তি।

জনতার সাড়া নেই, তীরতরুর মর্মর ছন্দে তাল রেখে বনবাসী বাতাস শোনায় স্নিগ্ধ মাটির আর ঘন সবুজের গন্ধ মাখানো নতুন নতুন গান এবং নদীর জলসায় জলে জলে দুলে দুলে ওঠে কূল হারানো গতি-বীণার তান। কান পেতে শুনলে মনে হয়, অনন্ত নীলাকাশও তার লুকিয়ে রাখা নীরব বীণার রন্ধ্রে জাগিয়ে তুলছে কল্পলোকের কোন মৌন রাগিনীর আলাপ! পৃথিবীর ধুলোর ঠুলিতে যার কান কালা, এ অপূর্ব আলাপ সে শুনতে পায় না—তাই এর মর্ম বোঝে শুধু কবি আর শিশু, ফুলপরী আর পাপিয়া!

এই শীতের ঠাণ্ডা রাতের সঙ্গে আজ পাপিয়ারা ভাব করতে আসেনি। ফুলপরীরাও কোন তীরে কোন বনে কোন শিশির ভিজানো বিছানায় ঘুমিয়ে আছে তার ঠিকানা জানি না, কিন্তু আমার মনের ভিতরে জাগল চিরন্তন শিশুর উল্লাস কলরোল।

নৌকো চলেছে অন্ধকারের কালো চাদরে গা মুড়ে,—চলেছে নৌকো। দাঁড়ে দাঁড়ে তালে তালে বাজিয়ে চলেছে নৌকো জলতরঙ্গ বাজনা। দু'কূলের কাহিনী ভুলিয়ে, সামনে অকূলের ইঙ্গিত জাগিয়ে চলেছে নৌকো, ঘুমের দেশে ঘুম ভাঙানো সঙ্গীতের সুর বুনতে বুনতে।

তারপর। চাঁদ উঠল দূর বনের ফাঁকে। মনে হল পূর্ণ প্রকাশের আগে যেন গাছের ঝিলিমিলির আড়াল থেকে চাঁদ লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে নিতে চায়, পৃথিবীর উৎসব আসরে আজ কত দর্শকের সমাগম হয়েছে।

ছড়িয়ে দিলে কে জলে মুঠো মুঠো হীরের কণা! ওপারে নজর চলে না, এপারে দেখা যায় নীল স্বপ্নমাখানো বন আর বন আর বন! কত—কত দূর থেকে কোন একলা পথিকের বাঁশের বাঁশীর মৃদু মেঠো সুর ভেসে আসে যেন আমাদের সঙ্গে কথা কইতে। চাঁদ উঠছে উপরে—

...উপরে! তার মুখে—শীতের মেয়ে কুহেলিকার আদরমাখা চুমোর ছোঁয়া! যত রাত হয় ...আমোদ বাড়ে তত—তার জলের নূপুর বাজে তত জোরে!

...খতে দেখতে, শুনতে শুনতে অবশেষে জড়িয়ে এল আমার চোখের পাতা।

দ্বাদশ

দ্বীপ

...মিরা নদী। এটা কি নদী, না সমুদ্র?

...করে দেখলে বহুদূরে চোখে পড়ে তীরের ক্ষীণ রেখা। কোন কোন দিকে তাও নেই—...খানে অনন্ত আসন জুড়ে বসেছে অসীম শূন্যতা।

...লে নেই মাটির রং। সমুদ্রের রঙের আভাসে জলবসন ছুবিয়ে জামিরা চাইছে নতুন রঙে ...হতে।

...লিল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "উই! উই সেই দ্বীপ কর্তা, উই সেই দ্বীপ!"

...মি শুধোলুম, "হ্যাঁ জলিল, ও দ্বীপের নাম কি।"

"জানি না তো!"

"জান না?"

"ও দ্বীপের নাম নেই।"

...োপ, জঙ্গল, বড় বড় গাছ। দ্বীপের দিকে তাকালে আর কিছু দেখা যায় না—আর কিছু ...আশাও আমরা করিনি।

...বললে, "ওখানে নৌকো লাগাবার ঘাট আছে?"

...লিল মাথা নেড়ে জানালে, না!

"যারা তোমায় এখানে নিয়ে আসে, তারা কোথায় নামে?"

...লিল আবার মাথা নাড়ে। অর্থাৎ তারও কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই!

"আমরা যেখানে খুশি নামব?"

"হ্যাঁ কর্তা।"

...আমাদের নৌকো দু'খানা দ্বীপের খুব কাছে এসে পড়ল।

...শবাবু বললেন, "দ্বীপটা কত বড়, তাও তো বুঝতে পারছি না। ওই নিবিড় জঙ্গলের ...আসল জায়গাটা খুঁজে বার করতে কতক্ষণ লাগবে, কে জানে!"

...রে পরে দু'খানা নৌকোই তীরে এসে লাগল। প্রথম নৌকোয় ছিলুম আমরা তিনজন—...আমি, হেমন্ত আর সতীশবাবু। অস্ত্রশস্ত্র, রসদ ও অন্যান্য সমস্ত মালই ঠাসা ছিল আমাদের নৌকোতেই। দ্বিতীয় নৌকোয় ছিল একজন ইন্‌স্পেক্টার, একজন সাব-ইনস্পেক্টার, ...জমাদার ও আটজন মিলিটারি পাহারাওয়ালা।

...অপরাহ্ন কাল—চারিদিকে সমুজ্জ্বল সূর্যকিরণ। পথের অভাবে খুব বেশি অসুবিধায় ...হল না, জঙ্গলের আশপাশ দিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে পাওয়া গেল একটা মাঠ, লম্বায় ...আধ মাইলের কম হবে না। চারিদিকেই তার উঁচু বনের প্রাচীর।

কিন্তু মানুষের চিহ্ন কোথাও নেই। গাছপালায় বাতাসের নিশ্বাস আর বনে বনে পাখিদের ডাক ছাড়া একটা অমানুষিক নিস্তব্ধতা সর্বত্র এমন একটা অজানা ভাবের সৃষ্টি করেছে যে, এ দ্বীপ কখনও মানুষের কণ্ঠ শুনেছে বলে সন্দেহ হয় না।

সতীশবাবু জমাদারকে ডেকে বললেন, "সুজন সিং, যেখান দিয়ে যাচ্ছি ভাল করে চিনে রাখো। কারুর সঙ্গে দেখা না হলে ফিরতে হবে, আবার কারুর সঙ্গে দেখা হলেও অবস্থাগতিকে হয়তো প্রাণ হাতে করে পালাবার দরকার হবে।"

মাঠের মাঝ বরাবর এসেছি, হেমন্ত হঠাৎ বলে উঠল, "আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন!"

চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সতীশবাবু বললে, "কই, আমি তো কোথাও আশার ছিটেফোঁটাও দেখতে পাচ্ছি না!"

হেমন্ত হাত তুলে একদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললে, "ওই দেখুন!"

—"কি?"

—"ধোঁয়া।"

অনেক দূরে অরণ্যের মাথায় কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে খানিকটা ধোঁয়া ক্রমেই উপরদিকে উঠে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে সেখানে জেগে উঠল পুঞ্জ পুঞ্জ উর্ধ্বগামী ধূম।

হেমন্ত বললে, "ধোঁয়ার জন্ম আগুনে। আর আগুনের জন্ম মানুষের হাতে!"

—"কিন্তু দাবানল জ্বলে আপনি।"

—"ওটা কি মনে হচ্ছে? দাবানলের, না উনুনের ধোঁয়া?"

—"উনুনের।"

—"তবে এগিয়ে চলুন তাড়াতাড়ি!"

সকলেরই মুখ উত্তেজিত। কিন্তু কেউ কোন কথা কইলে না। নীরবে মাঠের বাকি অংশটা পার হয়ে গভীর এক অরণ্যের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালুম।

সতীশবাবু বললেন, "আবার যে বন এল!"

হেমন্ত বললে, "আসুক। বন আমাদের বন্ধুর মতো লুকিয়ে রাখবে।"

আমি বললুম, "এখানে বনের ভেতরে যে একটি স্বাভাবিক পথের মতো রয়েছে!"

হেমন্ত বললে, "ভালই হল। ধোঁয়া দেখেছি উত্তর-পশ্চিমে! পথটাও গিয়েছে ওইদিকে। এগিয়ে চল, এগিয়ে চল!"

পথ দিয়ে এগুতে এগুতেই মানুষের স্মৃতিচিহ্ন পেলুম। এক জায়গায় পেলুম একটা আধপোড়া বিড়ি। মাঝে মাঝে শুকনো কাদায় মানুষের পায়ের ছাপ। বুঝলুম, পথটা ব্যবহৃত হয়।

মাইল খানেক অগ্রসর হবার পর হেমন্ত বললে, "সতীশবাবু, আর বোধহয় এভাবে এগুনো নিরাপদ নয়। আপনারা এইখানে অপেক্ষা করুন। আমি ওই বড় বড়গাছটায় চড়ে চারিদিকটা একবার দেখি।" সে গাছের তলায় গিয়ে জুতো খুলে ফেললে। তারপর উপরে উঠতে লাগল।

তখন সূর্য পশ্চিম আকাশের দিকে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে ছায়া ঘন হয়ে উঠেছে। বেশ কাছ থেকেই শুনলুম, কে যেন কাকে চেঁচিয়ে ডাকছে। একবার গাভীর গম্ভীর হাম্বারবও শোনা গেল!

খানিক পরে হেমন্ত গাছ থেকে নেমে এল।

বললুম, "কি দেখলে হেমন্ত?"

"যা দেখবার, সব। একটা লম্বা একতলা বাড়ি। ঘর আছে বোধ হয় খান পাঁচ-ছয়। [illegible] অনেক লোকও দেখলুম—বেশ লম্বা-চওড়া, কারুর চেহারাই বাঙালি কুমোরের গড়া [illegible] মতো নয়। বাড়ির ভেতরে নিশ্চয়ই আরও লোক আছে।"

"বাড়িখানা এখান থেকে কত দূরে?"

"খুব কাছে।"

"অতঃপর কি কর্তব্য?"

কিন্তু হেমন্তের সাড়া পাওয়া গেল না। সে নীরবে একবার বটগাছটার চারিপাশ ঘুরে এল। [illegible] বনের পথের দিকে তাকিয়ে দেখলে। তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবতে লাগল। সে এমন গম্ভীরভাব ধারণ করেছে যে, আমরা কেউ তাকে ডাকতে ভরসা করলুম না।

মিনিট পাঁচ-ছয় এইভাবে কাটল। তারপর হেমন্ত হঠাৎ হাসিমুখে যেন নিজের মনেই বললে, "ঠিক, ঠিক! হয়েছে!"

সতীশবাবু বললেন, "কি হয়েছে হেমন্তবাবু? এতক্ষণ কি ভাবছিলেন?

"আক্রমণের প্ল্যান!"

"প্ল্যান?"

"হ্যাঁ। আমি ভেবে দেখছিলুম কোন উপায়ে রক্তপাত না করেই কাজ হাসিল করা যায়।"

"তাহলে রক্তপাত হবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করেন?"

"অসম্ভব কি! এটা তো মুনি-ঋষিদের তপোবন নয়, মানুষ-বাঘের বাসা।"

"ভেবে কি স্থির করলেন?"

"আটজন মিলিটারি পুলিস বন্দুক নিয়ে এই বট গাছটার আড়ালে এমনভাবে লুকিয়ে থাকবে, যেন ওই পথ থেকে কেউ ওদের দেখতে না পায়। বাকি আমরা ছ'জনে মিলে ওই [illegible] কাছে এগিয়ে যাই। তারপর রবীন আর আপনাকে নিয়ে আমি একটু তফাতে গিয়ে [illegible] ঝোপটোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ব। তারপর আমাদের বাকি তিনজন আসামীদের বাড়ির কাছে গিয়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ওদের মধ্যে পড়ে যাবে বিষম সাড়া। আমাদের [illegible] লোক পায়ে পায়ে পিছিয়ে পালাবার ভাবভঙ্গি প্রকাশ করবে। তারপর আসামীরা [illegible] তাড়া করে এলেই আমাদের লোকরা দ্রুতপদে সত্যি সত্যিই পলায়ন করবে বনের পথে। ওরাও তখন নিশ্চয়ই তাদের পিছনে পিছনে ছুটবে—শত্রুসংখ্যা মোটে তিনজন দেখে [illegible] কিছুই ভয় পাবে না। তারপর আমাদের তিনজন লোক এই বটগাছটা পেরিয়ে অল্প [illegible] অগ্রসর হয়েই, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে সুমুখ ফিরে বার করবে তাদের রিভলবার এবং তাদের একজন বাজাবে 'হুইসল'! সঙ্কেত শুনে সেই মুহূর্তেই আটজন মিলিটারি পুলিস [illegible] আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াবে শত্রুদের পিছন দিকে। সামনে তিনটে রিভলবার আর পিছনে আটটা বন্দুক! এ দেখেও তারা যদি আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে [illegible] বন্দুক-রিভলবার ছুড়লেই তাদের যুদ্ধের সাধ মিটতে দেরি লাগবে না। সতীশবাবু, প্ল্যানটা কি আপনার পছন্দ হচ্ছে?"

সতীশবাবু উচ্ছ্বসিতস্বরে বললেন, "পছন্দ হচ্ছে না আবার! এক্ষেত্রে এর চেয়ে নিরাপদ 'প্ল্যান' কল্পনাও করা যায় না! এত তাড়াতাড়ি কি করে যে আপনি ফন্দি আবিষ্কার করেন, আমি তো মশাই বুঝতেই পারি না। ধন্যি মানুষ আপনি—'জিনিয়াস'!"

আমি বললুম, "আর আমরা ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে বসে বসে কি করব হেমন্ত? তোমার গল্প, না মশাদের ঐক্যতান শুনব?"

হেমন্ত বললে, "ও দুটোর একটাও না! শত্রুরা যেই আমাদের লোকের পিছনে তাড়া করে বনের ভেতরে ঢুকবে, আমরাও অমনি ঝোপ থেকে বেরিয়ে পড়ে ঢুকব ওদের বাড়ির অন্দরে। যদি ওদের দলের দু'তিনজন লোক তখনও সেখানে থাকে, তাহলেও আমাদের তিনটে রিভলবারের সামনে ওরা পোষ না মেনে পারবে না! তারপর আমরা খুঁজে দেখব, কোথায় বন্দী হয়ে আছে কলকাতার হারিয়ে যাওয়া তিনটি ছেলে।"

—"কিন্তু ওদের দলকে বনের ভেতরে গ্রেপ্তার করবার পরেও তো বন্দীদের উদ্ধার করা যেতে পারে?"

—"না রবীন, সাবধানের মার নেই। ধর, শত্রুদের সবাই হয়তো বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে না। গোলমাল দেখে ভয় পেয়ে তারা যদি বন্দীদের নিয়ে বনের ভেতর কোন গুপ্তস্থানে পালিয়ে যায়, তখন আমরা কি করব?"

আমি মুগ্ধস্বরে বললুম, "হেমন্ত, এইটুকু সময়ের মধ্যে তুমি সবদিক ভেবে নিয়েছ!"

—"ভাবতে হয় ভাই, ভাবতে হয়! মস্তিষ্ককে যে যথাসময়ে কাজে লাগাতে না পারে, তাকেই পড়তে হয় পদে পদে বিপদে! নাও, আর কথা নয়! সবাই প্রস্তুত হও!"

ত্রয়োদশ

থার্মিট

আমরা তিনজনে একটা ঝোপ বেছে নিয়ে তার ভিতরে বসে দেখলুম, সামনেই সাদা কলি দেওয়া একখানা একতলা বাড়ি। দেখলেই বোঝা যায়, বাড়িখানা নতুন।

বাড়ির সদর-দরজার চৌকাঠের উপরে একজন হৃষ্টপুষ্ট লোক বসে হুঁকো টানছে। তার একটু তফাতেই আর একটা লোকটা গাভীর দুগ্ধদোহন করছে।

বাড়ির সামনে একটুখানি চাতালের মতন জায়গা। সেখানে চারজন লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরস্পরের সঙ্গে কি কথাবার্তা কইছে।

হেমন্ত ঠিক বলেছে, এদের কারুর চেহারাই কার্তিকের মতো নয়, বরং স্মরণ করিয়ে দেয় দুর্গা প্রতিমার মহিষাসুরকে। তাদের জন তিনেককে মনে হল হিন্দুস্তানি বলে।

অনতিবিলম্বেই আমাদের তিনজন লোক বনের ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করলে। দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে তাদের চেষ্টাও করতে হল না। তারা বাইরে আসবামাত্রই সদর দরজার লোকটা সবিস্ময়ে হুকোটা পাশে রেখে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে হেঁড়ে গলায় হাঁকলে, "কে রে! কে রে!"

আমাদের লোকরা দাঁড়িয়ে পড়ল চমকে ও থমকে!

শত্রুদের অন্যান্য লোকেরাও সচকিত দৃষ্টিতে দু'এক মুহূর্ত এমনভাবে তাকিয়ে রইল, যেন আগন্তুকেরা আকাশ থেকে খসে পড়া মানুষ!

আমাদের লোকেরা জড়সড় হয়ে পিছোতে লাগল পায়ে পায়ে।

তারপরেই উঠল মহা হই চই! বাড়ির ভিতর থেকেও আরও চারজন লোক ছুটে এল—ওদের মধ্যে একজনের চেহারা আবার একেবারে যমদূতের মতো, যেমন ঢ্যাঙা তেমনই চওড়া।

আমাদের লোকেরা যেন প্রাণের ভয়েই বনের ভিতরে অদৃশ্য হল।

চাতালের উপরে কতকগুলো ছোটবড় কাটা বাঁশ পড়েছিল। শত্রুরা টপাটপ সেই বাঁশগুলো তুলে নিয়ে মারমূর্তি হয়ে গর্জন করতে করতে ছুটে গিয়ে ঢুকল বনের ভিতরে!

হেমন্ত খুশিমুখে বললে, "বিনা 'রিহার্সালে' আমাদের লোকেরা প্রথম শ্রেণীর অভিনয় করেছে! এখন ওরা শেষরক্ষা করতে পারলেই হয়!"

সতীশবাবু বললেন, "কোন ভয় নেই হেমন্তবাবু! সঙ্গে যাদের এনেছি তারা হচ্ছে বহু যুদ্ধজয়ী বীর। কিন্তু এইবারে আমরাও কি বেরিয়ে পড়ব?"

—"না, আরও মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করা যাক।"

মিনিট দুয়েক কাটল।

হেমন্ত বললে, "আসুন, সৈন্যহীন রণক্ষেত্রে এইবারে আমাদের বীরত্ব দেখাবার পালা! এত গোলমালেও বাড়ি থেকে যখন আর কেউ বেরুলো না, নিশ্চয়ই তখন পথ সাফ! তবু রিভলবারগুলো হাতে নেওয়া ভাল!"

সামনের জমিটা পার হলুম, গাভীটা অবাক হয়ে আমাদের পানে তাকিয়ে রইল, বোধহয় আমাদের মতো ভদ্রচেহারা এ অঞ্চলে সে আর কখনও দেখেনি!

বাড়ির ভিতরে জনপ্রাণীর সাড়া নেই। পাঁচখানা ঘর—সব ঘরের দরজা খোলা। প্রত্যেক ঘরেই ঢুকলুম—কোথাও কেউ নেই।

হেমন্ত বারান্দায় এসে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, "ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না তো!"

হঠাৎ শোনা গেল শিশুর অস্পষ্ট কান্না!

সতীশবাবু চমকে বললেন, "ছেলে কাঁদে কোথায়?"

আমি দৌড়ে দালানের এককোণে গিয়ে দেখলুম, মেঝের উপরে রয়েছে একটা মস্ত চৌকোণা সমতল লোহার দরজা! হাঁটু গেড়ে বসে হেঁট হয়ে দরজায় কান পেতে বললুম, "এইখানে, এইখানে! এরই তলা থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে!"

দরজার উপরে আঘাত করে বুঝলুম, পুরু লোহার পাত পিটে তৈরি। প্রকাণ্ড কড়ায় প্রকাণ্ড কুলুপ লাগানো।

হতাশ স্বরে বললুম, "এ কুলুপ ভাঙা অসম্ভব!"

এবারে ভিতর থেকে কান্না জাগল একাধিক শিশুকণ্ঠের!

সকাতরে একজন কাঁদছে, "ওগো মা গো, ওগো বাবা গো!"

সতীশবাবু দুই কানে হাত চাপা দিয়ে বললেন, "দিনরাত এই কান্না শুনতে শুনতে এরা এখানে বাস করছে! কী পাষণ্ড!"

হেমন্ত দরজার উপরে সজোরে আট দশবার পদাঘাত করলে। দরজা ঝনঝন করে বেজে উঠল।

আমি বললুম, "বৃথা চেষ্টা হেমন্ত! ওই গুণ্ডাগুলো ধরা পড়লে তবেই চাবি দিয়ে এ দরজা খোলা যাবে।"

হেমন্ত বললে, "এখনও তো বনের ভেতরে কোনই সাড়াশব্দ পাচ্ছি না! যদি ওরা পালিয়ে যায়, তাহলেও কি আমরা এই বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই অভাগা শিশুদের কান্না শুনব?"

—"তাছাড়া উপায়?"

—"উপায় আমার এই ব্যাগে!" বলেই হেমন্ত মাটির উপরে উবু হয়ে বসে পড়ল।

হেমন্ত যখনই বাইরে কোন অ্যাডভেঞ্চারে বেরুত, একটি ব্যাগ তার সঙ্গে সঙ্গে থাকত সর্বদাই। তার মধ্যে যে কতরকম বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক রহস্যের উপাদান এবং ছোট ছোট যন্ত্র সাজানো থাকত আমি তাদের হিসাবও জানি না, মর্মও বুঝি না। হেমন্তকে জিজ্ঞাসা করলে বলত, 'এটি হচ্ছে আমার ভ্রাম্যমান 'ল্যাবরেটরি'!' বলা বাহুল্য, ব্যাগটি আজও আছে তার হাতে।

সে ব্যাগ খুলে বার করলে কাচের ছিপি আঁটা দুটি ছোট ছোট শিশি।

প্রচণ্ড কৌতূহলী চোখ নিয়ে সতীশবাবু হেঁট হয়ে দেখতে লাগলেন।

হেমন্ত অপেক্ষাকৃত বড় শিশিটার ছিপি খুলে লোহার দরজার একটা কড়ায় গোড়ায় খানিকটা লালচে রঙের চূর্ণ ঢেলে দিলে। তারপর অন্য শিশিটার ভিতর থেকে আর একরকম চূর্ণ নিয়ে একটা চামচের ভিতরে রাখলে।

ঠিক সেইসময়ে বনের ভিতর থেকে শোনা গেল ধ্রুম, ধ্রুম, ধ্রুম করে পরে পরে তিনটে বন্দুকের আওয়াজ!

হেমন্ত হাসতে হাসতে বললে, "তাহলে বনবাসী বন্ধুরা বশ মানেননি—সেপাইদের সঙ্গে তাঁরা লড়াই করছেন? বেশ, বেশ! কিন্তু যুদ্ধে জিতে ফিরে এলেও দেখবে, তাদের বন্দীশালা শূন্য পড়ে আছে!....সতীশবাবু, তফাতে সরে যান! রবীন, হঠে যাও!"

দূর থেকেই দেখলুম, হেমন্ত একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে চামচের চূর্ণের উপরে ধরলে, চূর্ণ জ্বলে উঠল।

তারপরেই সে চামচের জ্বলন্ত চূর্ণটা লোহার দরজায় ছড়ানো চূর্ণের উপরে ফেলে দিয়েই চোখের নিমিষে লাফ মেরে তফাতে সরে এল।

মুহূর্ত মধ্যে সেখানে জেগে উঠল একটা চোখ-ধাঁধানো ভীষণ তীব্র অগ্নিশিখা—সঙ্গে সঙ্গে চড় চড় পট পট শব্দ! বিষম বিস্মিত চোখে আমরা দেখতে লাগলুম, সেই জ্বলন্ত অংশটা যেন ক্রমে ক্রমে লোহার দরজার ভিতরে বসে যাচ্ছে! তারপরেই হঠাৎ হুড়মুড়-ঝনাৎ করে একটা শব্দ হল—বুঝলুম দরজা খুলে নিচে ঝুলে পড়েছে!

আমি ছুটে গিয়ে দেখলুম, লোহার দরজার একটা পাল্লায় যেখানে ছিল কড়ার গোড়া, সেখানটায় রয়েছে একটা এতবড় ছ্যাঁদা যে, হাতের মুঠো গলে যায় তার ভিতর দিয়ে!

সতীশবাবু হতভম্বের মতন বললেন, "এ কী কাণ্ড?"

হেমন্ত বললে, "থার্মিট!"

—"থার্মিট? ও বাবা, সে আবার কি?"

—"জার্মানির এস্যেন শহরের Goldschmidt নামে এক রসায়নবিদ পণ্ডিত এর আবিষ্কারক। Iron Oxide আর metallic aluminium-এর মিশ্রণে এটি প্রস্তুত। তার উপরে যদি magnesium powder জ্বালিয়ে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে এমন এক ভয়ানক আগুনের সৃষ্টি হয় যে তার তাপ ওঠে fifty-four hundred degrees Fahrenheit পর্যন্ত! থার্মিট যেটুকু জায়গার উপরে ছড়ানো থাকে, লোহার বা ইস্পাতের কেবল সেটুকু অংশই গলিয়ে দেয়।"

সতীশবাবু বললেন, "লোহার সিন্দুকের উপরে যদি এই থার্মিট ব্যবহার করা হয়?"

—"তারও দুর্দশা হবে এই দরজাটার মতো!"

—"বাব্বাঃ! হেমন্তবাবু, এত বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি নিয়ে আপনি চোর হলে কলকাতার আর রক্ষে থাকত না!"

—"এখন গল্প রাখুন মশাই, বনের ভিতর কি হচ্ছে জানি না—আগে বন্দীদের উদ্ধার করুন!"

লোহার দরজার তলায় একটা সিঁড়ি। তারপরেই অন্ধকার!

সতীশবাবু কোমলস্বরে ডাকলেন, "নিচে কে আছ খোকাবাবুরা! বেরিয়ে এস—বেরিয়ে এস! আর তোমাদের ভয় নেই! আমরা তোমার মা-বাবার কাছ থেকে এসেছি!"

সিঁড়ির তলায় অন্ধকারের ভিতর থেকে উঁকি মারতে লাগল, তিনখানি শীর্ণ কাতর কচিমুখ—উদভ্রান্ত তাদের চোখের দৃষ্টি!

বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল।

হেমন্ত বললে, "সতীশবাবু, খোকাদের ভার আপনার উপরে—আমি গোলমালটা কিসের শুনে আসি! এস রবীন!"

বাইরে গিয়ে দেখলুম, ইনস্পেক্টার, সাব-ইনস্পেক্টার ও জমাদার আসছে রিলবার হাতে আগে আগে, তারপরেই এখানকার দুশমন চেহারার গুণ্ডাগুলো—তাদের প্রত্যেকেরই হাতে হাতকড়া এবং সব পিছনে বন্দুকধারী আটজন মিলিটারি পুলিস। গুণে দেখলুম, বন্দীরা সংখ্যায় দশজন।

হেমন্ত আনন্দিত কণ্ঠে বলে উঠল, "যাক—বন্দুকের শব্দ শুনে আমার দুশ্চিন্তা হয়েছিল। এখন বোঝা যাচ্ছে, বন্দুক ছোড়া হয়েছে কেবল এদের ভয় দেখাবার জন্যেই! বুঝেছ রবীন, বিনা রক্তপাতেই কেল্লা ফতে—চমৎকার! আমি বৈষ্ণবের ছেলে, রক্তপাত ভালবাসি না!"

চতুর্দশ

কেউ হাসে, কেউ কাঁদে

কলকাতায় এসেছি। ইনস্পেক্টারের সঙ্গে শ্যামলপুরের জমিদারপুত্র ও লৌহব্যবসায়ী পতিতপাবন নন্দীর পুত্রকে পাঠিয়ে দেওয়া হল যথাস্থানে।

সতীশবাবু দুর্জয়-গড়ের যুবরাজকে নিয়ে প্রাসাদের সামনে গাড়িতে অপেক্ষা করতে লাগলেন—রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করবার জন্যে হেমন্তের সঙ্গে আমি ঢুকলুম রাজবাড়ির ভিতরে। আজকেই হচ্ছে মাসের চব্বিশ তারিখ।

হেমন্ত কার্ড পাঠিয়ে দিলে। পাঁচমিনিট যেতে না যেতেই ভৃত্য এসে আমাদের মহারাজা বাহাদুরের ড্রয়িং-রুমে নিয়ে গেল।

একখানা কৌচের উপরে মহারাজা বাহাদুর চার-পাঁচটা 'কুশনে' মাথা রেখে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছেন—তাঁর চোখের কোলে গাঢ় কালির রেখা, মুখ যেন বিষণ্ণতার ছবি। কৌচের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মিঃ গাঙ্গুলি।

আমাদের দেখে মহারাজা ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। তারপর বিরক্তমুখে বললেন, "হেমন্তবাবু, আপনি কি আজ মজা দেখতে এসেছেন?"

হেমন্ত বললেন, "সে কি মহারাজ, আপনার দুঃখ-শোক কি আমার পক্ষে কৌতুককর হতে পারে?"

—"তাছাড়া আর কি বলব বলুন? শুনলুম আপনি আমার মামলা ছেড়ে দিয়ে গেছেন হাওয়া খেতে।"

—"একথা কে আপনাকে বললে?"

—"গাঙ্গুলি।"

—"মিঃ গাঙ্গুলি!"

—গাঙ্গুলি বললেন, "চোরকে পনের লাখ টাকা দিয়ে আপনি যুবরাজকে ছাড়িয়ে আনতে বলেছিলেন, আমি কেবল সেই কথাই মহারাজা বাহাদুরকে জানিয়েছিলুম।"

মহারাজা বললেন, "ও কথা বলা আর মামলা ছেড়ে দেওয়া একই কথা!"

—"নিশ্চয়ই নয়।"

দীপ্তচক্ষে মহারাজা বললেন, "আমার সামনে এত বেশি চেঁচিয়ে জোর জোর কথা বলবেন না হেমন্তবাবু! আমার পদমর্যাদা ভুলে যাবেন না।"

—"পদমর্যাদা? পদসেবা জীবনে কখনও করিনি, কাজেই কারুর পদের মর্যাদা নিয়ে মাথাও ঘামাইনি কখনও।" হেমন্ত হাসতে হাসতে বললে, অত্যন্ত সহজভাবে।

এরকম স্পষ্ট কথা শুনতে বোধহয় মহারাজা বাহাদুর অভ্যস্ত নন, তিনি বিপুল বিস্ময়ে হেমন্তের মুখের পানে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন।

গাঙ্গুলি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, "হেমন্তবাবু, ওসব বাজে কথা যেতে দিন—মহারাজা বাহাদুরের মেজাজ আজ ভাল নয়। ভুলে যাবেন না, আজ হচ্ছে মাসের চব্বিশ তারিখ।"

হেমন্ত বললে, "আমি কিছুই ভুলিনি মিঃ গাঙ্গুলি! আজ মাসের চব্বিশ তারিখ বলেই আমি এখানে এসেছি।"

মহারাজা ভুরু কুঁচকে বললেন, "হ্যাঁ, মজা দেখতে। আমার যাবে পনের লক্ষ টাকা জলে, আর আপনি দেখবেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা!"

—"আমি মজা দেখতে আসিনি মহারাজ, মজা দেখাতে এসেছি।"

—"এ কথার অর্থ?"

—"অর্থ হচ্ছে প্রথমত, আপনার পনের লক্ষ টাকা জলে পড়বে না, স্থলেই থাকবে—অর্থাৎ ব্যাঙ্কে।"

—"অর্থটা আরও জটিল হয়ে উঠল। নয় কি গাঙ্গুলি?"

গাঙ্গুলি বললেন, "আমি তো অর্থই খুঁজে পাচ্ছি না। এ হচ্ছে অর্থহীন কথা।"

হেমন্ত হেসে বললে, "আচ্ছা, সতীশবাবু এসেই এর অর্থ বুঝিয়ে দেবেন। তিনি গাড়িতে বসে আছেন—ডেকে পাঠান।"

মহারাজা বললেন, "যাও তো গাঙ্গুলি, সতীশবাবুকে এখানে নিয়ে এস।"

গাঙ্গুলি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হেমন্ত বললে, "মহারাজ, প্রথমে আমি ভেবেছিলুম, কলকাতার নিজস্ব কোন ছেলেধরার দল যুবরাজকে চুরি করেছিল। কারণ আপনারা কলকাতায় আসবার আগেই চুরি গিয়েছিল আরও দুটি ছেলে। কিন্তু তারপরেই আমার ভ্রম বুঝেছি। এখন জানতে পেরেছি যে, প্রধানত পুলিসের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করবার জন্যেই প্রথম ছেলেদুটি চুরি করা হয়েছিল। কিন্তু চোরের আসল উদ্দেশ্য ছিল দুর্জয়-গড়ের যুবরাজকেই চুরি করা।"

মহারাজা ফ্যালফ্যাল করে হেমন্তের মুখের পানের তাকিয়ে বললেন, "আপনার কোন কথারই মানে আজ বোঝা যাচ্ছে না।"

ঠিক এইসময়ে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল সতীশবাবুর সঙ্গে দুর্জয়-গড়ের যুবরাজ।

মহারাজা নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না—হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন স্তম্ভিত চক্ষে!

—"বাবা, বাবা!" বলে চেঁচিয়ে উঠে যুবরাজ ছুটে গিয়ে পিতার কোলের ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ছেলেকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে মহারাজা খানিকক্ষণ আচ্ছন্নের মতন হয়ে রইলেন—তার দুই চোখ ছাপিয়ে ঝরতে লাগল আনন্দের অশ্রু!

তারপর আত্মসংবরণ করে দুই হাতে ছেলের মুখ ধরে তিনি বললেন, "খোকন, খোকন, এতদিন তুই কোথায় ছিলি বাছা?"

—"আমাকে ধরে রেখিছিল বাবা!"

—"কে?"

—"তাদের চিনি না তো!"

—"কে তোকে ফিরিয়ে এনেছে?"

যুবরাজ ফিরে আঙুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিলে।

মহারাজা ব্যস্তভাবে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "অ্যাঁঃ, আপনারা? আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছেন আপনারা? আপনাদের এখনই আমি পুরস্কার দেব—কল্পনাতীত পুরস্কার! আমার চেকবুক কই? গাঙ্গুলি, গাঙ্গুলি!"

সতীশবাবু বললেন, "মিঃ গাঙ্গুলি তো এখন আসতে পারবেন না, মহারাজ! তিনি একটু বিপদে পড়েছেন।"

—"বিপদ? গাঙ্গুলি আবার কি বিপদে পড়ল?"

—"তিনি বাইরে গিয়ে যেই দেখলেন গাড়ির ভেতরে আমার পাশে বসে আছেন যুবরাজ, অমনি হরিণের মতন ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। তখনই আমার পাহারাওয়ালারা গিয়ে তাঁকে ধরে ফেললে। এতক্ষণে হাতে তিনি লোহার বালা পরেছেন।"

মহারাজা ধপাস করে কৌচের উপরে বসে পড়ে বললেন, "আবার সব মানে গুলিয়ে যাচ্ছে—সব মানে গুলিয়ে যাচ্ছে!"

হেমন্ত বললে, "কিছু গুলোবে না মহারাজা! সব আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।...মামলাটা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি দৈবগতিকে একটা সাঙ্কেতিক শব্দে লেখা বিজ্ঞাপন দেখে আবিষ্কার করে ফেলেছিলুম যে, কলকাতায় কেউ আমেরিকান অপরাধীদের অনুকরণে ছেলে ধরবার জন্যে গুণ্ডার দল গঠন করেছে। সে দলপতি হলেও গুণ্ডাদের সঙ্গে প্রকাশ্যে মেলামেশা করে না—অনেক কাজই চালায় সাঙ্কেতিক লিপির দ্বারা। সে যে যুবরাজকে কোন দ্বীপে লুকিয়ে রেখেছে, এও টের পেলুম। তার নিজের হাতে লেখা এক পত্র পেয়ে আরও আন্দাজ করলুম, সে আমেরিকা ফেরত, কারণ যে চিঠির কাগজ সে ব্যবহার করেছে তা কালিফোর্নিয়ায় তৈরি, কলকাতায় পাওয়া যায় না। তারপর রাজবাড়িতে এসে খোঁজ নিয়ে যখন জানলুম যে, আপনার সঙ্গে গাঙ্গুলিও আমেরিকায় গিয়েছিল, তখন প্রথম আমার সন্দেহ আকৃষ্ট হয় তার দিকেই। তারপর একদিন গাঙ্গুলি নিজেই তার মৃত্যুবাণ তুলে দিলে আমার হাতে। কোন খেয়ালে জানি না, মহারাজের কাছ থেকে পুরস্কার ঘোষণার বিজ্ঞাপন লেখবার ভার পেয়ে সে আমাদের সাহায্য গ্রহণ করলে। রবীনের মুখে ভাষা শুনে সে নিজের হাতে লিখে নিলে। আর তার সেই হাতের লেখা হল আমার হস্তগত। সাঙ্কেতিক লিপির লেখার সঙ্গে তার হাতের লেখা মিলিয়েই আমার আর কোন সন্দেহই রইল না।"

মহারাজা অভিযোগ ভরা কণ্ঠে বললেন, "সব রহস্য জেনেও আপনি তখনই ওই মহাপাপী সাধুর মুখোশ খুলে দেননি!"

—"দিইনি তার কারণ আছে মহারাজ! অসময়ে গাঙ্গুলিকে গ্রেপ্তার না করবার তিনটে কারণ হচ্ছে : ওইটুকু প্রমাণ আমার পক্ষে যথেষ্ট হলেও আদালতের পক্ষে যথেষ্ট নয়। গুণ্ডার দল তখনও ধরা পড়েনি। দলপতির গ্রেপ্তার হবার খবর পেলে গুণ্ডারা হয়তো প্রমাণ নষ্ট করবার জন্যে যুবরাজকে হত্যা করতেও পারত।"

—"ঠিক, ঠিক! হেমন্তবাবু, আপনার কৃতজ্ঞতার ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না। আপনি কি পুরস্কার চান বলুন।"

—"পুরস্কার? আমি পুরস্কারের লোভে কোন মামলা হাতে নিই না। ভগবানের দয়ায় আমার কোন অভাব নেই। আমি কাজ করি কাজের আনন্দেই।"

—"না, না, পুরস্কার আপনাকে নিতেই হবে।"

—"নিতেই হবে? বেশ, ও বিষয় নিয়ে আপনি সতীশবাবুর সঙ্গে কথা কইতে পারেন। ...ওঠ হে রবীন! মহারাজকে প্রণাম করে আমি এখন সবেগে পলায়ন করতে চাই!"

কাপালিকের কবলে

কাপালিকের কবলে

এক

সেদিন সকালবেলা।

প্রখ্যাত রহস্যসন্ধানী জয়ন্ত আর মানিক বসে বসে সেদিনের খবরের কাগজ পড়ছিল। প্রতিদিনের খবরের কাগজ একান্তভাবে মন দিয়ে পাঠ করা জয়ন্তর দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। তাছাড়া তেমন কোনও প্রয়োজনীয় খবর দেখলে সে সেই অংশটুকু কেটে আটকে রেখে দেয় তার সংগ্রহের খাতায়।

দুজনে কাগজের বিভিন্ন পাতা তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফেলল। জয়ন্ত বললে—দূর সেই সব একেঘেয়ে খবর—কে ডাণ্ডা মেরে কার মাথা ফাটাল, কে ছোরা দেখিয়ে টাকা নিয়ে পালাল। এ সব তো অতি সাধারণ কেস। কিন্তু তেমন জটিল বা জবরদস্ত কেস একটাও চোখে পড়ছে না।

এমন সময় বাইরের বারান্দায় ভারি পায়ের শব্দ শুনে জয়ন্ত বললে—মানিক, সুন্দরবাবু আসছেন। হরিকে বল, চা ও প্রাতরাশের ব্যবস্থা করতে।

মানিক উঠে গেল ভেতরে। একটু পরেই সুন্দরবাবুর প্রবেশ। ভারি কণ্ঠে বললেন—কি হে জয়ন্ত, শরীর ভাল তো?

জয়ন্ত হেসে বললে—আমার শরীর তো চট করে খারাপ হবার নয়, তা তো জানেন। তবিয়ত ঠিক রাখার জন্য সাধনা করতে হয়। যখন কাজ থাকে না, তখন দেহের তোয়াজ করি।

সুন্দরবাবু হেসে বললেন—সে তো জানি ভায়া। তা একটা বিশেষ কাজে তোমার কাছে আসতে হল।

জয়ন্ত জানে, পুলিস অফিসার সুন্দরবাবু বিশেষ কাজ ছাড়া তার কাছে আসেন না। তাই সে হেসে বলল—কাজ ছাড়া যে আপনি আসেন না তা তো জানি।

সুন্দরবাবু শুধু বললেন—হুম!

এমন সময় মানিকের সঙ্গে হরি প্রবেশ করল ঘরে প্রাতরাশ নিয়ে।

জয়ন্ত সেদিকে চেয়ে বলল—নিন সুন্দরবাবু শুরু করুন। আজকের প্রাতরাশ খুব সামান্য মাত্র। ডিমের পোচ, চিকেন স্যাণ্ডউইচ, ব্রেড বাটার, মাটন চপ আর কফি।

সুন্দরবাবুর চোখদুটি সেদিকে পড়েই আনন্দে একবার দপ করে জ্বলে উঠল। জয়ন্ত ও মানিক দুজনে যা খেল তিনি একাই তার দ্বিগুণের বেশি উদরসাৎ করলেন। গোটা ছয়েক পোচ, ছ'পিস ব্রেড বাটার, ছ'খানা স্যাণ্ডউইচ আর চারটি মাটন চপ খেয়ে পর পর দু'কাপ কফি পান করলেন সুন্দরবাবু। তারপর একটা ঢেঁকুর তুলে বললেন—হুম! এবারে আমার বক্তব্যটা শোনো জয়ন্ত!

জয়ন্ত আর মানিকের প্রাতরাশ ও কফি পান আগেই শেষ হয়েছিল। মানিক চিরদিনই সুন্দরবাবুর সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করতে অভ্যস্ত। তাই সে বললে—আপনার সব চিন্তাগুলো ওই খাবারের স্তূপে চাপা পড়ে যায়নি তো সুন্দরবাবু?

সুন্দরবাবু বললেন—থামো তো ডেপো ছোকরা। খাবার গেল পেটে আর চিন্তা আছে মনে। খাবার কি করে চিন্তাকে চাপা দেবে শুনি?

তা বটে, তা বটে। বলে মানিক হাসল একটু।

সুন্দরবাবু বললেন—ঘটনাটা হল, পলাশপুরের জমিদাররা তিনপুরুষ ধরে কলকাতায় বাস করেন। অবশ্য জমিদাররা এখন নেই, তবে জোতদারি দেশে আছে। আর কলকাতায় আছে ব্যবসা-বাণিজ্য। মোটামুটি তাই দিন ভালই কাটে। তাঁর একমাত্র পুত্র গত তিনদিন হল নিখোঁজ। তিনি আবার এক এম এল এ-র বন্ধু। ফলে মিনিস্ট্রি মহল থেকে চাপ এসে পড়েছে। আমাদের তো নাভিশ্বাস উঠেছে। কি যে করি, তার ঠিক নেই। চাকরি রাখা দায়। ওই ব্যাপারে যদি কোনও সাহায্য পাই, সেই আশায়—

—এ খবরটা তো কাগজে কাল পড়েছি।

—হ্যাঁ।

—তা ছেলেটার বয়স কত হবে?

—বয়স তার কত হবে? বর্তমান জমিদারের বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। তার তিন মেয়ের পর এক ছেলে। সবার ছোট একমাত্র ছেলে। তাই আদর খুব। বয়স ধরো বছর ছয় হবে।

—এটুকু ছেলে অদৃশ্য হল কি করে? আশ্চর্য ঘটনা তাতে সন্দেহ নেই।

—এঁদের বিরাট দোতলা বাড়ি শোভাবাজার অঞ্চলে। তবে বাড়ির পিছন অর্থাৎ খিড়কির দিকেও একটা দরজা ছিল। ওই দরজা দিয়ে পিছনের গলিতে যাওয়া যায়। সামনে দারোয়ান থাকে। সে খোকাকে বের হতে দেখেনি—অথচ বেলা একটা থেকে তিনটের মধ্যে ছেলে উধাও।

জয়ন্ত বললে—ছেলে প্রধানত তিনটি কারণে উধাও হয় সুন্দরবাবু। প্রথম হল, তাদের ধরে চোখ কানা, হাত ভাঙা ইত্যাদি করে তারপর জিভ কেটে ভিক্ষে করানো হয়। এ দল পৃথক দল। এরা অনেক ছেলে এমনি পোষে। এক একটা ছেলে রোজ দশ-বার টাকা করে উপার্জন করে, অথচ তারা মাত্র দু'টাকা মতো খেতে পায়। এটা বলে ভিখিরি ব্যবসা। তাই অনেক বুদ্ধিমান লোক ছোট ছেলে ভিখিরিদের পয়সা দেয় না।

দ্বিতীয় কারণ হল, ছেলে চুরি করে মোটা টাকা মুক্তিপণ দাবি করা। বিদেশে এটা বেশি হয়। এদেশে নয়। পৃথিবীর বিখ্যাত সেই লিণ্ডেনবার্গ হত্যারহস্যও সেই মুক্তিমূল্য আদায়ের জন্য শিশুচুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করেছিল।

শিশুচুরির তৃতীয় কারণ হল, শিশুদের ধরে নিয়ে গিয়ে বিদেশে বিক্রি করা হয়। সাধারণত মেয়েদের ধরেই এভাবে বিদেশে বিক্রি করা হয়। অনেক পুরুষদেরও তা করা হয়—তবে তাদের ক্রেতা মেলে না, তাই এ সন্দেহ থেকে এ ঘটনাকে বাদ দেওয়া যায়। যাই হোক, কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে এই চুরি করেছে তা যদি খুঁজে বের করতে হয়, তাহলে সবার আগে অকুস্থলে যাওয়া কর্তব্য। তাই নয় কি?

—তা বটে। বললেন সুন্দরবাবু। তাহলে চলো আমরা সেখান থেকে ঘুরে আসি।

জয়ন্ত বললে—সুন্দরবাবু কি এর আগে সেখানে গিয়েছিলেন নাকি?

সুন্দরবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—হুম! তা গিয়েছিলাম বটে। তবে কোনও সূত্র দেখতে পাইনি।

জয়ন্ত বললে—আমরাও যে সূত্র পাব তেমন কোনও কথা নেই। তবে চলুন দেখা যাক কতদূর কি হয়। মানিক, তুমি ভাই দীপাকে নিয়ে এসো।

সুন্দরবাবু বললেন—দীপা আবার কে? মেয়ে গোয়েন্দা নাকি?

জয়ন্ত হেসে বললেন—এক হিসেবে তা বলতে পারেন। দীপা হল একটি মেয়ে কুকুর। বিমলবাবুর বাঘার মতো এরও ঘ্রাণশক্তি খুব তীব্র। তার উপরে নিয়মিত ট্রেনিং দিতে হচ্ছে একে। আশাকরি কোনও একদিন নিশ্চয় এ সফল হবে হয়তো বিরাট কোনও একটা তদন্তে।

সুন্দরবাবু বললেন—দেখা যাক চলো। আবার আমরা শোভাবাজারের দিকে যাত্রা করি।

ততক্ষণে মানিক দীপাকে নিয়ে এসেছিল। তারা বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলল শোভাবাজারের দিকে।

দুই

শোভাবাজারের রাজবাড়ি দোতলা হলেও আকারে তা বিরাট, দু'টি তলা মিশিয়ে প্রায় বাইশখানা ঘর।

বোঝা যায়, এককালে এঁরা বিরাট ধনী ছিলেন। বর্তমানে সেং অর্থের গৌরব না থাকলেও অবশ্য দারিদ্রের মধ্যে এরা এসে পড়েননি তা বোঝা যায়।

বর্তমানে যিনি স্টেটের মালিক সেই বীরেন্দ্রনারায়ণ এসে সুন্দরবাবুকে অভ্যর্থনা করলেন। জয়ন্ত বা মানিককে তিনি চেনেন না—যেহেতু তাদের গায়ে কোনরকম ইউনিফর্ম ছিল না।

সুন্দরবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন সবার সঙ্গে। পরিচয় পেয়ে বীরেন্দ্রনারায়ণ সুখী হলেন।

যে ঘরে বসে কথা হচ্ছিল তার সামনে দেখা দিল বিরাট একটা চিত্র। চারধারে এই বংশের পূর্বপুরুষদের চিত্র—কিন্তু সামনে একটা বিরাট সন্ন্যাসীর চিত্র কেন? সন্ন্যাসীটি কে?

জয়ন্তের কথাটা মনে হল। সে বলল—বীরেনবাবু, আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব আপনাকে! আশাকরি সঠিক উত্তর দেবেন।

—নিশ্চয়ই। আমার ছেলে অদৃশ্য হবার পর থেকে আমার স্ত্রী প্রায় অজ্ঞান। যদি সত্বর তাকে খুঁজে বের করতে না পারেন, তবে তার জীবনও সংশয় হবে।

—বুঝেছি।

—তা এবার বলুন কি জানতে চান।

—আপনার ছেলে কবে অদৃশ্য হয়?

—পরশু দিন বেলা দু'টো নাগাদ।

—সে কোথায় ছিল?

—সে তার ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। আমার স্ত্রী নানা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত ছিল। প্রায় বেলা বারটা নাগাদ আমি তাকে দেখে অফিসে যাই। তারপর বাড়ির সামনে দিয়ে সে বের হয়নি। পিছনের দরজা—মানে খিড়কির দরজা খোলা দেখা যায়। তাতে মনে হয়, ওই পথ দিয়ে বের হয়েছিল। বেলা প্রায় একটা নাগাদ আমার স্ত্রীর দাসী তাকে ঘরে দেখেছিল। তারপরেই বেলা তিনটেতে এসে তাকে দেখতে পায়নি।

—ঠিক আছে। এবার বলুন তো—কাউকে সন্দেহ হয়?

—না সন্দেহ কাউকে হয় না। কারণ আমার বংশের মধ্যে আমিই একমাত্র সন্তান। আর আমার ছেলে নরেন্দ্র হল আমার একমাত্র পুত্রসন্তান। —তাই উত্তরাধিকার ব্যাপারে—

—আচ্ছা, আপনার ঘরে ওই বিরাট যে ছবিটি আছে ওটা কার ছবি? গলায় রুদ্রাক্ষ মালা—তেজস্বী পুরুষ—

—উনি আমাদের গুরুদেব। উনি তান্ত্রিক, বিরাট সন্ন্যাসী। তবে বর্তমানে জীবিত নেই। তাঁর প্রধান শিষ্য আছেন—আমার গুরু দাদা। তিনি থাকেন ও সাধনা করেন পলাশপুরের শ্মশানে। তিনিও তন্ত্রসাধনা করেন।

—আচ্ছা কেউ কি কখনও আপনাকে ভয় দেখিয়ে চিঠি লেখে?

—কি রকম?

—যেমন, এত টাকা চাই—না হলে ক্ষতি হবে—

—না না। টাকা যে বর্তমানে আমাদের বিশেষ নেই, তা সকলে জানে। তাই এটা নিরর্থক প্রশ্ন জয়ন্তবাবু।

—আচ্ছা আপনার গুরুদেবের প্রধান শিষ্য কি এখানে কখনও এসেছেন?

—বলেন কি? আমার ছেলে নরেন্দ্র অদৃশ্য হবার মাত্র দু'দিন আগে তিনি আসেন। তিনি নরেন্দ্রকে একটি মূল্যবান মালা উপহার দেন। রুদ্রাক্ষ মালা। সেটা ড্রয়ারে আছে।

—সেখানা একবার দেখাবেন কি?

—নিশ্চয়ই।

বীরেন্দ্রনারায়ণ তক্ষুণি উঠে গিয়ে মালাটা এনে জয়ন্তর হাতে দিলেন।

সুন্দরবাবু ঠাট্টা করে বললেন—জয়ন্ত, তুমি কি শেষে মালা জপ করতে শুরু করে দেবে নাকি?

জয়ন্ত বললে—না না, তা নয়,—দেখুন না।

জয়ন্ত মালাটা দীপাব নাকের কাছে ধরল। দীপা দু-একবার সেটা শুঁকে শব্দ করল—গ র্ র্ র্...

জয়ন্ত বললে বীরেন্দ্রবাবুকে—আচ্ছা আপনাদের খিড়কির দরজাটা একবার দেখাতে পারেন?

—নিশ্চয়ই, আসুন আমার সঙ্গে।

জয়ন্ত সদলে খিড়কির দরজাতে গিয়ে দাঁড়াল। দীপা একমনে সেখানকার মাটি শুঁকতে লাগল।

জয়ন্ত বললে—বীরেনবাবু, এদিকে লোকজন তো বিশেষ আসে না। তাই না?

—ঠিক বলেছেন জয়ন্তবাবু।

এদিকে দীপা মাটি শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে চলেছিল। তাকে বাধা দিল জয়ন্ত। চেন টেনে ধরল। দীপা জোরে জোরে চিৎকার করে উঠল—ভৌ ঔ ঔ...

তিন

জয়ন্ত ফিরে এল তার বাড়িতে। সঙ্গে সুন্দরবাবুও ছিলেন।

জয়ন্ত বললে—সুন্দরবাবু, কেসটা খুব খারাপ বলে মনে হচ্ছে আমার।

—কেন?

—কারণ হল, ছেলে চুরি সম্পর্কে যে তিনটি বিষয়ের কথা আমি আগে বলেছিলাম, তার সঙ্গে এটি মিলছে না মোটেই।

সুন্দরবাবু বললেন—হুম। তাহলে ব্যাপারটা কি বল তো।

—দীপার মালা শোঁকা দেখে বুঝতে পারেননি?

—কিছুটা আন্দাজ করেছি ভায়া। মনে হয় ওই মালাটা যে দিয়েছে, তার গায়ের গন্ধ দীপা মালাতে পেয়েছে। আর ওই খিড়কির দরজাতে সেই গন্ধের রেশ পেয়েছে পায়ের ছাপে। তার মানে—

—মানে যে তান্ত্রিক গুরুভাই মালাটা দিয়েছিল, সেই সেদিন লুকিয়ে খিড়কিতে এসেছিল।

সুন্দরবাবু বললেন—হুম! তাহলে ওই তান্ত্রিক গুরুভাইটির ছেলেটি চুরি করা সম্ভব। কিন্তু তাতে তার লাভ কি?

—লাভ বিরাট। সেটা পার্থিব নয়—বলা যেতে পারে পরমপার্থিব লাভের একটা কুসংস্কার-পূর্ণ ধারণা।

—সেটা কি রকম?

—অনেক তান্ত্রিক, কাপালিক প্রভৃতি ভূত-প্রেত বা তাল-বেতাল সিদ্ধ হয় জানেন তো? এই সিদ্ধি তারা সত্যি লাভ করে বা করে না তা বলা কঠিন। তার সিদ্ধিলাভটা যে তপ দ্বারা অন্য কুপথে হয় তাও সঠিক বলা চলে না। তবু আজও সে কু-ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক তান্ত্রিক, কাপালিক প্রভৃতিরা নরবলি দেয়। তবে কেউ স্বেচ্ছায় নিজের ছেলেকে বলি দেয় না তাই তারা অনেক সময়ই ভাল সুলক্ষণযুক্ত, নিখুঁত ছেলে পেলে তাদের চুরি করে।

সুন্দরবাবু বললেন—সর্বনাশ, তাহলে কি এতক্ষণে তাকে বলি দেওয়া হয়ে গেছে।

—আমার মনে হয়, না হয়নি।

—সেটা তুমি কি করে বলছ?

জয়ন্ত বললে—দেখুন সুন্দরবাবু, অনুমান বলে একটা কথা আছে জানেন তো। যদি গোয়েন্দার অনুমানশক্তি প্রখর না হয়, তবে সে সফলতা লাভ করতে পারে না। বুঝলেন?

—এটা আমি মানি। তা ব্যাপারটা কি বলো জয়ন্ত। কি করে তুমি বলছ যে নরেন্দ্র এখনও বেঁচে আছে?

—দেখুন এই সব কাপালিকরা সাধনা করে অমাবস্যায়। কারণ অমাবস্যাতে না হলে সিদ্ধিলাভ হয় না। তাছাড়া কতকগুলি বিশেষ অমাবস্যা আছে। যেমন এ মাসে হচ্ছে ভাদ্র মাসের অমাবস্যা। এটি বিশেষ ধরনের অমাবস্যা—কারণ এই ভাদ্র মাসের অমাবস্যা প্রেতসাধনা, বেতাল সাধনা ইত্যাদির পক্ষে প্রশস্ত। আর তাই ঠিক এই অমাবস্যার আগে চুরিটা হয়েছে। বলে জয়ন্ত একটু নস্যি নিয়ে মৃদু হাসল।

সুন্দরবাবু বললেন—তাহলে ভায়া তোমার মতে আগামী মঙ্গলবার মানে পরশু যে অমাবস্যা—

সুন্দরবাবু বাংলা ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে কথাটা বললেন।

জয়ন্ত বললে—হ্যাঁ—ওই দিন সন্ধ্যার পর আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ওই দিন রাতে পলাশপুরের শ্মশানে হানা দিলেই আমরা সফল হব।

কিন্তু কোথায় যে এই সব পূজা, সাধনা প্রভৃতি করবে, তা জানা যাবে কি করে?

—অতি সহজে। দীপা তার পায়ের ও গায়ের গন্ধ চেনে। সে ঠিক খুঁজে বের করবে।

সুন্দরবাবু আমাদের সঙ্গে বলে উঠলেন—ভেরি গুড—ভেরি গুড—ব্যাটাকে ঠিক বাগে পাওয়া গেছে। তবে সে কি এ কাজ প্রথম করছে না আগেও করেছে?

—তা আমি বলতে পারব না। এই সব তান্ত্রিকেরা যে শতাধিক নরবলি দেয় এমন ঘটনাও জানা গেছে।

—আমরা অভিযানের জন্য রেডি হতে পারি?

—নিশ্চয়! আর ওই সময়ের আগে পলাশপুরের ও. সি-কে একটা তার করে দিন বা ফোনে জানিয়ে দিন যে আমরা অভিযানে বের হব এবং সেখানে যাব। তবে বিস্তারিত কিছু জানাবেন না।

—ঠিক আছে।

সুন্দরবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

চার

অমাবস্যার গভীর রাত। সারা বিশ্বপ্রকৃতি যেন থম থম করছে। আকাশে কালো মেঘ। চাঁদ নেই—তারাটা পর্যন্ত মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে।

এমনই ভয়াবহ রাতে পলাশপুরের শ্মশানটা যেন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এত রাতে লোকজন কেউ পথে বের হয় না। আর শ্মশানের দিকে তো ভয়ে কেউ আসেই না এমন রাতে। কারও বাড়িতে রাতে কেউ মারা গেছেন, পরদিন সকালে তাকে শ্মশানে আনা হয়। রাতে আসতে কেউ সাহস পায় না।

এমনই রাতে শ্মশানের কালী মন্দিরের থেকে কিছু দূরে একটা নির্জন অংশে বসে সাধনা করছিল একজন কাপালিক।

তার গলায় হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। বয়স প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ। পরনে টকটকে লাল একটা কাপড়।

তার সামনে একটা ভয়াবহ মহাভৈরবের মূর্তি। মূর্তিটা পাঁচটি মড়ার খুলির উপর রাখা। তার সামনে আর একটা বড় মড়ার খুলির পাত্র থেকে কারণ পান করছে। চোখ দুটো তার টকটকে লাল।

তার পাশে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে। বোধহয় শ্মশান থেকে মৃতদেহটা টেনে এনেছে। অন্য পাশে একটা পায়রা, একটা মুরগি, একটা কালো পাঁঠা বাঁধা। তার পাশে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছে একটা ছেলে। তার দু'টি চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠেছে। মাঝে মাঝে সে 'মা মা' বলে কাঁদছে।

এত রাত্রে এই নির্জন শ্মশানে যে কেউ আসবে না, এ বিষয়ে কাপালিক নিশ্চিন্ত। তাই সে ওই শিশুর কান্না নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। তার সামনে একটা আগুন জ্বলছে। মাঝে মাঝে সে আগুনে ফল, বেলপাতা, ঘি প্রভৃতি আহুতি দিচ্ছে আর উচ্চস্বরে কি সব মন্ত্রপাঠ করে চলেছে।

অবশেষে এক সময় মন্ত্রপাঠ শেষ হল। কাপালিক উঠে গিয়ে পায়রাটা টেনে নিল। তার ডানার বাঁধন কেটে দিল সে। তারপর মন্ত্র পড়ে তার পাশে রাখা খাঁড়াটা দিয়ে এক কোপে

তার মাথাটা কেটে ফেলল। কাটা মাথাটা সে ফেলে দিল আগুনের মধ্যে। তারপর ওই পায়রার রক্ত কয়েক ফোঁটা সে ঢেলে দিল পাশের মড়াটার মুখে।

তারপর আরও কিছুক্ষণ মন্ত্র পড়ে সে মুরগিটা টেনে নিল। ততক্ষণে আগুনে পায়রার মাথাটা পুড়ে গেছে। এবার ওই একই ভাবে এক কোপে মুরগিটাকে কেটে ফেলল। তার মাথাটাও সে ওই জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র পড়ে সে কিছুটা মুরগির রক্ত ঢেলে দিল মড়াটার মুখে।

এই সব ভয়াবহ কাণ্ড দেখে বসে থাকা বালকটি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সে তার বাঁধন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করল। তবে বাঁধন খুলতে পারল না সে। তখন সে উচ্চকণ্ঠে 'মা মা' বলে কাঁদতে লাগল। কিন্তু সে করুণ কান্নাতেও কাপালিকের হৃদয় এতটুকু গলল না। সে যথারীতি মুরগি বলির পর টেনে নিল পাঁঠাটা।

কিন্তু ঠিক এমনই সময়ে ঘটে গেল একটা অঘটন। এমন একটা ঘটনার জন্যে কাপালিক তৈরি ছিল না। সে চেয়ে দেখতে পেল তার সামনে টর্চ হাতে দু'জন লোক। তার পেছনে আরও চারজন লোক। সামনে একটা কুকুর মাটি শুঁকতে শুঁকতে আসছে।

কাপালিক চমকে উঠল।

লোকগুলির দু'জনের হাতে পিস্তল—দু'জনের হাতে বন্দুক। তারা হল জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ, জয়ন্ত, সুন্দরবাবু, মানিক, থানার ও. সি. আর একজন কনস্টেবল।

বীরেন্দ্রনারায়ণ সবার পিছনে ছিল। তাই কাপালিক অন্ধকারে তাকে দেখতে পায়নি।

ও. সি. এগিয়ে গিয়ে বলল—মাথার উপরে হাত তোলো। নরবলি দিতে চেষ্টা করার অপরাধে তোমাকে অ্যারেস্ট করলাম।

কাপালিক হুংকার দিয়ে উঠল—শয়তানের দল, আমার পবিত্র সাধনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে এসেছিস?

বলে সে খাঁড়াটা হাতে তুলে নিল। নিয়েই হুংকার দিয়ে উঠল সে। এমন সময় জয়ন্ত এগিয়ে গেল। তার পিস্তলের একটা গুলি কাপালিকের পায়ে লাগতেই সে পড়ে গেল।

জয়ন্ত বললে—পুলিসের সঙ্গে লড়াই করতে যেও না—মারা পড়বে।

এময় সময় এগিয়ে এলেন বীরেনবাবু। ততক্ষণে ও. সি. গিয়ে নরেন্দ্রের হাতে পায়ের বাঁধন কেটে দিয়েছিল। বীরেন্দ্রবাবু ছেলেকে বুকে তুলে নিলেন। নরেন্দ্র কাঁদতে লাগল।

বীরেনবাবু বললেন কাপালিককে—ছি, ছি, তুমি কিনা আমার গুরুভাই হয়ে আমার ছেলেকে নরবলি দিতে গিয়েছিলে। আমাদের গুরুদেব এমন শিক্ষা কখনও দেননি। তিনি জপ, তপ, পূজার পথে যেতে বলেছেন। তুমি কি মনে কর খুব সহজেই সিদ্ধিলাভ করবে এই সব করে? তুমি নরাধম—পাষণ্ড।

কাপালিকের চোখ দুটো জ্বলছিল যেন। কিন্তু সে জানে যে সে নিরুপায়। এখন তার মুক্তি সম্ভব নয়। তাছাড়া সে হাতে নাতে ধরা পড়েছে। তার বিচার হবেই। আর বিচারে অন্তত সাত বছর ঘানি ঘুরাতে হবে।

ও. সি. জয়ন্তর দিকে চেয়ে বললে—আপনি এ কেসে হাত দিলেন বলেই এমন হাতে নাতে শয়তানকে ধরা সম্ভব হল। তা না হলে এই নিরীহ শিশুর যে কি দশা হত।

বীরেনবাবু বললেন—জয়ন্তবাবু, বলুন কি পুরস্কার আপনি চান? আমি যে কোনও পরিমাণ অর্থ—

জয়ন্ত হেসে বললে—অর্থ-টর্থ আমি চাইনে বীরেনবাবু। আমি যে আপনার ছেলেকে রক্ষা করতে পারলাম—তাই আমার আনন্দ।

কাপালিক বুঝল, জয়ন্তর জন্যেই ধরা পড়ে গেছে। সে তাই জ্বলন্ত দৃষ্টিতে জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে বললে—তোমার সর্বনাশ হবে।

জয়ন্ত তাচ্ছিল্যভাবে মৃদু হাসল—কোনও উত্তর দিলেন না।*

ছত্রপতির অ্যাডভেঞ্চার

এক

জেল-ভাঙার জের

ভারতের 'ছত্রপতি' বললেই বুঝায় মহারাষ্ট্রের মহাবীর শিবাজিকে। কিন্তু যখনকার কাহিনী বলছি, তখনও তিনি 'ছত্রপতি' উপাধি ধারণ করেননি।

বাদশাহ ঔরংজেবের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিলেন ছত্রপতি শিবাজি। শিবাজিকে বধ করতে পারলে দিল্লীশ্বর নিশ্চিন্ত ও নিষ্কণ্টক হতেন, কিন্তু তাঁর সব অপচেষ্টাই হয়েছিল নিষ্ফল শেষ পর্যন্ত। তার প্রধান কারণ শিবাজির বাহুবল নয়, বুদ্ধিবল।

ঔরংজেবের ফাঁদে পা দিয়ে শিবাজি তো বন্দী হলেন আগ্রা শহরে। তারপর তিনি কি অপূর্ব কৌশলে মারাত্মক ফাঁদ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসেন, সে গল্প সকলেই জানেন, কারণ অনেক লেখক অনেকবার তা বর্ণনা করেছেন। সত্য যে উপন্যাসের চেয়ে অদ্ভুত, ওই বিখ্যাত ঐতিহাসিক কাহিনীটি সেই কথাই প্রমাণিত করে। ছেলেবেলায় রুদ্ধশ্বাসে গল্পটি পাঠ করতুম।

তারপরেই পড়ে যেত ছেদ। জেল ভেঙে অনেক কয়েদিই তো পালায়, কিন্তু তাদের অধিকাংশই পরে নাগালের বাইরে যাবার আগেই ধরা পড়ে সুড়সুড় করে ফের জেলে ঢুকতে বাধ্য হয়, এই ব্যাপারটাই দেখা গেছে বারংবার।

দিল্লী থেকে মহারাষ্ট্র—বহুদূর। তার মধ্যে দিকে দিকে কড়া পাহারা দিচ্ছে হাজার হাজার সতর্ক প্রহরী। শিবাজি কেমন করে তাদের চোখে দিলেন ধুলো, ছেলেবেলায় তা জানবার জন্যে মনে জাগত ব্যাকুল প্রশ্ন। কিন্তু ইস্কুলের ইতিহাসে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেত না।

---

* এটি হেমেন্দ্রকুমার রায়ের একটি অপ্রকাশিত রচনা, তাঁর এক প্রকাশক বন্ধুর সহযোগিতায় পাওয়া গেছে। তাঁকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

দুই

দক্ষিণের যাত্রী উত্তরে

আগ্রা থেকে কয়েক মাইল দূরে এক বিজন অরণ্য।

সেইখানে বসল পলাতকদের পরামর্শসভা। অবশেষে স্থির হল পাছে ভারি দল দেখে লোকের সন্দেহ জাগে, তাই দলের অন্যান্য সকলে যাবেন একদিকে এবং শিবাজি তাঁর বালক-পুত্র শম্ভুজি ও তিনজন পদস্থ কর্মচারীকে নিয়ে যাত্রা করবেন অন্যদিকে।

শিবাজী ও তাঁর সঙ্গীরা সর্বাঙ্গে ছাই মেখে সাজলেন ভবঘুরে সন্ন্যাসী, তারপর অগ্রসর হলেন মথুরার পথে।

ওদিকে আগ্রায় বন্দীর ঘর শূন্য দেখে প্রহরীর সর্দার ফুলদা খাঁ হন্তদন্ত হয়ে সম্রাটের কাছে গিয়ে কুর্নিশ ঠুকে খবর দিলে—"জাঁহাপনা, শিবাজিরাজা যে নিজের ঘরেই আটক ছিলেন, এ আমরা বার বার উঁকি মেরে স্বচক্ষে দেখেছি। তারপর আচমকা আমাদের চোখের সামনেই তিনি মিলিয়ে গেলেন কোথায় কে জানে। তিনি পাখির মতো ফুড়ুক করে আকাশে উড়ে পালালেন, না মাটি ফুঁড়ে পাতালে ঢুকে গেলেন, না অন্য কোনরকমে ভানুমতীর খেল খেললেন, সে সব কিছুই বোঝা গেল না!

কিন্তু এ হেন গাঁজাখুরি গল্পে বিশ্বাস করবেন, ঔরংজেব মোটেই সে পাত্র ছিলেন না। হই হই রব উঠল তখনই! শিবাজির পলায়নবার্তা নিয়ে দলে দলে দূত ব্যস্তভাবে ছুটে গেল দিকে দিকে! দাক্ষিণাত্যে যাবার প্রত্যেক পথ আগলে সজাগ হয়ে রইল হাজার সেপাই-সান্ত্রী।

কিন্তু চাতুর্যে শিবাজিকে ঠকাবে কে? তিনি মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা, তাঁর গন্তব্যপথ ভারতের দক্ষিণদিকে বটে। তবে সেদিকের পথের উপরে থাকবে প্রহরীদের শ্যেনদৃষ্টি, সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না কিছুমাত্র।

অতএব তিনি মাথা খাটিয়ে ধরলেন উত্তর ভারতের পথ। আগ্রা ছেড়ে ঘণ্টা ছয় পরে পদব্রজে পৌঁছলেন মথুরায়, কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারলে না।

কিন্তু ছেলেমানুষ শম্ভুজি, মথুরা পর্যন্ত গিয়ে পথশ্রমে একবারে ভেঙে পড়ল।

এও এক গুরুতর সমস্যা। অক্ষম ছেলের মুখ চেয়ে সেখানে অপেক্ষা করলে বাদশাহের গোয়েন্দাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে এবং অক্ষম পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যাবারও উপায় নেই। এখন মুশকিল আসান হয় কেমন করে।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেখানে ছিল শিবাজির তিনজন জানিত লোক, তাঁদের হাতেই পুত্রকে সমর্পণ করে আবার তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

ইতিমধ্যেই শিবাজি গোঁপদাড়ি কামিয়ে ফেলেছিলেন। পথে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু তাও অতি গোপনে না নিয়ে গেলে চলবে না। অতএব তিনি হাতে নিলেন এমন এক মোটা লাঠি—ভিতরটা তার ফাঁপা। কিন্তু সেই গর্ভ-যষ্টির ভিতরটা পূর্ণ রইল বহু অমূল্য রত্ন ও স্বর্ণমুদ্রায়। আরও কিছু ঐশ্বর্য লুকিয়ে রাখা হল পাদুকার মধ্যে। হীরা-চুনির উপরে মোমের প্রলেপ মাখিয়ে শিবাজির ভৃত্যরাও মুখের ও পোশাকের ভিতরে লুকিয়ে রাখলে।

তারপর দিনের বেলায় বিশ্রাম ও রাত্রের অন্ধকারে পথ চলা। শিবাজির অনুচরেরা তিন দলে বিভক্ত হয়ে বৈরাগ্য, গোঁসাই ও উদাসী এই তিন শ্রেণীর সন্ন্যাসীর ভেক ধারণ করে পিছনে পিছনে চলল। সংখ্যায় ছিল তারা পঞ্চাশ-ষাটজন।

মাঝে মাঝে ছদ্মবেশ পরিবর্তনের প্রয়োজন হত। পলাতকরা কখনও সাজতেন ভিক্ষাজীবী সাধু, কখনও বা নিম্নশ্রেণীর সওদাগর। এক তীর্থক্ষেত্রে যারা তাঁদের দেখেছে, তারা অন্য তীর্থক্ষেত্রে তাঁদের চিনতে পারত না।

মথুরা ছেড়ে শিবাজি দেশমুখো হলেন না—চললেন পূর্বদিকে। একে একে গেলেন এলাহাবাদ, বেনারস ও গয়াধামে, তাঁকে সাধারণ তীর্থযাত্রী ছাড়া আর কিছু বলে ভ্রম করবার উপায় রইল না।

এ সব অঞ্চলে যথাসময়ে বাদশাহের ফরমান এসেছে বটে, কিন্তু মহারাষ্ট্রের যাত্রীর আসবার কথা নয় পূর্বভারতের দিকে, তাই দক্ষিণাপথের মতো এদিককার কর্তৃপক্ষ যে খুব বেশি হুঁশিয়ার ছিলেন না, সেটুকু সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। এবং শিবাজিও চেয়েছিলেন তাই!

তবু মাথার উপরে মাঝে মাঝে নেমে এসেছিল বিপদের ফাঁড়া। এইবারে সেই কাহিনীই বলব। সে সব যেন চমকদার ডিটেকটিভ উপন্যাসের ঘটনা।

তিন

লক্ষটাকার মহিমা

শহরের ফৌজদারের নাম আলি কুলি। সন্ন্যাসীর বেশে শিবাজি সদলবলে প্রবেশ করলেন সেই শহরে।

বাদশাহের ফরমান জাগ্রত করে তুলেছে ফৌজদারকে। শিবাজি ও তাঁর দলবলের হাবভাব সন্দেহজনক মনে হওয়াতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হল এবং বন্দীদের নিয়ে জোর জেরা চলতে লাগল।

বোধকরি বন্দীদের পক্ষে জেরার ফল হল না বিশেষ সন্তোষজনক। গতিক সুবিধা নয় বুঝে শিবাজি ফৌজদারের সঙ্গে গোপনে দেখা করলেন।

তখন দুপুর রাত। বন্দী বললেন, "আমি শিবাজি।"

সচকিত ফৌজদার বুঝলেন, তাঁর জালে পড়েছে সবচেয়ে সেরা ঘাগী মাছ। আশা করা যায় বন্দীর পরিচয় পেয়ে তাঁর বুক হয়ে উঠেছিল দশ হাত।

শিবাজি বললেন, "যদি আমাকে মুক্তি দেন, আমার কাছ থেকে আপনি লাখ টাকা দামের একখানা হীরা ও একখানা পদ্মরাগ মণি উপহার পাবেন।"

পরম লোভনীয় উৎকোচ—একেবারে কল্পনাতীত। বুদ্ধিমান ফৌজদার এমন দুর্লভ সুযোগ ত্যাগ করতে পারলেন না।

আলি কুলি কর্তব্য ভুললেন এবং শিবাজি সদলবলে নিরাপদে আবার পদচালনা করলেন নিজের গন্তব্যপথে।

চার

মুষ্টিগত সৌভাগ্য

এলাহাবাদ। গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম। স্মরণাতীত কাল থেকে তীর্থযাত্রীরা এখানে এসে অবগাহন-স্নান এবং শাস্ত্রকথিত অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠানের নিয়ম পালন করে থাকেন। শিবাজিও সেখানে স্নানাদি সেরে যাত্রা করলেন কাশীধামের দিকে।

পুণ্যতীর্থ বারাণসী—ভারতের বর্তমান নগরগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন। ইউরোপে যখন কেউ রোমের নামও শোনেনি, তখনও বারাণসীর খ্যাতি দিকে দিকে দেশ-বিদেশে বিস্তৃত।

চারিদিকে তরুণ ঊষার আলো-আঁধারির খেলা। নিষ্ঠাবান হিন্দুর মতো শিবাজিও তীর্থ-কৃত্য পালন করতে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময়ে সম্রাটের বার্তাবহ নগরে ঢুকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলে—রাজা শিবাজি পলাতক! অবিলম্বে তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে!

ঠিক তার একটু আগেই শিবাজি জনৈক পূজারীর হাতের মধ্যে কিছু ধনরত্ন গুঁজে দিয়ে বলেছেন—"এখন হাতের মুঠো খুলো না, শীঘ্র আগে আমাকে শাস্ত্রীয় বিধি পালন করাও!"

ইতিমধ্যে শিবাজি ক্ষৌরকার্য ও স্নান সেরে নিয়েছেন, কিন্তু তখনও তাঁর অন্যান্য কর্তব্য শেষ হয়নি। ঠিক সেই সময়ে রাজদূতের ঘোষণা তাঁর কর্ণগোচর হল...

পুরোহিত ফিরে দেখেন, তাঁর যজমান অদৃশ্য!

হাতের মুঠো খুলে তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন, নয়খানি রত্ন এবং কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা!

শিবাজির কাছ থেকে প্রাপ্ত এই দৌলতের প্রসাদে পুরোহিত পরে হয়েছিলেন প্রাসাদোপম ভবনের অধিকারী।

পাঁচ

বেশি দাম দেওয়ার বিপদ

পূর্বে—আরও পূর্বে—দক্ষিণের যাত্রী চলেছেন আরও পূর্বদিকে, ধূলি নিক্ষেপ করতে হবে বাদশাহের গুপ্তচরদের ক্ষুধিত চক্ষে!

কাশীধাম থেকে তাড়া খেয়ে শিবাজি ক্রোশের পর ক্রোশ পার হয়ে গেলেন দ্রুতপদে। অবশেষে গয়াধামে। সেখানে অর্ঘ্য নিবেদন করলেন বিষ্ণুর পাদপদ্মে।

তারপরেই আছে বঙ্গদেশ। কিন্তু বঙ্গদেশ তীর্থের জন্য ভারতবিখ্যাত নয়। এবং সম্রাটের গোয়েন্দারাও দক্ষিণাপথে মিথ্যা ছুটোছুটি করে শ্রান্ত হয়ে এতদিনে শিবাজির আশা নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করেছে! আলেয়ার পিছনে ছোটারও মানে হয়, কারণ তাকে দেখা যায়; কিন্তু যে থাকে একেবারে চোখের আড়ালে, তার পাত্তা পাওয়া যাবে কেমন করে।

অতএব এইবারে এসেছে স্বদেশ প্রত্যাগমনের প্রশস্ত সুযোগ।

শিবাজি এবারে অগ্রসর হলেন বিহার থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। সুদূর পথ—ভারতের প্রায় এক প্রত্যন্ত দেশ থেকে আর এক প্রান্তে। মাঝে পড়ে বিস্তর নদনদী, দুরন্ত প্রান্তর, দুশ্চর অরণ্য, দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত, বিপজ্জনক জনপদ। পায়ে হেঁটে ক্রোশের পর ক্রোশ পার হতে হতে

পা ওঠে টনটনিয়ে, গায়ে হয় ব্যথা! শিবাজি ছিলেন অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণে অভ্যস্ত, পদব্রজে পথ অতিক্রম করতে আর তাঁর ভাল লাগল না।

অতএব পথিমধ্যে এক জায়গায় দরদস্তুর করে তিনি একটি টাট্টু ঘোড়া কিনে ফেললেন।

সঙ্গে রৌপ্যমুদ্রার অভাব, তাই তিনি জেব থেকে থলি বার করে অশ্বব্যবসায়ীর হাতে সমর্পণ করলেন কয়েকটি মোহর।

অশ্বব্যবসায়ীর বিস্ময়ের সীমা রইল না। বলা বাহুল্য, তখন শিবাজির অদ্ভুত পলায়ন-বার্তা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতে। সে সচমকে বলে উঠল, "একটা ছোট টাট্টু ঘোড়ার জন্যে আপনি এত বেশি দাম দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই আপনি শিবাজিরাজা।"

ব্যবসায়ীর মুখ চটপট বন্ধ করবার জন্যে মোহর ভর্তি থলিটাই তার হাতে ফেলে দিয়ে শিবাজি তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে সেখান থেকে সরে পড়লেন।

ছয়

দস্যু শিবাজি ও কৃষাণ পরিবার

গোদাবরী নদীতীরের এক গ্রাম। ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর দল সেখানকার কোনও চাষীর বাড়িতে গিয়ে অতিথি হল।

চাষীর বুড়ি মা দুঃখ করে বললে, "কি বলব বাবা, সর্বস্ব গিয়েছে, আর কি আমাদের অতিথি সৎকার করবার সামর্থ আছে?"

কৌতূহলী শিবাজি শুধোলেন, "কেমন করে সর্বস্ব গেল মা?"

বুড়ি বললে, "শিবাজী-ডাকাতের চ্যালা-চামুণ্ডারা গোটা গাঁ লুঠ করে গেছে, আমাদেরও কিছু রেখে যায়নি।" তারপর সে লুঠেরাদের দলপতি শিবাজির উদ্দেশ্যে তারা চোখা চোখা বাক্যবাণ বর্ষণ করতে লাগল।

শিবাজি চেপে গেলেন তখনকার মতো। কিন্তু সেই কৃষাণ পরিবারের নাম ও ঠিকানা মনে রাখতে ভুললেন না।

পরে যথাসময়ে দেশে ফিরে তিনি সেই কৃষক সপরিবারকে নিজের কাছে তলব করে আনিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই তারা এসেছিল খুব ভয়ে ভয়ে, কিন্তু বাড়ি ফিরেছিল ভারি হাসিমুখে, শিবাজির মঙ্গল কামনা করতে করতে।

কেন, তাও আবার কি খুলে বলতে হবে?

সাত

জিজাবাইয়ের শিবা

উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম ঘুরে অবশেষে দক্ষিণে! রীতিমতো ভারত-পরিক্রমা! দিগ্বিজয়ী রূপে নয়, মহাবীর হয়েও ভাগ্যহত, শত্রুভীত অভাগাজনের মতো শিবাজি আজ বৃহৎ ভারতের যে অংশের মাটি মাড়িয়ে স্বদেশে ফিরে এলেন, অদূর ভবিষ্যতে তারই সৃষ্ট সৈন্যসামন্তগণ যে সেই

বিপুল ভূখণ্ডেরই দিকে দিকে গৈরিক পতাকা উড়িয়ে বিজয়-উৎসবে প্রমত্ত হয়ে উঠবে, এ কথা কেউ সেদিন কল্পনায়ও আনতে পারেনি। একান্ত পূর্ণগৌরবের মাঝখানে অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করবার আগেই মাত্র তেত্রিশ বৎসরের মধ্যেই নিজের হাতে তিনি এমন এক দুর্ধর্ষ জাতি তৈরি করে গিয়েছিলেন, যার কাছে সকল গর্ব হারিয়ে সকাতরে করুণা ভিক্ষা করতে হয়েছিল একদা অপরাজেয়, শক্তিগর্বিত মোগল রাজবংশকেও। 'স্বর্ণ ও রত্নখচিত ময়ূর সিংহাসনে' আসীন হয়ে সেদিন যে আলমগীর ঘৃণার্হ শিবাজি, মারাঠি ও সেই সঙ্গে সমগ্র হিন্দুজাতির উচ্ছেদসাধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে গিয়েছিলেন, পরে সেই আলমগীর নামেই পরিচিত দ্বিতীয় দিল্লীশ্বর মারাঠিদেরই আশ্রয় গ্রহণ করতে লজ্জিত হননি এবং তখন তাঁর মসনদ বলতে বোঝাত কাঠের তৈরি এক নকল ময়ূর সিংহাসন! আবার তারও বৎসর দুই পরে ওই মারাঠিরাই গায়ের জোরে দখল করেছিল রাজধানী দিল্লী পর্যন্ত!

কিন্তু সে সব হচ্ছে আরও কিছুকাল পরের কথা। আপাতত ঔরংজেবের লক্ষ্যচ্যুত শিবাজি কোনওক্রমে নিজের কোটে পদার্পণ করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। কালচক্র ঘুরে যাবে কোনদিকে তিনি বা ঔরংজেব কেউই তা এখনও পর্যন্ত জানতে পারেননি...

বীরধাত্রী, রত্নপ্রসবিত্রী, পুত্রগত-প্রাণা জিজাবাই! নিজের হাতে মানুষের মতো মানুষ করা ছেলে আজ হিন্দুবিদ্বেষী, কুটচক্রী, নৃশংস ঔরংজেবের খপ্পরে গিয়ে পড়েছে, তাই শিবাজির জননীর জীবন হয়ে উঠেছে দুঃসহ দুঃস্বপ্নের মতো। একাকিনী বসে বসে তিনি নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করছেন, এমন সময়ে দ্বারী এসে খবর দিলে একদল বৈরাগী তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। তিনি সম্মতি দিলেন।

সন্ন্যাসীরা সামনে এসে দাঁড়াল। একজন হাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ করলে। কিন্তু আর একজন এগিয়ে এসে লুটিয়ে পড়ল একেবারে তাঁর পায়ের তলায়!

জিজাবাই বিস্মিত ও তটস্থ! কোনও সন্ন্যাসী যে তাঁর পায়ে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করবে, এ যে স্বপ্নাতীত! এ যে অমঙ্গলকর!

তারপর সন্ন্যাসী মাথা রাখলে একেবারে তাঁর কোলের ভিতরে এবং একটানে খুলে ফেললে নিজের শিরস্ত্রাণ!

মাথার একটা পরিচিত চিহ্ন দেখেই জিজাবাইয়ের বুঝতে দেরি হল না যে, তাঁর কোলের ছেলেই আবার ফিরে এসেছে মায়ের কোলে! দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে তিনি আবেগকম্পিত কণ্ঠে ডাকলেন, "শিবা, শিবা, আমার শিবা!"

আদরে গলে শিবাজি সাড়া দিলেন, "মা গো, আমার মা!"

প্রতিশোধ

পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের চূড়াগুলি উর্ধ্বে নীলাকাশে মেঘলোক ছাড়িয়ে উঠে গেছে, তুষারে ঢাকা। দিনের বেলায় তুষারময় শিখরগুলি আলোয় ঝিকঝিক করে, রাতের অন্ধকারে স্বপ্নময় দেখায়।

পাহাড়ের মধ্যদেশ অরণ্যময়, নিম্নে গভীর খাদ যেমন অন্ধকারময় তেমনই ভয়ঙ্কর। পাহাড়তলির বনে বন্যজন্তুরা ঘুরে বেড়ায়। হিংস্র জন্তুর দল শিকারের সন্ধানে ফেরে।

শীতের আরম্ভ; গাছ থেকে সোনালি পাতা সব ঝরে পড়েছে, বন ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্ছে। গত রাত্রে বরফ পড়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। প্রখর সূর্যের আলোয় বরফ সব গলে যাচ্ছে। সুনির্মল দিন।

শীতকাল শুরু হতেই বন্যজন্তুরা পাহাড় ছেড়ে নিচে নেমে গেছে। আর কিছু দিন পরেই বনভূমি বরফে ছেয়ে যাবে। শুধু দু'চারটি পশু এখনও পাহাড়তলিতে আছে। তারা দিনের বেলায় আহারের সন্ধানে পাহাড়ের বনে ঘুরে বেড়ায়।

একটি খাড়া পাহাড়ের গা দিয়ে একটি ভল্লুক ও একটি ভল্লুকী ধীরে পাহাড়ের দিকে উঠছিল। কয়েকদিন হল তাদের আহার হয়নি। নিচের বনে তেমন ফল হয়নি এ বছর। খাদ্যের সন্ধানে তারা সেজন্য পাহাড়ের উপরে এসেছে। তারা দেখতে পেলে, পাহাড়ের মাথায় যেখানে সাদা বরফের রেখা শেষ হয়ে কালো পাথরগুলির মধ্যে সবুজ ঘাস দেখা যাচ্ছে, সেখানে কয়েকটি পার্বত্য মেষ চরে বেড়াচ্ছে। সেই মেষের দল লক্ষ্য করে ভল্লুক ও ভল্লুকী শালবনের অন্তরালে এক সরু পথ ধরে নিঃশব্দে উঠে যাচ্ছিল। সহসা তারা দেখল, একটি মেষ ভয়ে চিৎকার করে নিচে ছুটে আসছে। তাকে অনুসরণ করে অন্য মেষগুলিও প্রাণভয়ে ছুটছে। তারা কোনও পথ দিয়ে আসছে না। পাথরের পর পাথরের উপর লাফিয়ে পড়ছে। মেষগুলি কিন্তু তাদের দিকেই আসছে। ভল্লুক ও ভল্লুকী আনন্দে থমকে দাঁড়াল, আর কষ্ট করে পাহাড়ে উঠতে হবে না। তারা একটা বড় কালো পাথরের আড়ালে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মেষগুলির প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ভল্লুক দু'টি যখন মেষের দল লক্ষ্য করে পাহাড়ের ওপর উঠছিল সেই সময় একটি বন্যজন্তুর চোখ পড়েছিল মেষগুলির ওপর। সেটি এক চিতাবাঘ। সে যেমন হিংস্র তেমনই ভয়ংকর দেখতে। কয়েকদিন হতে সে অনাহারী রয়েছে। অসহ্য ক্ষুধার তাড়নায় সে পাহাড়ের ওপর উঠে গিয়েছিল। সেখান হতে সে ক্ষুধিত নয়নে চারিদিকে দেখতে লাগল। কিছুদূরে নিচে পাহাড়ের অপর দিকে কতকগুলি মেষ দেখতে পেয়ে চিতাবাঘটি ভাবলে শিকার ছাড়া উচিত নয়। কালো পাথর বেয়ে সে ধীরে ধীরে মেষদলের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। পাহাড়ের সেদিকটায় বন ছিল না। বাতাসে বাঘের গন্ধ ভেসে আসছিল। মেষদলের দলপতি চিতাবাঘটিকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে নিচে লাফিয়ে পড়ল। তার মেষের দল পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে পাহাড়তলির বনগহ্বরে আশ্রয় নেবার জন্য বিদ্যুৎবেগে ছুটল।

শিকার পালাচ্ছে দেখে ক্রোধে ক্ষুব্ধ হয়ে চিতাবাঘটি কিছুদূর ছুটে এল। তারপর থমকে দাঁড়াল। মেষগুলির মতো অত দ্রুতবেগে সে নামতে পারবে না। পাথর ভরা পাহাড়ের খাড়া পথ সংকটময়, পা একটু ফসকালে এক মাইল নিচে গভীর খাদে গিয়ে পড়তে হবে।

তারপর আর এক দৃশ্য দেখে চিতাবাঘটি ক্রোধে অধীর হয়ে দাঁতের সঙ্গে দাঁত ঘষে গর্জন করে উঠল, তার চোখ দু'টো আগুনের শিখার মতো কাঁপতে লাগল।

চিতাবাঘটি দেখলে, তার পুরাতন শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী বনের ভল্লুক দু'টি মেষগুলির নিচে নামবার পথে দাঁড়িয়ে আছে। এই ভল্লুক দম্পতিকে সে ভয় করে। তাদের বিরাট কালো দেহ

দেখলে সে আর অগ্রসর হতে পারে না। তাদের আক্রমণ করতে সাহস হয় না। কতবার সে এদের সামনে মুখের শিকার ছেড়ে পালিয়েছে। আজও এদের জয় হল। চিতাবাঘটি রাগে কাঁপতে লাগল। ভাবতে লাগল, একদিন সুবিধে পেলে প্রতিশোধ নেবে।

চিতাবাঘটি দেখতে লাগল, মেষের পাল লাফাতে লাফাতে নেমে ভল্লুকটির সামনে গিয়ে পড়েছে। সহসা সম্মুখে ভল্লুক দেখে মেষগুলি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেষ দলপতি ছিল প্রথমে। তার বাঁকা বৃহৎ শিং দুলিয়ে সে ভয়ে কাঁপছে, তার পালাবার পথ নেই। ভল্লুকটি এগিয়ে এসে বৃহৎ থাবার সজোর আঘাতে মেষ দলপতিকে শূন্যে ছুড়ে ফেলে দিলে। মেষটি প্রায় আধমাইল নিচে এক কালো পাথরে আছাড় খেয়ে পড়ল। অন্য মেষগুলি চক্ষের নিমেষে কোথায় লুকিয়ে গেল।

চিতাবাঘটি দেখতে লাগল, নিচের পাহাড়ের তলায় মৃত মেষটির স্থির দেহ কিন্তু সেখানে যাবার উপায় নেই। ভল্লুক ও ভল্লুকী ধীরে নামছে মেষটিকে আহার করবার জন্য। জ্বলন্ত চক্ষে চেয়ে রোষে গর্জন করে চিতাবাঘটি বনের অপর দিকে চলে গেল, নূতন শিকারের সন্ধানে।

শীতকাল শেষ হয় হয়, গাছে গাছে কচি সবুজ পাতা অঙ্কুরিত হয়েছে। পাহাড়তলিতে বরফ প্রায় সব গলে গেছে, ছোট রঙিন ফুলে পাহাড়ের প্রান্তর ভরে গেছে, শুধু মাঝে মাঝে কোথাও বরফ রয়েছে সমুদ্রের ফেনার মতো।

সেই চিতাবাঘটি পাহাড়ে ফিরে এসেছে। ক্ষুধিত হয়ে শিকারের সন্ধানে ঘুরছে। শীতকালটি তার বড়ই কষ্টে কেটেছে। অনাহারে সে রোগা হয়ে গেছে।

ক্ষুধিত হয়ে চিতাবাঘটি পাহাড়ের খাদে-গহ্বরে সব জায়গায় আহারের সন্ধানে ঘুরছিল। এক বড় গাছের নিচে সে এসে চমকে দাঁড়াল। গাছের তলায় এক গহ্বর। সে গহ্বরটির মুখের কাছে বরফ সব সরিয়ে ফেলল।

গহ্বরের মুখে প্রবেশ করে সে চমকে গেল। সেই কালো ভল্লুকী অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে আর তার পাশে তিনটি ভল্লুক-শিশু! সদ্যজাগ্রত শিশুগুলি খেলা করছে। নরম তুলতুলে মাংসের পিণ্ড! চিতাবাঘের চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল দীপ্ত অঙ্গারের মতো। সে জানে ভল্লুকী এখন জাগবে না। অসহায় শিশুগুলিকে বধ করে খাবার এমন সুযোগ আর হবে না। ক্ষিপ্তের মতো সে গুহার মুখের পাথরগুলি থাবার আঘাতে সরিয়ে ফেলে।

চিতাবাঘটির পিঠ খাড়া শক্ত হয়ে উঠল। থাবার সুতীক্ষ্ণ নখগুলি বার করে সে গুহার মধ্যে প্রবেশ করল। বহুদিন পরে এমন সুস্বাদু আহার জুটল। তার চিরশত্রুর ওপর এমন প্রতিশোধ নেবার সুযোগ হবে, সে কখনও ভাবতে পারেনি। নিমেষের মধ্যে সে ভল্লুক-শিশুদের মেরে ফেললে। এত দ্রুত নখ চালিয়ে সে মেরে ফেললে যে শিশুগুলি একটু চেঁচাবারও সময় পেল না। তার আহারের পক্ষে একটি শিশুই যথেষ্ট, কিন্তু প্রতিশোধের আনন্দে সে তিনটি শিশুকেই মেরে ফেলে।

ভল্লুকী যেন দুঃস্বপ্নে একবার নড়ে উঠল, তার লম্বা কালো হাতটা বাড়িয়ে দিল। ভল্লুকীকে নড়তে দেখে চিতাবাঘের ভয় হল! ইচ্ছা করলে সে এই নিদ্রিতা ভল্লুকীকে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু তার সাহস হল না। ভল্লুকীর হাত নড়ছে দেখে সে কেমন আতঙ্কে শিউরে উঠল। একটি ভল্লুকশিশু থাবায় ধরে তাড়াতাড়ি সে গুহা হতে পলায়ন করলে।

কয়েক ঘণ্টা পরে। গুহার ভেতর কনকনে বাতাস আসতে ভল্লুকীর ঘুম ভেঙে গেল। একটু কেঁপে উঠে চেয়ে দেখল, তার বুকের কাছে তার সন্তানগুলি নেই। সে আর্তনাদ করে উঠল। গুহা হতে সে পাগলের মতো বার হয়ে এল। গুহার মুখে দু'টি রক্তমাখা ভল্লুকশিশুর মৃতদেহ। ক্রোধে বেদনায় ভল্লুকী দীর্ঘ করুণ সুরে চেঁচালে। তার ক্রন্দনধ্বনি বনভূমিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

ভল্লুকী বুঝল কোনও বন্য হিংস্র জন্তু তার সন্তানদের বধ করেছে। কে সে? মাটিতে নাক গুঁজে সে শুঁকতে লাগল। বাঘের গায়ের গন্ধ। নিশ্চয়ই সেই চিতাবাঘটা।

চিতাবাঘটি এক পাথরের ওপর বসে বিশ্রাম করছিল। ভল্লুকীর গর্জন শুনে সে ভয়ে কেঁপে উঠল। পাহাড়ের নিচে যাবার উপায় নেই, কারণ সেই পথ দিয়েই ভল্লুকী আসছে দ্রুতগতিতে। সে পাহাড়ের মাথার দিকে উঠতে লাগল। ভল্লুকীও উপরে উঠতে লাগল।

সরকারি বন বিভাগের কর্মচারী হীরা সিংহ খুব ভাল শিকারি। শীতকালে শিকারের তেমন সুবিধে হয়নি। শীতের শেষে সুন্দর দিন দেখে সে বার হয়েছিল শিকারের সন্ধানে। কাঁধে লম্বা বন্দুক, সঙ্গে দুই শিকারি কুকুর; তাদের শিকলি দু'টো হাতে টানতে টানতে চলেছিল। হীরা সিং দেখলে, বনের এক জায়গায় কতকগুলি পাখি আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ নীল আকাশ হতে একটি ঈগল পাখি তীরের মতো নেমে এল। হীরা সিং বুঝলে ওখানে নিশ্চয় কোনও জন্তু মরেছে, তার মৃতদেহ নিয়ে পাখিদের মধ্যে ঝগড়া লেগেছে। ব্যাপারটা কি জানবার জন্য সে পাহাড়ে উঠতে লাগল।

হীরা সিং দেখলে ছোট গুহার সম্মুখে বড় গাছের নিচে ভল্লুক শাবকের রক্তাক্ত দেহ। চারদিকে বড় পায়ের চিহ্ন মাটির ওপর। এসব পায়ের চিহ্ন তার পরিচিত। মাটিতে জন্তুদের পায়ের দাগ দেখে সে বুঝতে পারে কোন জন্তু সেখান দিয়ে চলে গেছে। চিতাবাঘের থাবার দাগ আর ভল্লুকের পায়ের ছাপ। ব্যাপারটা কি সে বুঝতে পারল। বন্যজন্তুদের কাহিনী তার সব জানা। সন্তানহন্তা চিতাবাঘকে বধ করবার জন্য ভল্লুক বার হয়েছে। হীরা সিং বুঝতে পারল পাহাড়ের মাথার দিকেই জন্তু দু'টি গেছে। শিকারি কুকুরদের শিকল টানতে টানতে বন্দুকটা চেপে ধরে সে পর্বত শিখরের দিকে চলল।

পর্বতটির শিখরদেশ অতি ছুঁচলো, সেখানে কোনও গাছপালা নেই, কোনও আশ্রয়ভূমি নেই, ওঠা অসম্ভব। সম্মুখদিকে পর্বতটি ঢালু হয়ে নেমে বনভূমিময় উপত্যকার সঙ্গে মিশে গেছে; উপত্যকা হতে পাহাড়ের মাথার দিকে উঠবার ডানদিকে ও বামদিকে দু'টি মাত্র সরু পথ। পর্বতের পেছনটা একেবারে খাড়া নেমে গেছে গভীর খাদে, সেদিকটায় শুধু কালো গ্রানাইট পাথর, গাছ নেই, একটু তৃণও নেই, সেদিক দিয়ে কোনও বন্যজন্তুরও ওঠা অসম্ভব।

বনভূমি হতে ডানদিকে সরু পথ দিয়ে ভল্লুকী উঠেছিল চিতাবাঘের সন্ধানে। শিকারী হীরা সিং বামদিকের পথ দিয়ে উঠতে লাগল। দুটো পথ পর্বত শিখরের কাছাকাছি গিয়ে মিশেছে।

প্রাণভয়ে চিতাবাঘটি পর্বত শিখরের কাছাকাছি উঠে এসে হাঁপাতে লাগল, এবার কোন পথ দিয়ে ভল্লুকীকে এড়িয়ে পালানো যায়, দেখতে হবে। পিছন দিক দিয়ে নামা অসম্ভব, গড়াতে গড়াতে এক মাইল নিচে গভীর খাদে গিয়ে পড়তে হবে। বামদিকে পথ রয়েছে, সেই দিক দিয়েই নামতে হবে।

কিন্তু সে পথ ধরে একটু নেমেই চিতাবাঘটি থমকে দাঁড়াল। তার চোখ জ্বলতে লাগল। পিঠ তার শক্ত হয়ে উঠল। শিকারি কুকুরের ভয়ঙ্কর ডাক। সে দেখতে পেলে, মূর্তিমান যমদূতের মতো দুটি কালো কুকুর লাফাতে লাফাতে উঠে আসছে আর তাদের পেছনে একটি মানুষ বন্দুক হাতে করে।

চিতাবাঘটি আর বামদিকের পথ দিয়ে নামল না, সে উঠে এসে পর্বতের শিখরভূমিতে আশ্রয় নিল। কিন্তু এখানে আশ্রয় কোথায়? ডানদিক দিয়ে ভল্লুকী নিঃশব্দে উঠছে, আর বামদিক দিয়ে কুকুর ও বন্দুক। তার পালাবার পথ নেই। থাবা দিয়ে কালো পাথর চেপে ধরে সে শব্দ করতে লাগল। তার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল।

ভল্লুকী এগিয়ে উঠে আসছে। শালবন পেরিয়ে সে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। কালো পাথরের ওপর চিতাবাঘের চঞ্চল দেহ তার চোখে পড়ল। সে তীব্র গর্জন করে উঠল।

নিচে কুকুর দুটিও চেঁচাচ্ছে, ছটফট করছে। হীরা সিং কিন্তু তাদের শিকল প্রাণপণ জোরে টেনে ধরে আছে, বন্দুক ছোড়বার কোনও চেষ্টা করছে না। ও চিতাবাঘ ভল্লুকীর বধ্য।

প্রাণভয়ে চিতাবাঘটি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে লম্বা লাফ দিয়ে ছুঁচলো পর্বতশিখরে উঠতে চেষ্টা করলে। তীক্ষ্ণ তরবারির মতো শাণিত পাথরে তার পা কেটে গেল, পা ফস্কে সে গড়িয়ে পড়ল ভল্লুকীর সামনে।

থাবার পর থাবার আঘাত। ভল্লুকীর দেহে যেন মত্তহস্তীর বল। কয়েকবার সজোরে আঘাত করে চিতাবাঘের মৃতপ্রায় দেহটা ধরে ভল্লুকী ছুড়ে ফেলে দিল পর্বতের পিছনে। গ্রানাইট পাথরের গা দিয়ে গড়াতে গড়াতে চিতাবাঘের মৃতদেহ এক মাইল নিচে গভীর খাদে গিয়ে পড়ল।

কুকুরগুলি শান্ত স্তব্ধ। হীরা সিং কুকুরগুলিকে টানতে টানতে নিচে নেমে গেল। আজ আর তার বন্দুক ছোড়া হল না বলে সে দুঃখিত নয়, হিংস্র পশু জগতেও একটা বিচার আছে জেনে সে আনন্দিত।

মধুরেণ সমাপয়েৎ

হঠাৎ কলকাতার রাত্রি হয়ে উঠল বিভীষিকা।

ব্ল্যাক আউটের অন্ধকার যে ভয়াবহ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ কেবল ভয়াবহ নয়, মারাত্মক!

তৃতীয় শ্রেণীর মাসিক পত্রিকায় পদ্য প্রেরণ করা যাঁদের একমাত্র পেশা, তাঁরা যখন কলকাতার আকাশে অর্ধচন্দ্র দেখে শিবনেত্র হয়ে কবিত্বের স্বপ্নচয়নের চেষ্টা করছিলেন, তখন শূন্যে হল জাপানি উড্ডীয়মান নৌকার উদয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী উপহার লাভ করবে কতিপয় মুখর বোমা। একদিন নয়, পর পর তিন দিন।

নবাব মীরকাশিমের যুগে বাংলা দেখেছিল শেষ যুদ্ধ। তারপর থেকে কিছু কম দুই শতাব্দী ধরে বাঙালির সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে কেবল পুঁথিপত্র বা সংবাদপত্রের ভিতর

দিয়ে। চায়ের সঙ্গে যুদ্ধের তর্ক যেমন মুখরোচক, তেমনই নিরাপদ। অনভ্যাসের ফলে বাঙালিরা ভুলে গিয়েছিল, একদা তারাও আবার যুদ্ধে মরতে পারে।

কলকাতার উপরে শেষ অগ্নিবৃষ্টি করেছিল নবাব সিরাজদ্দৌলার সেকেলে কামান। তারপর সেদিন আচম্বিতে যখন আকাশচারী খ্যাঁদা জাপানিরা কলকাতার বুকে আবার নতুন অগ্নিবাদল সৃষ্টি করে গেল এবং কয়েকজন বাংলার মানুষ যখন বিনা নোটিসে হাজির হল গিয়ে পরলোকে, তখন সারা কলকাতা হয়ে গেল ভীত, চকিত, হতভম্ব। ভাবলে, এ আবার কী রকম যুদ্ধ বাবা! আগেকার লড়ায়ে লোক মরত রণক্ষেত্রে গিয়ে। কিন্তু এ যুদ্ধে শয়নগৃহে ঢুকে স্ত্রীর আঁচল ধরে শয্যায় শুয়েও দস্তুরমতো খাবি খেতে হয়! এমন যুদ্ধের কথা তো রামায়ণ-মহাভারতেও লেখে না!

তা লেখে না। সুতরাং সুখশয্যায় নিরাপদ নয় এবং বাইরের রাস্তা নাকি ততোধিক বিপজ্জনক। যুদ্ধ এসেছে কলকাতার মাথার উপরে। অনভ্যস্ত বাঙালির পিলে গিয়েছে চমকে। শহরবাসীরা ব্ল্যাক আউটকে তুচ্ছ করে রাতে পথে পথে করত বায়ুসেবন। কিন্তু তিনদিন জাপানি বোমার চমকদার ধমক খেয়ে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই রাজপথকে করল প্রায় বয়কট।

গ্যাসপোস্টের আলোগুলো জ্বলে না 'জ্বলছি' বলে মিথ্যা ভান করে। দোকানদাররা তাড়াতাড়ি ঝাঁপ তুলে দিয়ে সরে পড়ে। থিয়েটার, সিনেমা ও হোটেল বা রেস্তোরাঁরও সামনে নিবিড় অন্ধকার যেন দানা পাকিয়ে থাকে। বাদুড় ও প্যাঁচারা কলকাতার উপর দিয়ে ওড়বার সময় মনে করে, এমন খাসা শহর দুনিয়ায় আর কোথাও নেই। এবং গুণ্ডা, চোর ও পকেটমারের দল মনেপ্রাণে জাপানের খ্যাঁদা নাকগুলোর মঙ্গলকামনা করে বেরিয়ে পড়ে পথে-বিপথে।

এমনই সময়ে—অর্থাৎ জাপানিরা শেষ যে রাতে কলকাতায় বোমা ছুড়ে গেল ঠিক তার পরদিনই, তিন বন্ধু—অটল, পটল ও নকুল হঠাৎ এক বিচিত্র ঘটনার আবর্তে গিয়ে পড়তে বাধ্য হল। অতঃপর সেই ইতিহাসই বলব।

আহিরিটোলা অঞ্চল। ঘুটঘুটে কালো রাত—জুতোর কালির চেয়ে কালো। চারিদিক সার্কুলার রোডের গোরস্থানের মতো নিস্তব্ধ। শহরের সমস্ত লোক যেন মরে গিয়েছে। কিংবা এ যেন কোনও পরিত্যক্ত ও অভিশপ্ত নগরের মৃত পথ। গত রাত্রে ঠিক এই অঞ্চলেই একটি বোমা পথের উপরে এসে পড়ে পক্ক দাড়িম্বের মতো বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তাই এদিককার গৃহস্থদের কেউ আর দরজার বাইরে পা বাড়াতে রাজি নয়। পাড়ার বার-ফটকা ডানপিটে ছেলেরাও বাইরের নাম মুখে আনছে না আজ।

কিন্তু এমন রাতেও পরস্পরের গলা ধরাধরি করে, তিনজোড়া জুতোর শব্দে রাজপথকে চমকিত করে এগিয়ে আসছে অটল, পটল ও নকুল—জনৈক রসিক যাদের নাম দিয়েছে 'গৌড়বাংলায় থ্রি মাস্কেটিয়ার্স।' ব্যাপার কী? তাদের কি প্রাণের ভয় নেই?

না।

আজকাল আহারের নিমন্ত্রণ পেলে শেয়ালের মতো কাপুরুষও হয়ে ওঠে সিংহের মতো সাহসী।

বাজার যা আক্রা! আগেকার সস্তার দিনে বাড়িতে দুইশত লোককে খেতে ডাকলে অন্তত শতকরা পঁচিশ জনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করত না। কিন্তু এখন? দুইশত জনকে আহ্বান করলে সাড়া দেয় চারশ জন! মাছ-মাংস, তরি-তরিকারি, দুধ-ঘি-তেল সমস্তই অগ্নিমূল্য! যাদের আয় মাসিক একশ টাকার মধ্যে (এবং এই শ্রেণীর লোকই বাংলা দেশে বেশি), তারা তো মাছ-মাংস, লুচি বা সন্দেশ-রসগোল্লা প্রভৃতির স্বাদ ভুলেই যেতে বসেছে। এমন অবস্থায় বিনামূল্যে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সদ্ব্যবহার করবার নিমন্ত্রণ পেলে সে সুযোগ ত্যাগ করে না কোনও নির্বোধই।

আহিরিটোলা অঞ্চলের কোনও উদার বন্ধু পোলাও কালিয়া কোপ্তা কাবাব ও ফাউলকারি প্রভৃতি খাওয়াবার লোভ দেখিয়েছিলেন। সে লোভ ত্যাগ করা অসম্ভব। তাই উদরের সম্মান রক্ষার জন্যে প্রাণ হাতে করে বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল আজ অটল, পটল আর নকুল।

অবশ্য কেউ যেন না মনে ভাবেন যে, আমরা অটল-পটল-নকুলকে উদর-পিশাচ বলে অভিহিত করতে চাইছি। মোটেই নয় মশাই, মোটেই নয়।

বন্ধুবর কেবল ভুঁড়ি-ভরা ভুরিভোজনেরই লোভ দেখাননি, সেইসঙ্গে এ লোভও দেখিয়েছিলেন, তাঁর বাড়িতে আজ রীতিমতো জলসার আয়োজন। আসর অলঙ্কৃত করবেন দুম-তা-নানানা খাঁ, সা-রে-গা-মা সাহেব ও গিটকিরি মিঞা প্রমুখ গাইয়েরা এবং ধেড়ে-কেটে-তাক সিং ও দি-রি-দা-রা-দা-রা আলি প্রমুখ বাজিয়েরা। যাকে বলে আকর্ষণের উপরে আকর্ষণ—নৈবেদ্যের উপরে চূড়া-সন্দেশ।

আমাদের অটল-পটল-নকুল সঙ্গীতকলার একান্ত ভক্ত। তুচ্ছ দু'চারটে বোমার ভয়ে এমন বিমল আনন্দকে ত্যাগ করবার ছেলে তারা নয়।

অটল বললে, 'দুম-তা-নানানা খাঁ যখন তান ধরে তাল ঠোকেন, তখন পেশাদার পালোয়ানরা পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে যায়! এমন গাইয়ে আর হবে না।'

পটল সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে, 'আমরা পালোয়ান নই। তাকে সহ্য করতে পারব তো?'

নকুল বললে, 'দি-রি-দা-রা-দা-রা আলি যখন প্রিং প্রিং করে সেতার বাজান তখন সন্দেহ হয়, ঠিক যেন তিনি পট পট করে রাগ-রাগিণীর পাকা চুল উৎপাটন করেছেন।'

পটল অভিভূত হয়ে বললে, 'এর উপরে আর কথা চলে না।'

অতএব তিন বন্ধু যথাসময়ে হাজির হল যথাস্থানে। গানের আসর ভাঙল রাত বারটায়। আহারের আসর দেড়টায়। তারা পথে যখন বেরুল, ঘড়িতে বাজল রাত দু'টো।

হক গে অন্ধকার—তৃপ্ত উদর, চিত্তে আনন্দ। নকুল খানিক আগে শোনা একটি গান গাইতে গাইতে পথ চলছিল—

'কানহা রে মেরে নাহি রে চুন্‌হারিয়া।'

হঠাৎ টর্চের একটা তীব্র আলোকরেখা তাদের তিনজনেরই মুখের উপর দিয়ে খেলে গেল এবং তার পরেই জাগল ফিরিঙ্গি কণ্ঠের একটা ক্রুদ্ধ গর্জন!

সর্বাগ্রে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারলে নকুল। সে ভীতস্বরে বললে, 'মার দৌড়!'

তিন ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তিন তীরের মতো তিন মূর্তি ছুটে চলল একদিকে।

সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল এক সার্জেন্ট এবং এক পাহারাওয়ালা। সার্জেন্ট চিৎকার করলে, 'পাকড়ো, পাকড়ো!' (আসামী ভাগতা হ্যায়!)

পাহারাওয়ালা ছুটল। সার্জেন্টও।

ব্যাপারটা এই। দিন দশেক আগেকার কথা। কলকাতার রাস্তার এক দেওয়ালের গায়ে লেখা আছে—Commit no nuisance.

অটল বেকায়দায় পড়ে বাধ্য হয়ে সেই নিষেধ বাক্য মানতে পারেনি। ঠিক সময়েই সার্জেন্টের আবির্ভাব। সে তাকে থানায় নিয়ে যেতে উদ্যত হয়। অটল বাধা দেয়, কারণ থানায় যাওয়া তার পক্ষে ছিল আপত্তিকর। সার্জেন্ট তাকে একটা ঘুষি মারে। অটল মারে তাকে দু'টো ঘুষি। এবং পটল ও নকুলও সার্জেন্টের উপর চালায় আরও গোটাকয়েক ঘুষি। সার্জেন্ট পপাতধরণীতলে। তিন বন্ধুর অন্তর্ধান!

সার্জেন্ট এর মধ্যেই তাদের মুখ ভুলতে পারেনি। মণিহারা ফণীর মতো তার দুই চক্ষু ছিল সতর্ক। এমনই বোমা-ভয়-ভরা আঁধার রাতেও কার গান গাইবার শখ হয়েছে, কৌতূহলী হয়ে তাই দেখবার জন্যে সে হাতের টর্চ ব্যবহার করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত তিন মূর্তিকে পুনরাবিষ্কার করে ফেলেছে।

হিংস্র জন্তুর চেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে যম। এবং যমের চেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে বাংলা দেশের পুলিস। এই হচ্ছে তিন বন্ধুর মতো।

অতএব পুলিসের কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে যাবার জন্য তিন বন্ধু কিছুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি করল না।

নকুল জানে, প্রথম জীবনে স্পোর্টসের দৌড় প্রতিযোগিতায় বরাবরই সে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সুতরাং একটা গরুখোর সার্জেন্ট ও একটা ছাতুখোর পাহারাওয়ালা যে দৌড়ে তাকে হারাতে পারবে না এ বিষয়ে সে ছিল নিশ্চিত।

পটল সম্বন্ধেও সে হতাশ নয়। কারণ হচ্ছে সে বাঁখারির মতো রোগা লিকলিকে। তাই তার নাম হয়েছে মানুষ-হাড়গিলে।

ভয় তার কেবল অটলকে নিয়ে। অটলকে তারা ডাকত নরহস্তী বলে এবং ওজনে সে দুই মণ সাড়ে আটত্রিশ সের। একবার তেতলার সিঁড়ি ভাঙলেই সে হুস হুস করে হাঁপ ছাড়ত পাঁচ মিনিট ধরে এবং আধ মাইল রাস্তা হাঁটতে হবে শুনলেই ট্যাক্সি ডাকতে বলত।

কিন্তু নকুলের দুশ্চিন্তা অমূলক। ভয় পেলে মহা মোটা হিপোপটেমাসও তার ক্ষুদে ক্ষুদে পা চালিয়ে দৌড়ে যে কোনও মানুষকে হারিয়ে দিতে পারে। এবং ভয় পেয়ে পালাবার দরকার হলে যে কোনও গুরুভার বাঙালিরও দেহ হয়ে যায় যে তুলোর মতন হালকা আজ তার একটা চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেল!

ছুটতে ছুটতে নকুল বললে, 'অটল পিছিয়ে পড়লে বাঁচবে না!'

ছুটতে ছুটতে পটল বললে, 'অটল, তোমাকে নিয়েই ভাবনা!'

অটল কিছু বললে না, কিন্তু এক দৌড়ে বন্দুকের বুলেটের মতো বেগে পটল ও নকুলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল!

পটল ও নকুল এখন পুলিসের কথা ভুলে প্রাণপণে অটলের নাগাল ধরবার চেষ্টা করতে লাগল—কিন্তু অসম্ভব, সে মাটি কাঁপিয়ে ধেয়ে চলেছে যেন ঝোড়ো হাতির মতো! পটল ও নকুল চমৎকৃত!

অটল ছুটছে, ছুটছে, ছুটছে। সে খালি ছুটছে না, নিজের দৃষ্টিকেও করে তুলেছে বিড়ালের মতো অন্ধকারভেদী! নইলে এই ব্ল্যাক আউটের রাতে কলকাতার শতবাধাময় পথে দৌড় প্রতিযোগিতায় সফল মনোরথ হবার সম্ভাবনা অল্প। পিছনে ধাবমান পুলিসের দ্রুত পদশব্দ শুনতে শুনতে তারা ঢুকে পড়ল একটা গলির ভিতরে—প্রথমে অটল, তারপর নকুল, তারপর পটল।

ছুটতে ছুটতে অটল দেখলে, একেবারে ঠিক তার সামনেই পথ জুড়ে শুয়ে আছে একটা বিরাট সাদা ষাঁড়ের দীর্ঘ ছায়া। তখন তাকে আর পাশ কাটাবার সময় নেই, অতএব অটল বিনা দ্বিধায় অমন বিপুল বপু নিয়েও একটা চমৎকার লং-জাম্প মেরে ষাঁড়টাকে পার হয়ে গেল অনায়াসে। তারপর লাফালে নকুল। তারপর পটল।

সচমকে ঘুম ভেঙে গেল ষাঁড়ের। বিপুল বিস্ময়ে মুখ তুলে সে দেখলে, তার দেহ ও মাথার উপর দিয়ে তিড়িং তিড়িং করে লাফ মেরে চলে গেল তিন তিনটে মূর্তি! এমন কাণ্ড সে আর কখনও দেখেনি।

নিজের ষণ্ডবুদ্ধিতে ব্যাপারটা সে তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছে, এমন সময় তার সুদীর্ঘ কর্ণে প্রবেশ করল আবার কাদের নতুন পায়ের শব্দ! সে আন্দাজ করলে, এ দুরাত্মারাও হয়তো তার পবিত্র দেহের উপর দিয়ে লম্ফত্যাগ করবে। সে এমন অন্যায় আবদারকে আর প্রশ্রয় দিতে রাজি নয়। ঘৃণ্য ও তুচ্ছ মনুষ্যজাতীয় জীববৃন্দকে হার্ডল রেসে সাহায্য করবার জন্যে সে ষণ্ডজীবন ধারণ করেনি। অতএব ভীষণ এক গর্জন করে ধড়মড়িয়ে দণ্ডায়মান হল ষণ্ডপ্রবর। এবং পরমুহূর্তেই ফিরে, শিংওয়ালা মাথা নেড়ে, পতাকার মতো লাঙ্গুল ঊর্ধ্বে তুলে নূতন পদশব্দের উদ্দেশ্যে হল সতেজে ও সবেগে ধাবমান। মুখে তার ঘন ঘন ঘাঁৎ ঘাঁৎ হুঙ্কার।

সেই ভীষণ মূর্তি দেখেই পাহারাওয়ালা ও ফিরিঙ্গিপুঙ্গবের চক্ষুস্থির! তারাও ফিরে অদৃশ্য হতে দেরি করলে না।

·

পিছনের পাপ যে বিদায় হয়েছে, তিন বন্ধু তখনও তা টের পায়নি। তারা তখনও ছুটছে উল্কাবেগে।

হঠাৎ সামনে জাগল প্রায় ছয়-সাত হাত উঁচু প্রাচীর। কিন্তু কি ছার সেই বাধা, পুলিসকে ফাঁকি দেবার জন্যে তারা চীনের প্রাচীরও পার হতে প্রস্তুত।

অটল আজ যেন ইচ্ছে করলে পাখির মতো শূন্যে উড়তে পারে। লাফ মেরে সে উঠল প্রাচীরের টঙে এবং আর এক লাফে অদৃশ্য হল প্রাচীরের ওপারে। তারপর একে একে পটল ও নকুল করলে তার অনুসরণ।

সেই বোমা-ভীত, অস্বাভাবিক স্তব্ধ রাতে যখন একটা সূচ পড়লেও দূর থেকে শোনা যায়, তখন নকুল ও পটল—বিশেষ করে অটলের মতো সুবৃহৎ দেহের ধুপ ধুপ ধুপ করে লম্ফত্যাগের শব্দ অন্য লোকের শ্রুতিগোচর হবে, তাতে আর সন্দেহ কী?

প্রাচীরের উপর থেকে তিন বন্ধু লাফ মেরে অবতীর্ণ হল একটা অজানা বাড়ির অন্ধকার ছাদের উপরে।

তারা কিঞ্চিৎ হাঁপ ছাড়বার চেষ্টা করছে, হঠাৎ বিকটস্বরে চিৎকার হল—'চোর, চোর, ডাকাত!' সঙ্গে সঙ্গে বহু কণ্ঠের গোলমাল ও ছুটোছুটির শব্দ। সর্বনাশ, এ যে তপ্ত কড়া থেকে জ্বলন্ত উনুনে!

তিন বন্ধু আঁতকে আবার উঠল, আবার ছুটল। সামনেই একটা দরজা। ঠেলা মারতেই খুলে গেল। তারা একটা ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

ওরে বাপ রে বাপ! সেখানে আবার একটি মাত্র মেয়ে-গলার ঘর ফাটানো কী বিকট চিৎকার!

—'খুন করলে, খুন করলে—ডাকাতে খুন করলে গো!'

অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, শোনা যায় কেবল চিৎকারের পর চিৎকার।

তিন বন্ধু সিকি সেকেণ্ড থমকে দাঁড়াবারও অবসর পেলে না। টাল খেতে খেতে আবার ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল...

ওদিকে চারিদিক থেকে ছুটে এল বাড়ির পুরুষরা—চাকর-বাকর, দারোয়ান। তাড়াতাড়িতে হাতের কাছে যে যা পেয়েছে সংগ্রহ করে এনেছে—বঁটি, কাটারি, লাঠি।

বাড়ির কর্তা হন্তদন্তর মতন ঘটনাস্থলে এসে বললেন, 'কই রে প্রমদা, কোথায় ডাকাত?'

একটি আধাবয়সী মেয়ে ঘরের কোণ ছেড়ে এগিয়ে এসে বললে, 'ওই যে দাদা, ওই যে আবার বেরিয়ে গেল গো।'

'ক'জন?'

'এক কাঁড়ি লোক গো, এক কাঁড়ি লোক! কী সব রাক্ষুসে চেহারা, ইয়া গালপাট্টা, ইয়া গোঁফ, আর রঙ যেন কালি মাখানো হাঁড়ি!'

একটি যুবক বিরক্ত স্বরে বললে, 'কী যে বল, পিসিমা, তোমার কথার কোনও মানে হয় না!'

প্রমদা কপালে দুই চোখ তুলে বললে, 'ছেলের কথা শোনো একবার! দেখলুম এক কাঁড়ি আস্ত ডাকাত—তবু বলে, মানে হয় না!'

যুবক বললে, 'সত্যি কথাই বলেছি পিসিমা! এই ঘুটঘুট করছে অন্ধকার, এর মধ্যেই তুমি দেখতে পেলে ডাকাতদের গায়ের রঙ কালো হাঁড়ির মতো, আর তাদের মুখে ইয়া গোঁফ আর ইয়া গালপাট্টা।'

প্রমদা বললে, 'নিমে, তুই তো সেদিনকার ছেলে, তুই কি জানবি বল? আগুনের আঁচ কি চোখে দেখে বুঝতে হয়, গায়ে লাগলেই টের পাওয়া যায় যে! ডাকাতদের চেহারা অন্ধকারেও আন্দাজ করা যায় রে, অন্ধকারেও আন্দাজ করা যায়।'

কর্তা অধীরস্বরে বললেন, 'চুলোয় যাক যত বাজে কথা। বলি ডাকাতগুলো গেল কোন দিকে?'

প্রমদা বললে, 'ওই দিকে দাদা, ওই দিকে!'

কিন্তু সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনওদিকেই ডাকাতদের আর পাত্তা পাওয়া গেল না।

কর্তা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'যাক গে, আপদ গেছে। ব্যাটারা পালিয়েছে বলে আমি দুঃখিত নই।'

কর্তা আবার নিজের শয়নগৃহে এসে ঢুকলেন। তিনি বিপত্নীক। একলাই শয়ন করেন।

আলো নিভিয়ে তিনি খাটের উপর গিয়ে উঠলেন। তারপর শুয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হলেন। কিন্তু মন যখন উত্তেজিত, ঘুম সহজে আসে না।

—'হাঁচ্চো!'

কর্তা সবিস্ময়ে ধড়মড় করে উঠে বসলেন। তাঁর ঘরে হেঁচে ফেললে কে?

আবার—'হ্যাঁচ্চো!'

হাঁচির জন্ম খাটের তলায়, এটা বোঝা গেল। কিন্তু খাটের তলায় হাঁচি কেন বাবা? কর্তা তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে পড়ে আলোর সুইচ টিপতে গেলেন।

এবার আর হাঁচি নয়, খাটের তলা থেকে নির্গত হল মানুষের কণ্ঠস্বর।

কে বললে, 'খবরদার!'

কর্তা ম্রিয়মান কণ্ঠে বললেন, ''খবরদার'' বলছ কে বাবা?'

'আমি।'

'তুমি কে বাবা?'

'মনুষ্য।'

'অর্থাৎ, ডাকাত?'

'আমরা ডাকাত নই।'

'ও, তাহলে তোমরা যিশুখ্রিস্ট!'

'আমরা যিশুখ্রিস্ট নই।'

'উত্তম। তোমাদের পরিচয় জানতে চাই না। কিন্তু দুনিয়ার এত জায়গা থাকতে এখানে কেন?'

'পথ ভুলে।'

'ভুলটা বিস্ময়কর।'

'কিন্তু অসম্ভব নয়।'

'পথ ভুলে আমার খাটের তলায়? না বাপু, একথা জজে মানবে না।'

'খাটের তলা হচ্ছে অতি নিরাপদ ঠাঁই। খাসা আছি মশাই।'

'বুঝলুম। কিন্তু আমাকে কী করতে বল?'

'চ্যাঁচাবেন না। আলো জ্বালবেন না। আবার বিছানায় গিয়ে উঠে বসুন।'

'কথা যদি না শুনি?'

'আমার কাছে ভোজালি আছে।'

আর একটা কণ্ঠস্বর বললে, 'আমার কাছে রিভলবার আছে।'

আর একটা কণ্ঠস্বর বললে, 'আমার কাছে বন্দুক আছে।'

'দেখছি, দলে তোমরা ভারি। কিন্তু আর কিছু সঙ্গে করে আননি? কামান-টামান?'

'বিছানায় উঠলেন না? আবার ঠাট্টা হচ্ছে? আচ্ছা!'

খাটের তলায় একাধিক ব্যক্তির হামাগুড়ি দেওয়ার শব্দ শোনা গেল।

ডাকাতরা বাইরে বেরিয়ে আসছে। কর্তা সুড়সুড় করে আবার খাটের উপরে গিয়ে উঠলেন বিনা বাক্যব্যয়ে।

'এইবার আমরা কী করব জানেন?'

'আমার গলায় ছুরি দেবে?'

'না। আপনার হাত পা মুখ বেঁধে ফেলব।'

'এত দয়া কেন?'

'আমরা চাই না যে আপনি চেঁচান বা আমাদের তাড়া করেন।'

'আমি কিছুই করব না, তোমরা নির্ভয়ে প্রস্থান কর।'

'আপনার কথায় বিশ্বাস নেই।'

'জয় গুরু!'

'কী বললেন?'

'জয় গুরু! বিপদে বা সমস্যায় পড়লেই ''জয় গুরু'' বলা আমার স্বভাব।'

'আশ্চর্য! আমার মেসোমশায়েরও ঠিক ওই স্বভাব।'

'কার?'

'আমার মেসোমশায়ের। আপনার গলার আওয়াজও তাঁর মতো।'

'আমার ভায়রা-ভাইয়ের ছেলের গলাও তোমার মতো। কিন্তু সে তোমার মতো ডাকাত নয়।'

'আপনিও আমার মেসোমশায় নন। কারণ তাঁর বাসা বৌবাজারে।'

'কী বললে?'

'এটা বৌবাজার হলে আপনাকেই আমার মেসো বলে সন্দেহ হত।'

'তোমার মেসোর নাম কী?'

'চন্দ্রনাথ সেন।'

'বাবা, আমারও নাম ওই। আমিও বৌবাজারে থাকতুম, আজ দশ দিন হল এই নতুন বাসায় উঠে এসেছি।'

অটল ফস করে আলো জ্বাললে।

কর্তা বললেন, 'অটলা!'

অটল বললে, 'মেসোমশাই!'

অল্পক্ষণের স্তব্ধতা। কর্তা কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'অটল, এ ব্যবসা কতদিন ধরেছ?'

অটল কর্তার দুই পা জড়িয়ে ধরে বললে, 'আমি ডাকাত নই মেসোমশাই, আগে আমার কথা শুনুন।'

অটল একে একে সব কথা খুলে বললে।

কর্তার অট্টহাস্যে খালি বাড়ি নয়, রাত্রির বুক পর্যন্ত যেন কাঁপতে লাগল—'হো হো হো হো, হা হা হা হা! ওরে অটলা, আজ আমি হেসে হেসেই খাবি খাব রে। হি হি হি হি! ওরে

প্রমদা, তোর গালপাট্টাওয়ালা কেলে হাঁড়ির মতন ডাকাতের মুখগুলো একবার দেখে যা রে হো হো হো হো, হা হা হা হা হা হা...'

চাবি এবং খিল

এক

মধু ঘরে ঢুকে বললে, 'বাবু, একটি ভদ্দরলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

জয়ন্ত বললে, 'কে তিনি?'

—'নাম বললেন রাখোহরিবাবু!'

—'রাখোহরিবাবু? এমন সেকেলে নামধারী আধুনিক কোনও ভদ্রলোককে আমি চিনি বলে মনে হচ্ছে না তো!'

মধু বললে, 'তিনি বললেন, গেল বছরে দেওঘরে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে নাকি তাঁর আলাপ হয়েছিল।'

মানিক বললে, 'ওহো, হয়েছে! জয়ন্ত, তোমার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল দেখছি। দেওঘরের রাখোহরিবাবুকে এরই মধ্যে তুমি ভুলে গেলে?'

জয়ন্ত বললে, ''ভায়া, বিংশ শতাব্দীতে এমন পৌরাণিক নাম স্মরণ করে রাখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তা যা হক, এতক্ষণে আমার মনে পড়েছে।'

'আমাদের তোয়াজ করবার জন্যে রাখোহরিবাবু কি চেষ্টাই না করেছিলেন!'

—'থাক মানিক, আর বলতে হবে না। হে শ্রীমধুসূদন, তুমি ঝটিতি নিচে নেমে গিয়ে রাখোহরিবাবুকে বলে এসো—স্বাগত!'

মধুর প্রস্থান। ঘরের ভিতরে রাখোহরিবাবুর প্রবেশ অনতিবিলম্বে।

রাখোহরি নামটির জন্ম মান্ধাতার আমলে বটে, কিন্তু রাখোহরি নামধারী এই ব্যক্তিটি পৃথিবীর আলো দেখেছেন অতি আধুনিক যুগেই, তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই সে কথা আর বুঝতে বাকি থাকে না। বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ। একহারা সৌখিন চেহারা। গৌরবর্ণ। চোখে চওড়া ফ্রেমের চশমা। ঠোঁটের উপরে চার্লি চ্যাপলিন গোঁফ। গায়ে গিলে করা চুড়িদার পাঞ্জাবি। পরনে ফিনফিনে তাঁতের কাপড়। পায়ে সেলিম শু। হাতে রুপো বাঁধানো একগাছা সরু ছড়ি। উপরে মুক্তোর বোতাম, সোনার রিস্টওয়াচ ও এসেন্সের ভুরভুরে গন্ধ প্রভৃতি আধিক্যতার কথা আর নাই বা বললুম।

নমস্কার ও সাদর সম্ভাষণের আদান-প্রদান হবার পর একখানা চেয়ারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মানিক বললে, 'বসুন রাখোহরিবাবু। কিন্তু আপনাকে দেখলেই আমার কি মনে হয় জানেন?'

—'কি মনে হয়?'

—'পিতার অবাধ্য ছেলে বলে!'

—'কেন?'

—'পিতৃদেব আপনাকে একটি অতি অত্যন্ত সেকেলে নামে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আপনি নিজের চেহারাখানিকে দস্তুরমতো আপ-টু-ডেট করে তুলে একবারে হালফ্যাশানের বাবু বলে পরিচিত হতে চান। এটা কি আপনার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ নয়?'

রাখোহরিবাবু হেসে বললে, 'মোটেই নয়। পিতার অবাধ্য পুত্র হচ্ছে সেকালের সেই সব ছেলে, যারা পিতৃদত্ত নাম ত্যাগ করে গ্রহণ করে হালফ্যাশানের নতুন নতুন রঙচঙে নাম। আমি তো তা করিনি। স্বর্গীয় পিতৃদেব আমাকে যে নাম দিয়েছিলেন আমি তা মাথায় করে রেখেছি। নিজের সাজসজ্জাকে আমি আপ-টু-ডেট করে রাখব না, আমার বাবা তো এমন কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করে যায়নি। কিন্তু যাক সে কথা, আমি এখানে ছুটে এসেছি রীতিমতো দায়ে ঠেকেই!'

জয়ন্ত শুধোলে, 'ব্যাপার কী রাখোহরিবাবু?'

—'আমার ভগ্নীর অত্যন্ত বিপদ!'

জয়ন্ত একটু বিস্মিত হয়ে বললে, 'আপনার ভগ্নীর বিপদের জন্যে আপনি আমাদের কাছে ছুটে এসেছেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি ছাড়া আর কেউ তাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না।'

—'আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারছি না। আপনার ভগ্নীর কী হয়েছে?'

—'শুনুন তবে বলি।'

দুই

রাখোহরি বললে, 'স্বামীর বিপদকে প্রত্যেক স্ত্রীই নিজের বিপদ বলেই মনে করে। পুলিস আমার ভগ্নীপতিকে গ্রেপ্তার করেছে।'

—'কেন?'

—'চুরির অপরাধে।'

জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'আপনার ভগ্নীপতি যদি চুরি করে ধরা পড়ে থাকেন, তাহলে আমি হাজার চেষ্টা করলেও তাঁকে পুলিসের হাত থেকে তো ছাড়িয়ে আনতে পারব না।'

—'জয়ন্তবাবু, আমার ভগ্নীপতি চোর হলে আমি আপনার কাছে ধর্না দিতে আসতুম না। সুব্রত আর যাইই হক, চোর নয়।'

—'আপনার ভগ্নীপতির নাম সুব্রত?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। সুব্রত সেন।'

—'সব কথা ভাল করে খুলে বলুন!'

—'আমরা এক ভাই, এক বোন। তার নাম রাধারাণী, আমার চেয়ে সে দুই বছরের ছোট। বাবা খুব ভাল ঘরেই তার বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন! সুব্রতও ছিল দেখতে শুনতে রীতিমতো

সুপাত্র। তার পৈতৃক সম্পত্তির আয় ছিল মাসিক তিন-চার হাজার টাকা। কিন্তু জয়ন্তবাবু, সর্বনেশে ঘোড়ারোগে সর্বস্ব তার উড়ে গিয়েছে।'

—'ঘোড়ারোগে?'

—হ্যাঁ, ঘোড়াদৌড়। সর্বস্বান্ত হয়ে তার রোগ আরও বেড়ে যায়, সে টাকা ধার করে রেস খেলতে থাকে আর কতগুলো হতচ্ছাড়া জুয়াড়ির সঙ্গে মিশে মদ পর্যন্ত ধরে। যত বাজি হারে তত মদ খায়। জুয়া আর নেশা, এখন এই হয়েছে তার ধ্যান-জ্ঞান-প্রাণ।'

জয়ন্ত বললে, 'রাখোহরিবাবু, আপনার ভগ্নীপতির যে ছবি আঁকলেন, তা মোটেই উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে না।'

—'ইদানীং মাতাল হয়ে অনেক রাতে বাড়িতে ফিরে রাধারাণীকে সে যা-তা গালিগালাজ দিতে শুরু করেছিল। তার অপরাধ স্বামীকে সে মদ খেতে আর জুয়া খেলতে মানা করত। শেষটা আর সইতে না পেরে রাধারাণী আমার কাছে পালিয়ে এসেছে—যদিও এখনও স্বামীকে প্রাণের মতো ভালবাসে, দেবতার মতো ভক্তি করে।'

—'তারপর, সেই চুরির ব্যাপারটা কী?'

—'দেনার দায়ে সুব্রত পৈতৃক বাড়ি বিকিয়ে দিয়েছে, সে ভাড়াটে বাড়িতে থাকে। এক অংশে সে থাকে আর এক অংশে থাকে তার বাড়িওয়ালা জগন্নাথ। শুনছি আজ পাঁচদিন আগে জগন্নাথের পঞ্চাশ হাজার টাকা চুরি গিয়েছে আর পুলিস চোর বলে গ্রেপ্তার করেছে সুব্রতকে।'

—'সুব্রতর বিরুদ্ধে কী কী প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে?'

—'আমি এখনও তা ভাল করে জানতে পারিনি। তবে আমার আর রাধারাণীর দৃঢ় বিশ্বাস, সুব্রত যত নিচেই নামুক, কিছুতেই চুরি করতে পারে না।'

—'রাখোহরিবাবু, আপনাদের এ বিশ্বাস যুক্তিহীন, আদালতে গ্রাহ্য হবে না। পুলিস বিনা প্রমাণে কারুকেই গ্রেপ্তার করতে পারে না। এ মামলাটার ভার পেয়েছেন কোন পুলিস কর্মচারী?'

—'আপনাদের বন্ধু সুন্দরবাবু।'

জয়ন্ত অল্পক্ষণ চুপ করে রইল; তারপর বললে, 'সুন্দরবাবু রোজ সকালে আমাদের প্রভাতী চায়ের আসরে যোগ দেন। কাল তিনি আসবেন, তাঁর কাছ থেকে মামলার সব কথা জেনে নেব।'

—'হয়তো কাল তিনি আসবেন না।'

মানিক বললে, 'অসম্ভব! আপনি সুন্দরবাবুকে জানেন না। তাঁর নিজের ফরমাস মতো কাল এখানে চিকেন পাই নামে একটি বিলিতি খাবার তৈরি হবে। সেটিকে উদরস্থ করবার জন্যে সুন্দরবাবু নিশ্চয়ই পৃথিবীর যাবতীয় আকর্ষণ ত্যাগ করে এখানে ছুটে না এসে থাকতে পারবেন না।'

রাখোহরি কাতরকণ্ঠে বললে, 'না জয়ন্তবাবু, আমার বিনীত অনুরোধ, আপনি আজকেই সুন্দরবাবুর কাছে গিয়ে সব কথা শুনে আসুন। আপনি রাধারাণীর অবস্থা জানেন না। আজ ক'দিন থেকেই তার চোখে নেই নিদ্রা, দিনরাত সে খালি কাঁদছে আর কাঁদছে। কাল থেকে আহার পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে, বলে—সুব্রত খালাস না পেলে অনাহারেই প্রাণত্যাগ করবে। তাঁকে বাঁচাবার জন্যেই আমি আজ নাচার হয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।'

জয়ন্ত গম্ভীরস্বরে বললে, 'রাখোহরিবাবু, আমি যাদুকর নই, আমার উপরে এতটা নির্ভর করবেন না। সুব্রত যদি সত্যই চুরি করে থাকে, আমি কিছুতেই তাকে বাঁচাতে পারব না।'

—'তবু আপনি একবার চেষ্টা করে থানায় গিয়ে সুন্দরবাবুর সঙ্গে দেখা করুন।'

—'বেশ, তাই করব।'

তিন

গদিয়ান হয়ে টেবিলের সামনে বসে ছিলেন সুন্দরবাবু। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর এক সহকারী এবং আর একজন অপরিচিত ভদ্রলোক।

জয়ন্ত ও মানিককে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে দেখে সুন্দরবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'হুম, একেবারে মানিকজোড়! ব্যাপার কী জয়ন্ত? "অসময়ে কেন হে প্রকাশ"?'

জয়ন্ত বললে, 'সুব্রতর মামলাটার তদ্বির করবার ভার পড়েছে আমার উপরে।'

—'বটে, বটে! তোমার উপরে কে এ ভার দিলে ভায়া? সুব্রতর স্ত্রী রাধারাণী দেবী বুঝি?'

—'আপনার এমন সন্দেহের কারণ?'

—'কারণ? রাধারাণী দেবীর দ্বারা আমি নিজেই আক্রান্ত হয়েছি।'

—'আক্রান্ত?'

—'তা ছাড়া আর কি বলি বল? বড়ই মুশকিলে পড়েছিলুম হে। পরশুদিন রাধারাণী দেবী হঠাৎ আমার কাছে এসে ধর্না দিলেন। উস্কোখুস্কো রুক্ষ চুল, ফোলা ফোলা চোখের পাতা, উদভ্রান্ত চাউনি, ময়লা কাপড়—একেবারে বিষাদপ্রতিমা! ক্রমাগত কাঁদেন, থেকে থেকে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরতে আসেন আর করুণস্বরে বলতে থাকেন—"আমার স্বামীকে ছেড়ে দিন, আমার স্বামীকে ছেড়ে দিন, তিনি নির্দোষ।" জানই তো ভাই, পুলিসের লোক হয়েও আমার একটি দুর্বলতা আছে, স্ত্রীলোকের অশ্রুবর্ষণ আমি সহ্য করতে পারি না। তার উপরে মহিলাটির স্বামীভক্তি দেখে আমার মনটা আরও ভিজে গেল। অমন দুরাচার স্বামীর অমন পতিব্রতা স্ত্রী! কি করে যে রাধারাণী দেবীর কাছ থেকে ছাড়ান পেয়েছি, তা আর বলবার নয়। যাবার সময়ে আবার ভয় দেখিয়ে গিয়েছেন, তিন দিনের মধ্যে সুব্রত ছাড়া না পেলে তিনি আমার বাড়ির দরজায় হত্যা দিয়ে পড়ে থাকবেন। কিন্তু আমি কি করি বল জয়ন্ত? আমি পুলিস কর্মচারী, আইনের বাঁধনে আমার হাত বাঁধা; সুব্রতকে মুক্তি দেবার ক্ষমতা তো আমার নেই।'

জয়ন্ত শুধোলে, 'সুব্রতকে কি সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, না তার বিরুদ্ধে বিশেষ কোনও প্রমাণ আছে?'

—'প্রমাণ আছে বইকি, যথেষ্ট প্রমাণ আছে।'

—'মামলাটার বিবরণ গোড়া থেকে শুনতে পেলে খুশি হব।'

সামনের অপরিচিত ভদ্রলোকটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সুন্দরবাবু বললেন, 'গোড়ার কথা শোনো ওঁর মুখ থেকে, কারণ ওঁর বাড়িই হচ্ছে ঘটনাস্থল। ওঁর নাম হচ্ছে বাবু জগন্নাথ পাল।'

জয়ন্ত ফিরে জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে দেখল। হৃষ্টপুষ্ট, বেঁটেসেটে, কালো কালো মানুষটি, গলায় তুলসীমালা—দেখলেই মনে হয় কোনও গদির মালিক।

জয়ন্ত শুধোলে, 'আপনিই জগন্নাথবাবু, সুব্রতর বাড়িওয়ালা?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।

—'মশাইয়ের কী করা হয়?'

—'দরমাহাটায় আমার চিনির কারখানা আছে।'

—'আচ্ছা, এইবারে অনুগ্রহ করে সব কথা খুলে বলুন দেখি। ছোট আর বড় সব কথা—সামান্য বা অকিঞ্চিৎকর ভেবে কোনও কথা বলতে ভুলবেন না।'

চার

জগন্নাথ বলতে লাগলেন : আমার বসতবাড়ি হচ্ছে দর্জিপাড়ায়।

সংসারে আমরা ছয়জন লোক—আমি, আমার স্ত্রী, দুই ছেলে, এক মেয়ে, আর আমার এক ভ্রাতুষ্পুত্র। আমার চিনির কারবার থেকে মন্দ আয় হয় না, সুতরাং নিজেকে আমি সম্পন্ন গৃহস্থ বলেই বর্ণনা করতে পারি।

শ্রীনাথ বলে আমার এক ছোট ভাই ছিল, পাটের দালালিতে সে বেশ দু'পয়সা রোজগার করত। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাসা বেঁধেছিল আহিরিটোলায়। কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় বছর চারেক আগে তার স্ত্রী মারা পড়ে আর মাস কয়েক আগে হঠাৎ কলেরা রোগে তারও মৃত্যু হয়। তখন শ্রীনাথ আমাকেই তার সম্পত্তির অছি করে যায়। আমার বসতবাড়ির দুই অংশ। আমার সংসার ছোট, একটা অংশেই সকলের স্থান সঙ্কুলান হয়। তাই বাকি অংশটা ভাড়া দিয়েছি। আজ আট মাস আগে সেই অংশটা ভাড়া নিয়েছেন সুব্রতবাবু। বাড়ির এই দুই অংশের মধ্যে আনাগোনা করবার উপায় নেই। দোতলার ছাদটা পাঁচিল দিয়ে দুই ভাগে ভাগ করা। দুই অংশেই ছাদের উপরে আছে একখানা করে তিনতলার ঘর।

কিছুদিন যাবৎ সুব্রতবাবুর সঙ্গে নানা কারণে আমার আর বনিবনাও নেই। আমি তাঁকে বিশিষ্ট ভদ্রলোক ভেবেই ভাড়া দিয়েছিলুম। কিন্তু বেশিদিন না যেতেই বুঝতে পারলুম, তিনি হচ্ছেন একের নম্বরের জুয়াড়ি আর বেহেড মাতাল। তাঁর বাড়িতে যে সব লোক যাওয়া আসা করে তাদের চেহারা ভদ্রলোকের মতো নয়। কোনও কোনও রাতে মাতলামি আর হুল্লোড়ের চোটে পাড়ার লোকে ঘুমোতে পারে না।

তার উপরে সুব্রতবাবুর কাছ থেকে আজ তিন মাসের বাড়ি ভাড়ার টাকা আমি পাইনি। কাজেই তাঁকে আমি বাড়ি ছাড়বার জন্যে নোটিস দিতে বাধ্য হয়েছিলুম। সেইজন্যে ক্ষেপে গিয়ে একদিন তিনি মদের মুখে ছাদে উঠে যা-তা অকথা কুকথা বলতেও কসুর করেননি। আমি তো দূরের কথা, সুব্রতবাবুর গালাগালি আর সইতে না পেরে তাঁর স্ত্রী পর্যন্ত বাপের বাড়িতে পালিয়ে গিয়েছেন।

এইবার আসল ঘটনার কথা শুনুন। আমার ভাই শ্রীনাথ জীবনবীমা করে গিয়েছিল। তার ফলে তার মৃত্যুর পরে শ্রীনাথের বীমাপত্রে পাওনা হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা। আমি শ্রীনাথের সম্পত্তির অছি। তার নাবালক পুত্রের হয়ে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা

আমি উদ্ধার করি। এ হচ্ছে—ছয় দিন—অর্থাৎ ঘটনার আগের দিনের কথা। সমস্ত টাকা আমি বাড়িতে এনে আমার তিনতলার শয়ন গৃহে লোহার আলমারির ভিতরে তুলে রাখি।

জয়ন্তবাবু, আপনার মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছে, আপনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছেন। ভাবছেন, এই ডামাডোলের দিনে এত টাকা কেউ ব্যাঙ্কে জমা না দিয়ে বাড়িতে এনে রাখেন! বিস্মিত হবার কথাই বটে।

কিন্তু টাকাটা যখন হাতে পাই, তখন সেদিন ব্যাঙ্কে জমা দেবার সময় উতরে গিয়েছিল; পরদিনও জমা দেওয়া হয়নি কেন, তারও কারণ শুনুন। আমার এক বাল্যবন্ধু আছেন, কুমুদকান্ত চৌধুরী। তিনি মনসাপুরের দারোগা। পরদিনেই অর্থাৎ গেল চব্বিশ তারিখে ছিল তাঁর মেয়ের বিয়ে, আমি নিমন্ত্রিত হয়ে সকালের ট্রেনেই সপরিবারে মনসাপুরে চলে যেতে বাধ্য হই। এজন্যে আমার মনে ছিল না কোনই দুশ্চিন্তা। কারণ বাড়িতে রইল যে দুজন ভৃত্য ও একজন পাচক, তারা প্রত্যেকে পুরাতন, পরীক্ষিত ও বিশ্বাসী লোক। তাদের জিম্মায় বাড়ি রেখে এর আগেও দুই-একমাসের জন্যে আমরা পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছি। দ্বিতীয়ত, আমার শোবার ঘরে যে অত টাকা আছে, তখন পর্যন্ত এ কথা আমি ছাড়া জনপ্রাণী জানত না।

এখন বুঝতে পারছি, আমার কাজটা হয়েছিল অত্যন্ত কাঁচা। কারণ, পরদিনই মনসাপুর থেকে কলকাতা ফিরে আবিষ্কার করলুম, আমার আলমারির ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়েছে সেই পঞ্চাশ হাজার টাকার নোট, আর কিছু কিছু অলঙ্কার। বেশির ভাগ গহনাই ছিল আমার স্ত্রী আর মেয়ের গায়ে তাই রক্ষা, নইলে সেগুলোকেও আর দেখতে পেতুম না।

আলমারি ভাঙা হয়নি, চাবি দিয়ে খুলে ফেলা হয়েছে। চোর যে বাড়ির বাইরে থেকে এসেছে, সে প্রমাণও পাওয়া গেল। আমার বাড়ির ভিতর থেকে শোবার ঘরে ঢুকবার দরজাটা ছিল তালাবন্ধ কিন্তু খোলা ছিল দ্বিতলের ছাদে যাবার একটিমাত্র দরজা। ঘরের মেঝেয় কুড়িয়ে পেলুম তার খিলটা, দরজায় উপুড় হয়ে বাইরে থেকে ধাক্কাধাক্কির ফলেই যে সেটা খসে পড়েছে, একথা বুঝতেও বাকি রইল না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, সজোরে ধাক্কাধাক্কির ফলে খিল খসে পড়ল, তবু বাড়ির লোকজন তা শুনতে পেলে না কেন? এর সহজ উত্তর হচ্ছে, চোর নিশ্চয়ই এসেছিল ঘটনার দিন রাত্রে এবং সেটা ছিল বিষম দুর্যোগের রাত্রি—ঝড়, বাজ আর বৃষ্টির শব্দে ডুবে গিয়েছিল পৃথিবীর অন্য সব শব্দ।

আমার আর কিছু বক্তব্য নেই।

পাঁচ

জয়ন্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে শুধোলে, 'সুন্দরবাবু, এই চুরির মামলায় আপনারা সুব্রতকে আসামী বলে সন্দেহ করছেন কেন?'

সুন্দরবাবু বলেন, 'হুম, সন্দেহ কি? তার বিরুদ্ধে অকাট্য সব প্রমাণ পেয়েছি!'

—'কি রকম প্রমাণ শুনি?'

—'জগন্নাথবাবুর তিনতলার শোবার ঘরের বাইরে থেকে যদি চোর আসে, তবে তাকে সুব্রত যে অংশে থাকে সেইদিক দিয়েই আসতে হবে। দুই অংশের মাঝখানে আছে কেবল

একটা ছয় ফুট উঁচু পাঁচিল, যে কোনও বালক সেটা ডিঙিয়ে এ ছাদে ও ছাদে আনাগোনা করতে পারে। কাজেই তদন্ত করবার জন্য আমি প্রথমেই গেলুম সুব্রতর বাসায়। কিন্তু গিয়ে দেখলুম, অবস্থা তার অত্যন্ত শোচনীয়। তাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করব কি, মদ খেয়ে সে একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। আমার কথার জিজ্ঞাসার উত্তরে পাগলের মতো বলতে লাগল যত সব অসংলগ্ন কথা। বাড়িতে আর কারুর সাড়া পেলাম না। পাড়ার লোকের মুখে শুনলুম একটা চাকর ছিল, মাহিনা না পেয়ে সেও চম্পট দিয়েছে। আরও শুনলুম, ঘটনার দিনে রেসএ গিয়ে সুব্রত হেরে ভূত হয়ে বাসায় ফিরে এসেছে; আর সেই দুঃখে কাল থেকে ক্রমাগত মদ খেয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। তারপর তার বাড়িখানা তল্লাস করে কী পাওয়া গেল জান? এই চাবিটা?' তিনি অঙ্গুলিনির্দেশ করে টেবিলের উপরে একটা বড় চাবির দিকে জয়ন্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

জয়ন্ত চাবিটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'এটা কিসের চাবি?'

—'জগন্নাথবাবুর লোহার আলমারির।'

—'কিন্তু এ চাবি সুব্রতর বাড়িতে গেল কেমন করে? জগন্নাথবাবু, আপনার আলমারির কোনও চাবি কি খোয়া গিয়েছে?'

জগন্নাথ বললেন, 'আজ্ঞে না। আমার আলমারির চাবি আমার পকেটেই আছে।'

—'দেখি সেটা।'

জয়ন্ত দুটো চাবিই টেবিলের উপরে পাশাপাশি রেখে কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখে তারপর বললে, 'তাহলে বলতে হয়, এর মধ্যে একটা চাবি আসল, আর একটা নকল?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তাছাড়া আর কি? সুব্রত অন্য কোনদিন কোনও ফাঁকে জগন্নাথবাবুর তিনতলার ঘরের দরজা খোলা পেয়ে আলমারির কলের ছাঁচ তুলে নিয়ে গিয়েছিল।'

—'চাবিটা সুব্রতর বাড়ির কোথায় পাওয়া যায়?'

—'তিনতলার ঘরের মেঝেয়।'

—'সেটাও কি শোবার ঘর?'

—'না, বোধহয় সেটা বাড়তি ঘর। কোনও আসবাব নেই। মেঝে ভিজে স্যাঁৎসেতে, নিশ্চয় দরজা জানালা খোলা থাকে, কারণ ঘটনার রাত্রে বৃষ্টির জল এসে ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল।'

—'সব বুঝলুম। আপনার টেবিলের উপরে একটা খিল পড়ে আছে দেখছি। ওটাও কি ঘটনাস্থল থেকে এসেছে?'

—হ্যাঁ জয়ন্ত। ওই খিল ভেঙেই চোর জগন্নাথবাবুর ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল।'

খিলটা তুলে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে জয়ন্ত বললে, 'দেখছি খিলটা ভাঙেনি, ইস্ক্রুপের প্যাঁচ খুলে সরাসরি উঠে এসেছে। তাহলে ওই চাবি আর এই খিলই হচ্ছে এ মামলার প্রধান প্রমাণ?'

—'হ্যাঁ। ওই খিল প্রমাণিত করছে চোর এসেছে বাইরে থেকে। আর ওই চাবি প্রমাণিত করছে, সুব্রতই হচ্ছে চোর। তার উপরে সুব্রতর নষ্ট স্বভাব আর দারুণ অর্থাভাবও তার বিরুদ্ধে যাবে, কেননা মানুষকে অপরাধী করে ওই দুটো কারণই। সেই জন্যেই আমি তাকে গ্রেপ্তার করেছি।'

—'সুব্রতর মদের নেশা তো কেটে গিয়েছে, এখন সে কী বলে?'

—'বলে চব্বিশ তারিখের সন্ধ্যা থেকে পরদিন দুপুর পর্যন্ত কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে গিয়েছে, মদে চুর হয়ে কিছুই সে জানতে পারেনি। বলে, ওই চাবিও সে কখনও চোখেও দেখেনি; অর্থাভাবে সে আত্মহত্যা করতে পারে, কিন্তু চুরি করা তার পক্ষে অসম্ভব, প্রভৃতি।'

জয়ন্ত বললে, 'জগন্নাথবাবু, লোহার আলমারিটা আপনি কতদিন আগে কিনেছিলেন?'

—'তা প্রায় দশ বৎসর হবে।'

—'আমার আরও কিছু জিজ্ঞাসা আছে। হ্যাঁ, ভাল কথা। আপাতত এই খিলগাছা আমি নিয়ে চললুম। বৈকালে ফেরৎ পাবেন। চল হে মানিক।'

বাইরে রাস্তায় এসে মানিক দেখলে, জয়ন্ত প্রশান্তবদনে নিজের রুপোর নস্যদানি বার করে দুই টিপ নস্য গ্রহণ করলে।

মানিক বিস্মিত স্বরে বললে, 'জয়ন্ত, বেশি খুশি না হলে তুমি তো নস্য নাও না! এরই মধ্যে মামলাটার কোনও সুরাহা করতে পেরেছ নাকি?'

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জয়ন্ত বললে, 'এই খিলগাছা নিয়ে তুমি আমার বাড়িতে যাও। আমার অন্য জরুরি কাজ আছে, ফিরতে দেরি হতে পারে।'

ছয়

বৈকাল উতরে গেল। বৈঠকখানায় বসে আছে জয়ন্ত ও মানিক।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, 'কই হে মানিক, সুন্দরবাবুরা তো এখনও আত্মপ্রকাশ করলেন না!'

মানিক কান পেতে শুনে বললে, 'কিন্তু বাড়ির দরজায় কার গাড়ি এসে থামল। বোধহয় সুন্দরবাবুই এলেন।'

কিন্তু ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল রাখোহরির পিছনে পিছনে একটি তরুণী মহিলা। তরুণী এবং রূপসী বটে, কিন্তু তার যাতনা-বিকৃত মুখের দিকে তাকালে সে দেহের তারুণ্য ও লাবণ্য দৃষ্টিকে কিছুমাত্র আকৃষ্ট করে না। পরনে ময়লা কাপড়, মাথার চুল তৈলাভাবে অচিক্কণ, চোখের চাউনি উদভ্রান্তের মতো।

জিজ্ঞাসুনেত্রে রাখোহরির মুখের পানে তাকালে জয়ন্ত।

রাখোহরি বললে, 'আমার বোন রাধারাণী আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।' ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে জয়ন্ত বললে, 'বসুন রাধারাণী দেবী।'

রাধারাণী বসে পড়ল বটে, তবে চেয়ারের উপরে নয়, হাঁটু গেড়ে মেঝের উপরে। তারপর হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে দুই বাহু বাড়িয়ে জয়ন্তর পা জড়িয়ে ধরতে গেল।

—'করেন কি, করেন কি!' বলতে বলতে জয়ন্ত তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

রাধারাণী করুণ স্বরে বললে, 'রক্ষা করুন, আমার স্বামীকে রক্ষা করুন!' ঠিক সেই সময়ে সদরের কাছে আর একখানা গাড়ি এসে দাঁড়ানোর শব্দ হল।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি বললে, 'রাধারাণী দেবী, নিশ্চয়ই সুন্দরবাবু আসছেন সদলবলে। শিগগির আপনি পাশের ঘরে গিয়ে দাঁড়ান। আপনার স্বামীকে আমি রক্ষা করতে পারব কি না জানি না, তবে অঙ্গীকার করছি, তার সঙ্গে এখনই আপনার দেখা করিয়ে দেব। যান, আর দেরি করবেন না।'

রাধারাণী পাশের ঘরে প্রবেশ করলে অত্যন্ত নাচারের মতো। সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবাবুর আবির্ভাব, তারপর এল জগন্নাথ ও আর এক বিষণ্ণ মূর্তি;—বয়সে সে যুবক, উস্কোখুস্কো মাথার চুল, সুন্দর মুখশ্রী কিন্তু কালিমায় পরিম্লান।

সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত, এই আসামী।'

জয়ন্ত শুধোল, 'আপনার নামই সুব্রতবাবু?'

ভীরু মুখ তুলে একবার জয়ন্তর দিকে তাকিয়েই আবার মুখ নামিয়ে সুব্রত অতি মৃদুস্বরে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'ভদ্রলোকের ছেলে, শেষটা চোর দায়ে ধরা পড়লেন?'

নত নেত্রেই সুব্রত বললে, 'ভগবান জানেন, আমি চোর নই!'

—'আপনার কথা যদি সত্য হয়, তবে বিচারে নিশ্চয়ই আপনি খালাস পাবেন। কিন্তু খালাস পাবার পরেও তো আবার আপনি রেস খেলবেন, মদ খাবেন, কুসঙ্গে মিশবেন, সাধ্বী স্ত্রীর সঙ্গে অমানুষের মতো ব্যবহার করবেন।'

ভগ্নকণ্ঠে সুব্রত বলে উঠল, 'আবার? কখনও নয়, কখনও নয়!'

জয়ন্ত বললে, 'শুনে সুখী হলুম। আপাতত একবার পাশের ওই ঘরে যান দেখি, ওখানে রাধারাণী দেবী আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

সুব্রত চমকে বলে উঠল, 'রাধারাণী দেবী।'

—'হ্যাঁ, আপনার স্ত্রী।'

সুব্রত পাশের ঘরের ভিতরে গেল দ্রুতপদে।

সুন্দরবাবুও হন হন করে সুব্রতর পিছনে পিছনে অগ্রসর হচ্ছিলেন, কিন্তু জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, 'মাভৈঃ! আপনার আসামী চম্পট দিতে পারবে না। পাশের ঘরে ওই একটিমাত্র দরজা, কারুকে বেরুতে হলে এই ঘরের ভিতর দিয়েই বাইরে যেতে হবে। আসুন সুন্দরবাবু, এইবারে আমাদের কাজের কথা হক।'

সাত

সুন্দরবাবু বিরক্ত স্বরে বললেন, 'কাজের কথা? কি কাজের কথা? বিরহী আর বিরহিণীর মিলন দেখবার জন্যে আমরা এখানে আসিনি।'

মানিক বললে, 'হ্যাঁ সুন্দরবাবু। জয়ন্তও সে কথা জানে বলেই আপনাকে পাশের ঘরে যেতে দিলে না।'

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'তুমি থামো মানিক, বাজে ফ্যাচ-ফ্যাচ কোরো না। জয়ন্ত, আসামীকে আজই আমি চালান দিতে চাই। তার আগে তোমার যদি কোনও বক্তব্য থাকে তো বলো।'

জয়ন্ত বললে, 'জগন্নাথবাবু, আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে, আপনার শোবার ঘরে দু'টো দরজা—একটা ছাদের দিকে আর একটা ভিতর-বাড়ির.দালানের দিকে। চুরির পরদিনে দেখা যায়, ছাদের দরজাটা খোলা রয়েছে, কিন্তু ভিতর দিকের দরজাটা তো তালাবন্ধ ছিল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'তালার চাবি ছিল কোথায়?'

—'আমার পকেটে।'

'উত্তম। এখন শুনুন সুন্দরবাবু। জগন্নাথবাবুর লোহার আলমারির আসল আর নকল চাবি দুটো আমার ওই টেবিলের উপরে পাশাপাশি রেখে দিন।'

কথামতো কাজ করলেন সুন্দরবাবু।

জয়ন্ত শুধোলে, 'কী দেখছেন?'

সুন্দরবাবু নীরস কণ্ঠে বললেন, 'দেখব আবার কী ছাই? দুটো চাবি।'

—'চাবি দুটোর মাপজোক গড়ন-পিটন একরকম।'

—'হ্যাঁ, অবিকল।'

—'এটা কি সন্দেহজনক নয়?'

—'কেন কেন?'

—'ধরুন, আপনি এক এক দিনে এক একজন কারিগর ডাকলেন। তাদের প্রত্যেককে দিয়ে একই কলের জন্যে দুটো চাবি গড়ালেন। সেই দুটো চাবি দিয়েই কল খোলা যাবে বটে, কিন্তু তাদের গড়ন পিটন কিছুতেই একরকম হবে না, আর আকারেও কোনটা হবে কিছু ছোট, কোনটা হবে কিছু বড়।'

—'হ্যাঁ, এ কথা ঠিক।'

—'কিন্তু এই দুটো চাবি দেখলেই বোঝা যায়, একই সময়ে একই মাপজোকের সঙ্গে মিলিয়ে একই কারিগরের হাতে দুটো চাবিই হয়েছে।'

—'হুঁ!'

—'আর একটা জিনিস লক্ষ্য করুন। আপনারা যেটাকে আসল চাবি বলছেন, তার বয়স নাকি দশ বৎসর। চাবিটা যে পুরাতন, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। তবে নিয়মিত ব্যবহারের দরুণ তার উপরে একটা পালিশ পড়েছে বটে। আর যেটাকে নকল চাবি বলা হচ্ছে, সেটাও দেখতে পুরাতন হলেও তার উপরে মরচে ধরে গিয়েছে।'

সুন্দরবাবু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'তুমি কী বলতে চাও জয়ন্ত?'

—'আমি বলতে চাই যে, সুব্রতবাবু এ পাড়ার নতুন বাসিন্দা। তিনি যদি আলমারির কলের ছাঁচ তুলে দ্বিতীয় একটা চাবি গড়াতেন, তাহলে দেখলে তাকে মরচে-ধরা পুরাতন বলে ভ্রম করবার উপায় থাকত না। আর দেখতেও সেটা হত না আকারে আর গড়ন-পিটনে অবিকল প্রথম চাবিটার মতো।'

সুন্দরবাবু কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন, কোনও প্রতিবাদ করতে পারলেন না।

জয়ন্ত গাত্রোত্থান করে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'এখানে আসুন সুন্দরবাবু, এইবার আর একটা ব্যাপার প্রতিবাদন করতে হবে।'

জয়ন্তর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন সুন্দরবাবু। দরজার পাল্লা দু'খানা ভেজিয়ে দিয়ে জয়ন্ত বললে, 'দেখুন জগন্নাথবাবু ছাদের দরজার খিলটা আমি নতুন ইস্ক্রুপ দিয়ে আমার দরজায় লাগিয়ে দিয়েছি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুঁ, এ আবার কী বাবা?'

জয়ন্ত বললে, 'মানিক তুমি ঘরের বাইরে যাও। আচ্ছা, এইবার আমি দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে নতুন খিলটা লাগিয়ে দিলুম। মানিক, তুমি বাইরে থেকে জোরে ধাক্কা মেরে দরজাটা খুলে ফেলবার চেষ্টা করো!'

মানিক সজোরে বার চারেক ধাক্কা মারবার পরেই সশব্দে খিলটা ভেঙে দরজার পাল্লা দু'খানা খুলে গেল এবং খিলের একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল গিয়ে মাটির উপরে।

জয়ন্ত বললে, 'আমি যা ভেবেছি তাই। সাধারণত বাঙালিবাড়ির খিলগুলো হয় হালকা। অর্গল-বন্ধ দরজা জোর করে কেউ বাইরে থেকে খুলতে গেলে ধাক্কা মারে দরজার মাঝ বরাবর, আর খিলটাও ভেঙে যায় মাঝখান থেকেই—এখানেও ঠিক তাই হয়েছে।'

সুন্দরবাবু একেবারে স্তব্ধ।

খিলের যে অংশ তখনও দরজার সঙ্গে সংলগ্ন ছিল সেটা দুই হাতে তুলে ধরে জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু যদি কেউ ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে খিলের মাঝখান ধরে এমনি করে জোরে টান মারে তাহলে কী হয় দেখুন—তার এক টানেই খিলের অপর এক অংশটা ইস্ক্রুপের প্যাঁচ ছাড়িয়ে উপড়ে এল।

সুন্দরবাবু মাথার টাক চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'তবে তো দেখছি চোর হচ্ছে বাড়িরই লোক!'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'হ্যাঁ, আর সেই লোক হচ্ছেন জগন্নাথবাবু নিজেই।'

জগন্নাথ আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে মুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'বুদ্ধির গলায় দড়ি! নিজের টাকা আমি চুরি করব নিজেই।'

জয়ন্ত বললে, 'এ আপনার নিজের টাকা নয় জগন্নাথবাবু, এ হচ্ছে আপনার পিতৃমাতৃহীন নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্রের টাকা। সুব্রতবাবুর দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে সেই টাকা আপনি আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলেন। আলমারি কেনবার সময়েই আপনি পেয়েছিলেন একরকম দেখতে দুটো চাবি—একটা ছিল তোলা, আর একটা নিজে ব্যবহার করতেন। সেই তোলা চাবিটাই আপনি পাঁচিল টপকে গিয়ে বেচারা সুব্রতবাবুর ঘরের ভিতরে নিক্ষেপ করেছিলেন। আরও শুনুন। সারাদিন ঘুরে ঘুরে আপনার সম্বন্ধে আমি আরও কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। আপনার চিনির কারবার প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। ঋণে আপনার মাথা বিকিয়ে যাবার মতো হয়েছে। লয়েডস ব্যাঙ্কে আপনার নামে জমা আছে মাত্র একশ টাকা। গেল তেইশ তারিখে বীমা কোম্পানির কাছ থেকে আপনি পেয়েছিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। পরদিন সকালেই আপনি সপরিবারে মনসাপুরে যাত্রা করেন বটে, কিন্তু সরাসরি স্টেশনে গিয়ে হাজির হননি,

আগে সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কে নিজের স্ত্রী অবলাবালা দেবীর নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দিয়ে তবে স্টেশনে যান। তারপর—'

জয়ন্তর কথা ফুরোবার আগেই জগন্নাথ দরজার দিকে অগ্রসর হতে হতে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'আমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর পাগলের প্রলাপ শুনতে রাজি নই!'

এক লাফে তার সামনে গিয়ে পড়ে সুন্দরবাবু বললেন, 'হুঁ, মাইরি নাকি—যাবে কোথায় চাঁদ? তোমার চক্রান্তে ভুলে সুব্রতকে আদালতে নিয়ে গিয়ে আসামী বলে খাড়া করলে শেষটা হয়তো আমাকে গর্দভ নাম কিনতে হত, আর কি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি!'

আচম্বিতে পাশের ঘর থেকে দুই মূর্তি বেরিয়ে জয়ন্তর পায়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল—সুব্রত এবং রাধারাণী। তার দুই পা ভিজে গেল তাদের আনন্দের অশ্রুজলে।

তাদের হাত ধরে তুলে জয়ন্ত অভিভূত কণ্ঠে বললে, 'আপনাদের ওই অশ্রুজলই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার!'

বর্গী এল দেশে

এক

'খোকা ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো
বর্গী এলো দেশে'—

আমাদের ছেলেভুলানো ছড়ার একটি পংক্তি।

মনে করুন বাংলাদেশের শান্ত-স্নিগ্ধ পল্লীগ্রাম। দুপুরবেলা, চারিদিকে নিরালা। শ্যামসুন্দর পল্লীপ্রকৃতি রৌদ্রপীত আলো মেখে করছে ঝলমল ঝলমল। বাতাসে কোথা থেকে ভেসে আসছে বনকপোতের অলস কণ্ঠস্বর।

চুকে গিয়েছে গৃহস্থলীর কাজকর্ম। মাটিতে শীতলপাটি বিছিয়ে খোকাকে নিয়ে বিশ্রাম করতে এসেছেন ঘুম ঘুম চোখে খোকার মা। কিন্তু ঘুমোবার ইচ্ছা নেই খোকাবাবুর। বিদ্রোহী হয়ে তারস্বরে তিনি জুড়ে দিলেন এমন জোর কান্না, যে ঘুম ছুটে যায় পল্লীর এ বাড়ির ও বাড়ির সকলের চোখে, ছিঁড়ে যায় বনকপোতের শান্তিগান, তরুলতার কলতান, সচকিত হয়ে ওঠে নির্জন পথের তন্দ্রাস্তব্ধতা।

ঘুমপাড়ানি সঙ্গীতের তালে তালে খোকার মাথা আর গা চাপড়ে চলেন খোকার মা। সেই আদর মাখা নরম হাতের ছোঁয়ার খানিক পরে খোকাবাবুর চোখের পাতা জড়িয়ে এলো ঘুমের ঘোরে ধীরে ধীরে। অবশেষে মৌন হল ক্রন্দনভরা কণ্ঠস্বর।

পাড়া গেল জুড়িয়ে।

আচম্বিতে অগাধ স্তব্ধতার নিদ্রাভঙ্গ করে দিকে দিকে জেগে উঠল অত্যন্ত আতঙ্কিত জনতার গগনভেদী আর্ত চিৎকার।

পথে পথে, পাড়ায় পাড়ায় ভীত উচ্চরব শোনা গেল—'পালাও, পালাও! এলো রে ওই বর্গী এলো! সবাই পালাও বর্গী এলো!'

ধূলিপটলে দিগবিদিক অন্ধকার। উল্কাবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ধেয়ে আসে হাজার অশ্বারোহী—ঊর্ধ্বোত্থিত হস্তে তাদের শাণিত কৃপাণ, বিস্ফারিত চক্ষে নিষ্ঠুর হিংসা, কর্কশ কণ্ঠে ভৈরব হুঙ্কার!

বর্গী এলো দেশে—ঘরে ঘরে হানা দিতে, গৃহস্থের সর্বস্ব লুঠতে, গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বালাতে, পথে পথে রক্তস্রোত ছোটাতে, আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণ হরণ করতে!

পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে ধড়মড় করে উঠে বসল আবার ঘুমভাঙা খোকাখুকিরা। কিন্তু আর শোনা গেল না তাদের কান্না, বনকপোতের ঘুমপাড়ানি সুর এবং তরুতলার মর্মররাগিণী।

এমনই ব্যাপার হয়েছে বারংবার। তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল। বাংলার মাটিতে ইংরেজরা তখন শিকড় গাড়বার চেষ্টা করছে ছলে-বলে-কৌশলে।

দুই

'বর্গী' বলতে কি বোঝায়?

আভিধানিক অর্থানুসারে যার 'বর্গ' আছে সেই দল হল 'বর্গী'। 'বর্গে'র একটি অর্থ 'দল'। যারা দল বেঁধে আক্রমণ করত তাদেরই বর্গী বলে ডাকা হত।

ইতিহাসেও 'বর্গী' বলতে ঠিক ওই কথাই বুঝায় না। 'বর্গী' নাকি 'বারগীর' শব্দের অপভ্রংশ। মহারাষ্ট্রীয় ফৌজ যে সব উচ্চশ্রেণীর সওয়ার ছিল নিজেদের ঘোড়ার ও সাজপোশাকের অধিকারী, তাদের নাম 'সিলাদার'। কিন্তু 'বারগীর' বলতে বোঝায় সবচেয়ে নিম্নশ্রেণীর সওয়ারদের। তারা অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্বলাভ করত রাজসরকার থেকেই।

প্রাচীনকালে অনার্য হুনজাতীয় ঘোড়সওয়াররা দলে দলে পূর্ব ইউরোপে এবং উত্তর ভারতে প্রবেশ করে দিকে দিকে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে ইতিহাসে 'ভয়াল' নাম অর্জন করেছিল। বর্গীরাও সেই জাতীয় হানাদার; তবে তাদের অত্যাচার ততটা ব্যাপক হয়নি। 'বর্গীর হাঙ্গামা' হচ্ছে বিশেষভাবে বাংলাদেশেরই ব্যাপার।

সত্য কথা বললে বলতে হয়, পরবর্তীকালের বর্গীর হাঙ্গামার জন্যে এক হিসাবে দায়ী হচ্ছেন ভারতগৌরব ছত্রপতি শিবাজিই। প্রধানত লুণ্ঠনের দ্বারাই তিনি নিজের সৈন্যদল পোষণ করতেন। তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে সদলবলে লুণ্ঠনকার্য চালিয়েছেন দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানেই; তার ফলে কেবল মুসলমান নয়, কত সাধারণ নিরীহ হিন্দুও যে নির্যাতিত হয়েছিল, ইতিহাসে তার সাক্ষ্য আছে। তখনকার মারাঠিরাও জানত, লুণ্ঠনই হচ্ছে সৈনিকের অন্যতম কর্তব্য।

আরম্ভেই যেখানে নৈতিক আদর্শ এমন ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়, পরবর্তীকালে তা উন্নত না হয়ে অধিকতর অবনমিত হয়ে পড়বারই কথা। এক্ষেত্রেও হয়েছিল ঠিক তাই। শিবাজির কালের মারাঠি সৈনিকদের চেয়ে বর্গীরা হয়ে উঠেছিল আরও বেশি নিষ্ঠুর, হিংস্র ও দুরাচার।

কমবেশি এক শতাব্দীর মধ্যে মোগলদের শাসনকালে হতভাগ্য বাংলাদেশকে দু-দু'বার ভোগ করতে হয়েছিল ভয়াবহ নির্যাতন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফিরিঙ্গি ও মগ বোম্বেটেদের ধারাবাহিক অত্যাচারের ফলে নদীবহুল দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার কতক অংশ জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হয়েছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না। সুন্দরবন অঞ্চলে আগে ছিল সমৃদ্ধিশালী জনপদ, পরে তা পরিণত হয়েছিল হিংস্র জন্তুর

জঙ্গলাকীর্ণ বিচরণভূমিতে এবং পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও অঞ্চলে নাকি আকাশ দিয়ে পাখি পর্যন্ত উড়তে ভরসা করত না।

এমনই সব অরাজকতার জন্যে দায়ী কোনও কোনও লোককে ইতিহাস মনে করে রেখেছে। যেমন পর্তুগিজদের গঞ্জেলেস ও কর্ভোল্‌হো এবং মারাঠিদের ভাস্কর পণ্ডিত। শক্তির অপব্যবহার না করলে এঁদেরও স্মৃতি আজ গরীয়ান হয়ে থাকত।

পর্তুগিজ বোম্বেটেরা বিজাতীয় বিদেশি। তারা মানবতার ধর্ম ক্ষুণ্ণ করেছিল বটে, কিন্তু স্বজাতির উপরে অত্যাচার করেনি। আর মারাঠি হানাদার বা বর্গীরা ভারতের বাসিন্দা হয়েও ভারতবাসীকে অব্যাহতি দেয়নি, তাই তাদের অপরাধ হয়ে উঠেছে অধিকতর নিন্দনীয়।

তিন

তখন মারাঠিদের সর্বময় কর্তা ছিলেন ছত্রপতি শিবাজির পৌত্র ও উত্তরাধিকারী মহারাজা সাহু। কেবল নিজ মহারাষ্ট্রের নয়, মধ্য ভারতেও ছিল তাঁর রাজ্যের এক অংশ। তাঁর অধীনে ছিলেন দুইজন নায়ক—পেশোয়া (বা প্রধানমন্ত্রী) বালাজি রাও এবং নাগপুরের রাজা বা সামন্ত রঘুজি ভোঁসলে। তাঁরা পরস্পরকে দেখতেন চোখের বালির মতো। দু'জনেই দু'জনকে বাধা দেবার জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন।

শিবাজির সময়ে এমন ব্যাপার সম্ভবপর হত না; কারণ সর্বময় কর্তা বলতে ঠিক যা বোঝায়, শিবাজি ছিলেন তাই। অধীনস্থ নায়কদের চলতে ফিরতে হত একমাত্র তাঁরই অঙ্গুলিনির্দেশে। সে রকম ব্যক্তিত্ব বা শক্তি ছিল না মহারাজা সাহুর। অধীনস্থ নায়কদের স্বেচ্ছাচারিতা তিনি ইচ্ছা করলেও সব সময়ে দমন করতে পারতেন না। এই কথা মনে রাখলে পরবর্তী ঘটনাগুলির কারণ বোঝা কঠিন হবে না।

কবিবর ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন—'স্বপ্ন দেখি বর্গীরাজ হইল ক্রোধিত।'

তাঁর আর একটি উক্তি শুনলে সন্দেহ থাকে না যে, কাকে তিনি 'বর্গীরাজ' বলে বর্ণনা করেছেন। ভারতচন্দ্র বর্গীর হাঙ্গামার সমসাময়িক ব্যক্তি। তিনি বলেছেন—

'আছিল বর্গীর রাজা গড় সেতারায়।
আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়।।'

'সেতারা' বা সাতারার রাজা বলতে সাহুকেই বোঝায়। যদিও বর্গীরা 'চৌথ' আদায়ের নামে যে টাকা আদায় করত তার মধ্যে তাঁরও অংশ থাকত, তবু বর্গীর হাঙ্গামার সঙ্গে সাহুর যোগ ছিল প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে।

'চৌথ' হচ্ছে সাধারণত রাজস্বের চারভাগের এক ভাগ। মারাঠিদের দ্বারা ভয় দেখিয়ে বা হানা দিয়ে চৌথ বলে টাকা আদায়ের প্রথা শিবাজির আগেও প্রচলিত ছিল। তবে শিবাজির সময়ই এর প্রচলন হয় বেশি। কিন্তু তখনও তার মধ্যে যে যুক্তি ছিল, সাহুর সময়ে তা আর খাটত না। তখন তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যথেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র বা নিছক দস্যুতার সামিল।

চৌথের নিয়মানুসারে টাকা আদায় করবার কথা বৎসরে একবার মাত্র। কিন্তু বর্গীরা টাকা আদায় করতে আসত যখন তখন। হয়তো একদল বর্গীকে টাকা দিয়ে খুশি করে প্রজাদের মান ও প্রাণ বাঁচানো হল। কিন্তু অনতিবিলম্বে এসে হাজির নূতন আর একদল বর্গী। তারা আবার টাকা দাবি করে। সে দাবি মেটাতে না পারলেই সর্বনাশ। অমনি শুরু হয়ে যায় লুঠতরাজ ও খুনখারাপি—সে এক বিষম ডামাডোলের ব্যাপার।

সময়ে এবং অসময়ে অর্থাৎ প্রায় সব সময়েই বর্গীদের এই যুক্তিহীন ও অসম্ভব দাবি মেটাতে অবশেষে বাংলাদেশে নাভিশ্বাস ওঠবার উপক্রম। কি রাজার এবং কি প্রজার হাল ছাড়বার অবস্থা আর কি!

এই সব নচ্ছার ও পাষণ্ড হানাদারদের কবল থেকে বাঙালিরা মুক্তি পেলে কী উপায়ে, এইবারে আমরা সেই কাহিনীই বর্ণনা করব।

কিন্তু তার আগে আর একটা কথা বলে রাখা দরকার। আগেই বলা হয়েছে বর্গীর হাঙ্গামা বিশেষ করে বাংলাদেশেরই ব্যাপার। বাদশাহী আমলে এক একটি 'সুবা'র অন্তর্গত ছিল এক একজন সুবাদার বা শাসনকর্তার অধীনস্থ এক একটি প্রদেশ। বাংলার সঙ্গে তখন যুক্ত ছিল বিহার ও উড়িষ্যা দেশও এবং বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে এদের সুবাদার ছিলেন নবাব আলিবর্দী খাঁ। ইংরেজদের আমলেও প্রায় শেষ পর্যন্ত বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্তা ছিলেন একজন রাজপুরুষই।

প্রাচীন কালে—অর্থাৎ ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের আগেও দেখি, বাংলার সঙ্গে বিহার ও উড়িষ্যার কতকাংশ একই রাজ্য বলে গণ্য হয়েছে। বাঙালি মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক প্রভৃতি এমনি রাজ্যই শাসন করতেন। বাঙালির সঙ্গে বিহারি ও ওড়িয়ারা তখন নিজেদের একই রাজ্যের বাসিন্দা বলে আত্মপরিচয় দিত,—'বিহার কেবল বিহারিদের জন্যে' 'উড়িষ্যা কেবল ওড়িয়াদের জন্যে'—এ সব জিগির আওড়াবার চেষ্টা করত না। ইংরেজদের ষড়যন্ত্রেই এ দেশে এই শ্রেণীর সঙ্কীর্ণ জাতিবিদ্বেষের জন্ম হয়েছে।

বর্গী হানাদাররা পদার্পণ করেছিল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার যুক্ত রঙ্গমঞ্চেই। তবে এ কথা বলা চলে বটে, প্রধানত নিজ বাংলার উপরেই তাদের আক্রমণ হয়ে উঠেছিল অধিকতর জোরালো।

চার

শিবাজির আমল থেকেই মারাঠি সৈনিকরা লুণ্ঠনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, আগেই বলা হয়েছে এ কথা।

তখনকার কালে ভারতীয় হিন্দুদের পক্ষে এ সব হামলা ছিল তবু কতকটা সহনীয়। কারণ ধর্মদ্বেষী মুসলমানদের বহুযুগব্যাপী অত্যাচারের ফলে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত সমগ্র হিন্দুজাতি অত্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। শিবাজির অতুলনীয় প্রতিভাই সর্বপ্রথমে প্রতিষ্ঠিত করলে এমন বৃহৎ ও পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য, যার বিরুদ্ধে মহামোগল ও হিন্দুবিদ্বেষী সম্রাট ঔরংজেবেরও প্রাণপণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। প্রধানত মুসলমানদের কাহিল করার জন্যেই শিবাজি লুঠতরাজ চালিয়ে যেতেন মোগল সাম্রাজ্যের দিকে দিকে। সেই সূত্রে মোগল সম্রাটের হিন্দু

প্রজারাও হানাদারদের কবলে পড়ে অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হত বটে, তবে সে ব্যাপারটা সবাই খুব বড় করে দেখত বলে মনে হয় না।

কিন্তু যখন ভারতে মুসলমানরা ক্রমেই হীনবল হয়ে পড়েছে এবং প্রায় সর্বত্রই বিস্তৃত হয়ে পড়েছে মারাঠিদের প্রভুত্ব, তখনও বর্গী হানাদাররা তাদের স্বধর্মাবলম্বী নাগরিক ও গ্রামীণদের উপরে চালিয়ে যেতে লাগল অসহনীয় ও অবর্ণনীয় অত্যাচার এবং তার মধ্যে কিছুমাত্র উচ্চাদর্শের পরিবর্তে ছিল কেবল নির্বিচারে যেন তেন প্রকারে নিছক দস্যুতার দ্বারা লাভবান হবার দুশ্চেষ্টা। যেখান দিয়ে বর্গী হানাদাররা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায়, সেখানেই পিছনে পড়ে থাকে কেবল সর্ববিষয়ে রিক্ত ধু ধু করা হাহাকার ভরা মহাশ্মশান। এতটা বাড়াবাড়ি বরদাস্ত করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠল এবং বাংলার সঙ্গে বিহার ও উড়িষ্যাও পরিত্রাহি ডাক ছাড়তে লাগল।

এক হিসেবে হুন আটিলা ও গ্রীক আলেকজাণ্ডার উভয়কেই দস্যু বলে মনে করা চলে। কারণ তাঁরা দু'জনেই স্বদেশ ছেড়ে বেরিয়ে পরের দেশে গিয়ে হানা দিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে আলেকজাণ্ডার বরেণ্য ও আটিলা ঘৃণ্য হয়ে আছেন। তার কারণ একজনের সামনে ছিল মহান আদর্শ, আর একজন করতে চেয়েছিলেন শুধু নরহত্যা ও পরস্বাপহরণ। বর্গীদের দলপতিরা ছিল শেষোক্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব।

সেটা হচ্ছে ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দের কথা। পাঠানদের দমন করবার জন্যে নবাব আলিবর্দী খাঁ গিয়েছিলেন উড়িষ্যায়। জয়ী হয়ে ফেরবার মুখে মেদিনীপুরের কাছে এসে তিনি খবর পেলেন, মারাঠি সৈন্যেরা অসৎ উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে বাংলার দিকে।

তার কিছুদিন পরে শোনা গেল, মারাঠিরা দেখা দিয়েছে বাংলার ভিতরে, বর্ধমান জেলায়। চারিদিকে তারা লুঠপাট, অত্যাচার ও রক্তপাত করে বেড়াচ্ছে।

দুঃসংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আলিবর্দী বর্ধমানের দিকে রওনা হতে বিলম্ব করলেন না। কিন্তু তিনি বোধহয় মারাঠিদের সংখ্যা আন্দাজ করতে কিংবা তাড়াতাড়ির জন্যে উচিতমতো সৈন্য সঙ্গে আনতে পারেননি—কারণ তাঁর ফৌজে ছিল মাত্র তিন হাজার অশ্বারোহী ও এক হাজার পদাতিক।

তাঁকে রীতিমতো বিপদে পড়তে হল। সংখ্যায় মারাঠিরা ছিল অগণ্য। তারা পিলপিল করে চারিদিক থেকে এসে তাঁকে একেবারে ঘিরে ফেললে। সম্মুখ যুদ্ধে তাদের পরাস্ত করা অসম্ভব দেখে আলিবর্দী বর্ধমানেই ছাউনি ফেলতে বাধ্য হলেন।

মারাঠিদের নায়কের নাম ছিল ভাস্কর পণ্ডিত। নাগপুরের রাজা রঘুজি ভোঁসলের সেনাপতি। নিজের ফৌজকে তিনি দুই অংশে বিভক্ত করলেন। এক অংশ আলিবর্দীকে বেষ্টন করে পাহারা দিতে লাগল আর একদল ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে এবং চল্লিশ মাইলব্যাপী জায়গা জুড়ে আরম্ভ করলে লুটতরাজ, হত্যাকাণ্ড ও অকথ্য অত্যাচার।

ভাস্কর পণ্ডিতের দলবল এমন ভাবে আটঘাট বেঁধে বসে রইল যে, কোনদিক থেকেই নবাবি ফৌজের ছাউনির ভিতরে আর রসদ আমদানি করবার উপায় রইল না। শিবিরের মধ্যে কেবল সেপাইরা নয়, সেই সঙ্গে হাজার হাজার অনুচর এবং নবাবের পরিবারবর্গও বন্দী হয়েছিল, আহার্যের অভাবে সকলের অবস্থাই হয়ে উঠল দুর্ভিক্ষপীড়িতের মতো।

অবশেষে আলিবর্দী মরিয়া হয়ে মারাঠিদের সেই চক্রব্যূহ ভেদ করে সদলবলে কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁকে বেশিদূর যেতে হল না, আশপাশ থেকে আচম্বিতে মারাঠিরা হুড়মুড় করে এসে পড়ে চিলের মতো ছোঁ মেরে নবাবি ফৌজের মোটঘাট ও তাঁবুগুলো কেড়ে নিয়ে কোথায় সরে পড়ল। আলিবর্দী তাঁর পক্ষের সকলকে নিয়ে খোলা আকাশের তলায় অনাহারে কর্দমাক্ত ধানক্ষেতের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে রইলেন। সে এক বিষম না যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা—তিনি না পারেন এগুতে না পারেন পেছুতে।

কেটে গেল একদিন ও দুই রাত্রি দুঃস্বপ্নের ভিতর দিয়ে।

উদরে নেই অন্ন, মাথার উপরে নেই আচ্ছাদন। হয় মৃত্যু নয় মুক্তি! দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করে আলিবর্দীর সাহসী আফগান অশ্বারোহীর দল সবেগে ও সতেজে ঝাঁপিয়ে পড়ল মারাঠিদের উপরে এবং সে প্রবল আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে শত্রুরা পিছু হটে যেতে বাধ্য হল।

নবাবি ফৌজ অগ্রসর হল কিছুদূর পর্যন্ত। তারপর শত্রুরা ফিরে-ফিরতি প্রতিআক্রমণ শুরু করলে কাটোয়ার অনতিদূরে। সেখানে একটা লড়াই হল, কিন্তু শত্রুরা নবাবের গতিরোধ করতে পারলে না, নিজের অনশনক্লিষ্ট সৈন্যদল নিয়ে তিনি কাটোয়ার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

নবাবি শিকার হাতছাড়া হল বটে, কিন্তু মারাঠিরা বাংলার মাটি ছাড়বার নাম মুখে আনলে না। রক্তের স্বাদ পেলে বাঘের হিংসা যেমন বেড়ে ওঠে, অতি সহজে অতিরিক্ত ঐশ্বর্যলাভের আশায় ভাস্কর পণ্ডিতের লোভও আরও মাত্রা ছাড়িয়ে উঠল, অবাধে লুঠপাট করার জন্যে লেলিয়ে দিলেন নিজের পাপসঙ্গীদের।

পাঁচ

আলিবর্দী তখনও পর্যন্ত রাজধানী মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করতে পারেননি।

সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন সুচতুর ভাস্কর পণ্ডিত। সাতশত বাছা বাছা অশ্বারোহী নিয়ে চল্লিশ মাইল পথ পার হয়ে তিনি অরক্ষিত মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে এসে পড়লেন।

চারিদিকে হুলুস্থুল! বাড়িতে নয়, গ্রামে নয়, নিজ রাজধানীর উপরে ডাকাতের হানা! কে কবে শুনেছে এমন আজব কথা? যারা পারলে, জোরে পা চালিয়ে গেল পালিয়ে। যারা পারলে না ভয়ে মুখ শুকিয়ে জপতে লাগল ইষ্টনাম।

শহরতলি থেকে শহরের ভিতরে—এ আর আসতে কতক্ষণ! বর্গীরা হই হই করে মুর্শিদাবাদের মধ্যে এসে পড়ল—ঘরে ঘরে চলল লুঠতরাজের ধুম, বিশেষত ধনীদের প্রাসাদে প্রাসাদে হিন্দু এবং মুসলমান কেউ পেলে না নিস্তার।

এক জগৎশেঠকেই গুণে গুণে দিতে হল নগদ তিন লক্ষ টাকা! সে যুগের তিন লাখ টাকার দাম ছিল এ যুগের চেয়ে অনেকগুণ বেশি।

বর্গীদের বাধা দেয় শহরে ছিল না এমন রক্ষী। তারা মনের সাধে অবাধে গোটা দিন ধরে নিজেদের ট্যাঁক ভারি করতে লাগল—সকলে ভেবে নিলে, আর রক্ষা নেই, এইবার বুঝি সর্বনাশ হয়।

এমন সময়ে কাটোয়ার পথ থেকে দলবল নিয়ে স্বয়ং আলিবর্দী এসে পড়লেন হস্তদন্তের মতো।

বর্গীরাও যথাসময়ে সরে পড়তে দেরি করলে না, সোজা গিয়ে হাজির হল কাটোয়ায় এবং আশ মিটিয়ে নিঃশেষে মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন করতে পারলে না বলে আক্রোশে যাবার পথে দুই পাশের গ্রামের পর গ্রামে আগুন লাগিয়ে যেতে লাগল। চিহ্নিত হয়ে রইল তাদের সমগ্র যাত্রাপথ উত্তপ্ত ভস্মস্তূপে।

কাটোয়া হল বর্গীদের প্রধান আস্তানা। সেখান থেকে হুগলি এবং তারপর তারা দখল করলে আরও গ্রাম ও নগর। রাজমহল থেকে মেদিনীপুর ও জলেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমি তারা অধিকার করে বসল। গঙ্গার পশ্চিম দিক থেকে বিলুপ্ত হল নবাবের প্রভুত্ব—এমনকি জমিদাররা পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তাদের রাজস্ব দিতে লাগল এবং তাদের বশ্যতা স্বীকার করলে ফিরিঙ্গি বণিকরাও।

গঙ্গার পূর্বদিকের ভূভাগ আলিবর্দীর হস্তচ্যুত হল না বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে সে অঞ্চলেও বর্গীরা হানা দিতে ছাড়লে না। তাদের উৎপাতের ভয়ে ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা গঙ্গার পশ্চিম দিক ছেড়ে পালিয়ে এলো।

বাংলাদেশ লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল বললেই চলে। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হবার উপক্রম; বাজারে শস্যের অভাব, জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য; শ্রমিকদের মজুরি বেড়ে উঠল; যারা তুঁতের আবাদ করে তারা পালিয়ে গেল—কারণ বর্গীরা তুঁতগাছের পাতা ঘোড়াদের খোরাকে পরিণত করলে, যা ছিল গুটিপোকাদের প্রধান খাদ্য : ফলে আর রেশম প্রস্তুত হত না—এমনকি যারা রেশমী কাপড় বুনত তারাও হল দেশছাড়া এবং রেশমের কারবারও হল স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা থেকে কিছু কিছু তুলে দিলে আসল অবস্থা উপলব্ধি করা সহজ হবে।

একজন বলছেন, 'আপন আপন সম্পত্তি নিয়ে সকলেই পলায়ন করতে লাগল। আচম্বিতে বর্গীরা এসে তাদের চারিধার থেকে ঘিরে ফেললে। আর সব কিছু ছেড়ে তারা কেড়ে নিতে লাগল কেবল সোনা আর রূপা। তারা অনেকের হাত, অনেকের নাক ও কান কেটে নিলে এবং অনেককে মেরে ফেললে একেবারেই। স্ত্রীলোকদেরও উপরে অত্যাচার করতে বাকি রাখলে না। আগে বাইরের লুঠপাট সেরে তারা গ্রামের ভিতর ঢুকে পড়ত এবং আগুন লাগিয়ে দিত ঘরে ঘরে। দিকে দিকে হানা দিয়ে তারা অশ্রান্ত স্বরে চিৎকার করত—আমাদের টাকা দাও, আমাদের টাকা দাও, আমাদের টাকা দাও! যারা টাকা দিতে পারত না, তাদের নাকের ভিতর তারা সুড়সুড় করে জল ঢেলে দিত কিংবা পুকুরে ডুবিয়ে মেরে ফেলত। লোকে নিরাপদ হতে পারত কেবল ভাগীরথীর পরপারে গিয়ে।

প্রাচীন কবি গঙ্গারাম তাঁর রচিত 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' কাব্যে বর্গীর হাঙ্গামার চিত্র দিয়েছেন :

এই মতে সব লোক পলাইয়া যাইতে।
আচম্বিত বরগি ঘেরিলা আইসে সাথে।।
মাঠে ঘেরিয়া বরগি দেয় তবে সাড়া।
সোনা, রূপা লুঠে নেয় আর সব ছাড়া
কারু হাত কাটে কারু কাটে কান।
একই চোটে কারু বধয়ে পরান।।

বর্ধমানের মহাসভার সভাপণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বলছেন : সাহু রাজার সেপাইরা নৃশংস; গর্ভবতী নারী, শিশু, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রের হত্যাকারী, বন্যপ্রকৃতি। তাবৎ লোকের উপরে দস্যুতা করতে দক্ষ এবং যে কোনও পাপ কাজ করতে সক্ষম। তাদের প্রধান শক্তির কারণ, আশ্চর্যরূপে দ্রুতগতি অশ্ব। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখলেই তারা ঘোড়ায় চড়ে অন্য কোথাও চম্পট দেয়।

বর্গীদের চারিত্রিক বিশেষত্ব বোঝা গেল: তারা দস্যু, তারা নির্মম, তারা কাপুরুষ। মহারাষ্ট্রের বিশেষ গৌরবের যুগেও একাধিকবার মারাঠি চরিত্রের এই সব লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। দিল্লীর মুসলমানরাও এই জন্যে তাদের দারুণ ঘৃণা করত।

বর্ষা এলো বাংলায়, ঘাট-মাঠ-বাট জলে জলে জলময়, অচল পথ-চলাচল। বর্গীদেরও দায়ে পড়ে অলস হয়ে থাকতে হল।

আলিবর্দী রাজধানীর বাইরে এসে প্রচুর সৈন্যদল সংগ্রহ করে প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

ভাস্কর পণ্ডিতও তলে তলে তৈরি হবার চেষ্টা করলেন। আরও বেশি ফৌজ পাঠাবার জন্যে আবেদন জানালেন নাগপুরের রাজা রঘুজির কাছে। কিন্তু তাঁর আবেদন মঞ্জুর হল না। হয়তো সৈন্যাভাব।

আলিবর্দী ছিলেন অভিজ্ঞ সেনাপতি। তিনি বেশ বুঝলেন, নদী নালায় জল শুকিয়ে গেলে বর্গীদের বেগবান ঘোড়াগুলো আবার কর্মক্ষম হয়ে উঠবে। এই হচ্ছে তাদের কাবু করবার মাহেন্দ্রক্ষণ!

দুর্জন হলে কী হয়, ভাস্করের ভক্তির অভাব নেই। জমিদারদের কাছ থেকে জোর করে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আদায় করে তিনি মহাসমারোহে দুর্গাপূজার আয়োজন করলেন কাটোয়া শহরে।

নবমীর রাত্রি। পূজা ও আমোদ-প্রমোদের পরে খাওয়া-দাওয়া সেরে আনন্দশ্রান্ত মারাঠিরা অচেতন হয়ে পড়ল গভীর নিদ্রায়।

কিন্তু আলিবর্দী ও তাঁর বাছা বাছা সৈনিকের চোখে নেই নিদ্রা। গোপনে গঙ্গা ও অজয় নদী পার হয়ে আলিবর্দী সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ঘুমন্ত দস্যুদের উপরে।

বেশি কিছু করতে হল না এবং লোকক্ষয়ও হল না বেশি। সবদিক দিয়েই সফল হল এই অভাবিত আক্রমণ।

প্রায় বিনা যুদ্ধেই বিষম আতঙ্কে পাগলের মতো বর্গীরা পলায়ন করলে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে। তাদের সমস্ত রসদ, তাঁবু ও মোটঘাট হল আক্রমণকারীদের হস্তগত।

ফৌজ নিয়ে বাংলা ছেড়ে পালাতে পালাতে ও লুঠপাট করতে করতে ভাস্কর পণ্ডিত কটক শহরে গিয়ে আবার এক আড্ডা গাড়বার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু আলিবর্দী তাঁর পিছনে লেগে রইলেন চিনে জোঁকের মতো—তাঁকে আর হাঁপ ছাড়বার বা নূতন শক্তি সঞ্চয় করবার অবসর দিলেন না। ভাস্করকে কটক থেকেও তাড়িয়ে একেবারে চিল্কা পার করে দিয়ে অবশেষে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন নবাব আলিবর্দী খাঁ। তারপর বিজয়ী বীরের মতো ফিরে এলেন নিজের রাজধানীতে। এ হল ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা।

ছয়

ভাস্কর পণ্ডিত তখনকার মতো বিতাড়িত হলেও বাংলাদেশ থেকে বর্গীদের আড্ডা উঠে যায়নি।

কারণ কিছু দিন যেতে না যেতেই দেখি, তাঁর মুরুব্বি রঘুজি ভোঁসলেকে নিয়ে ভাস্কর পণ্ডিত আবার হাজির হয়েছেন কাটোয়া শহরে, তাঁরা নাকি সাহু রাজার হুকুমে বাংলার চৌথ আদায় করতে এসেছেন।

রাজা রঘুজির মস্ত শত্রু মারাঠিদের প্রথম পেশোয়া বালাজি রাও। তিনি দলে দলে সৈন্য নিয়ে বিহারে এসে উপস্থিত হলেন। দিল্লীর বাদশাহ্ মহম্মদ শাহের অনুরোধে রঘুজিকে তিনি বাংলা থেকে তাড়িয়ে দিতে এসেছেন।

কিন্তু সব শিয়ালের এক রা! বালাজিও লক্ষ্মীছেলে নন, কারণ তিনিও এলেন দিকে দিকে হাহাকার তুলে লুটপাট করতে করতে। সাঁওতাল পরগনার বনজঙ্গল ভেদ করে তিনি এসে পড়লেন বীরভূমে, তারপর ধরলেন মুর্শিদাবাদের পথ।

বহরমপুরের কাছে গিয়ে আলিবর্দী দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। পরামর্শের পর স্থির হল, নবাবের কাছ থেকে বালাজি বাইশ লক্ষ টাকা চৌথ পাবেন এবং তার বিনিময়ে তিনি করবেন বাংলা থেকে রঘুজিকে তাড়াবার ব্যবস্থা।

সেই খবর পেয়েই রঘুজি কাটোয়া থেকে চম্পট দিলেন চটপট। বালাজিও তাঁর পিছনে পিছনে ছুটতে কসুর করলেন না। এক জায়গায় দুই দলে বেধে গেল মারামারি। সেই ঘরোয়া লড়াইয়ে হেরে এবং অনেক লোক ও মালপত্র খুইয়ে রঘুজি ও ভাস্কর পণ্ডিত লম্বা দিলেন উড়িষ্যার দিকে। কর্তব্যপালনের জন্যে যথেষ্ট ছুটোছুটি করা হয়েছে ভেবে বালাজিও ফিরে গেলেন পুণার দিকে।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশ করলে প্রায় নয়মাসব্যাপী শান্তিভোগ। কিন্তু বাংলা ও বিহারের বাসিন্দারা নিশ্চিন্ত হয়েছিল না,—বর্গীদের বিশ্বাস কী? কলকাতাবাসী ব্যবসায়ীরা পঁচিশ হাজার টাকা তুলে শহরের অরক্ষিত অংশে এক খাল খুঁড়ে ফেললে, সেই খালই 'মাহাট্টা ডিচ' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। বিহারীরাও পাঁচিল তুলে দিলে পাটনা শহরের চারিদিকে।

ইতিপূর্বে বর্গীরা দুই-দুইবার বাংলা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেও শেষ পর্যন্ত লুঠের মাল নিয়ে সরে পড়তে পারেনি। সেইজন্যে ভাস্কর পণ্ডিতের আফসোসের আর অন্ত ছিল না। এখন বালাজির অন্তর্ধানের পর পথ সাফ দেখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সংহারমূর্তি ধারণ করে উড়িষ্যা থেকে আবার ধেয়ে এলেন বাংলার দিকে। চতুর্দিকে আবার উঠল সর্বহারাদের হাহাকার, গ্রামে দেখা গেল দাউ দাউ দাউ লেলিহান অগ্নিশিখা, পথে পথে ছড়িয়ে রইল অসহায়দের খণ্ডবিখণ্ড মৃতদেহ। বর্গী এলো—আবার বর্গী এলো দেশে।

আলিবর্দী দস্তুরমতো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বালাজিকে রঘুজির পিছনে লাগিয়ে তিনি অবলম্বন করেছিলেন সেই বহু পরীক্ষিত পুরাতন কৌশল—অর্থাৎ যাকে বলে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। কিন্তু ব্যর্থ হল সে কৌশল—আবার বর্গী এলো দেশে।

এখন উপায়? হতভম্ব রাবণ নাকি বলেছিলেন, 'মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী।' আজ আলিবর্দীরও সেই অবস্থা—বর্গীরা যেন রক্তবীজের ঝাড়! এই অমঙ্গুলে ঝাড়কে উৎপাটন করতে হলে ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান ভুলে অন্য উপায় আবিষ্কার না করলে চলবে না। রাজকোষ অর্থশূন্য; বারংবার যুদ্ধযাত্রায় সৈন্যেরা পরিশ্রান্ত; যুদ্ধে আলিবর্দীরও শরীর অপটু। এই সব বুঝে বর্গীদের জন্যে মোক্ষম দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করবার জন্যে তিনি এক গুপ্ত পরামর্শসভার আয়োজন করলেন।

ভাস্কর পণ্ডিতের কাছে গেল আলিবর্দীর সাদর আমন্ত্রণ; নবাব আর যুদ্ধ করতে নারাজ এবং অক্ষম। তিনি এখন আপোসে মিটমাট করে শান্তি স্থাপন করতে ইচ্ছুক। ভাস্কর পণ্ডিত যদি অনুগ্রহ করে নবাব শিবিরে পদার্পণ করে, তাহলে সমস্ত গোলযোগ খুব সহজেই বন্ধুভাবে চুকে যেতে পারে।

ভাস্কর নিশ্চয়ই মনে করেছিলেন, বালাজির মতো তিনিও আলিবর্দীর কাছে নির্বিবাদে বহু লক্ষ টাকা হাতিয়ে বাজিমাত করতে পারবেন। কাজেই কিছুমাত্র সন্দেহ না করেই মাত্র একুশজন সঙ্গী সেনানি নিয়ে হাসতে হাসতে তিনি পদার্পণ করলেন নবাবের শিবিরে। সেদিনের তারিখ হচ্ছে ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে মার্চ।

ভাস্কর পণ্ডিত এবং বিশজন সেনানি আর বর্গীদের আস্তানায় প্রত্যাগমন করতে পারেননি। শিবিরের আনাচে-কানাচে গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছিল দলে দলে হত্যাকারী। সহসা আবির্ভূত হয়ে তারা বর্গীদের টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললে। মাত্র একজন সেনানি সেই মারাত্মক খবর নিয়ে নিজেদের আস্তানায় ফিরে এলো ভগ্নদূতের মতো।

ব্যস, এক কিস্তিতেই বাজিমাত! সেনাপতি ও অন্যান্য দলপতিদের নিধনসংবাদ শুনেই বর্গী পঙ্গপালরা মহাভয়ে সমগ্র বঙ্গ ও উড়িষ্যা দেশ ত্যাগ করে পলায়ন করলে।

সাত

কিন্তু বর্গী এলো, আবার বর্গী এলো দেশে। এই নিয়ে চারবার এবং শেষবার।

সেনাধ্যক্ষ ভাস্করের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে এবার সসৈন্য আসছেন স্বয়ং নাগপুরের রাজা রঘুজি ভোঁসলে। গত পনের মাস ধরে তোড়জোড় ও সাজসজ্জা করে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে তিনি কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন।

বর্গীদের কাছে বাংলা দেশ হয়ে উঠেছিল যেন কামধেনুর মতো। দোহন করলেই দুগ্ধ!

রঘুজি আগে উড়িষ্যা হস্তগত করে বাংলার নানা জেলায় নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করতে করতে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

আলিবর্দী বুঝলেন, এবার আর মুখের কথায় চিড়ে ভিজবে না। অতঃপর লড়াই ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু পনের মাস সময় পেয়ে তিনিও যুদ্ধের জন্যে রীতিমতো প্রস্তুত হয়ে উঠেছিলেন।

প্রথমে দুই পক্ষে হল একটা ছোটখাট ঠোকাঠুকি। রঘুজি পিছিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর বিষদাঁত ভাঙল না। তারপর তিনি দশ হাজার বর্গী ঘোড়সওয়ার ও চার হাজার আফগান সৈনিক নিয়ে মুর্শিদাবাদের কাছে এসে পড়লেন। সেখানে নবাবি সৈন্যদের প্রস্তুত দেখে পশ্চাদপদ হয়ে ছাউনি ফেললেন কাটোয়া নগরে গিয়ে।

কাটোয়ার পশ্চিমে রানী দিঘির কাছে আলিবর্দীর সঙ্গে রঘুজির চরম শক্তিপরীক্ষা হয়। এক তুমুল যুদ্ধের পর বর্গীরা যুদ্ধক্ষেত্রে বহু হতাহতকে ফেলে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে! ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দের কথা।

শেষ পর্যন্ত আলিবর্দী বর্গীদের বাংলা দেশের সীমান্তের বাইরে তাড়িয়ে না দিয়ে নিশ্চিন্ত হননি।

বর্গীরা শিকড় গেড়ে বসে উড়িষ্যায়। তারপরেও কয়েক বৎসর ধরে নবাবি ফৌজের সঙ্গে তাদের ঘাত-প্রতিঘাত হয় বটে, কিন্তু খাস বাংলার উপরে আর তারা চড়াও হয়ে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসেনি।

না আসবার কারণও ছিল। ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে বর্গীদের সঙ্গে আলিবর্দীর যে সন্ধি হয় তার একটা শর্ত এই :

বাংলার নবাব রাজা রঘুজিকে বাৎসরিক বার লক্ষ টাকা চৌথ প্রদান করবেন।

বাংলাদেশে বোম্বেটেরাজ

এক

চলতি বাংলায় জলদস্যুকে বলা হয়, বোম্বেটে। ইংরেজিতে বলে Pirate—ও শব্দটি এসেছে গ্রিক ভাষা থেকে। বাংলা 'বোম্বেটে' কথাটির উৎপত্তি পর্তুগিজ শব্দ থেকে, তার কারণ একসময়ে পর্তুগিজ জলদস্যুদের বিষম অত্যাচারে বাংলাদেশের অনেক জায়গাই প্রায় জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। বোম্বেটে বলতে লোকে বুঝত তখন প্রধানত পর্তুগিজদেরই।

Pirate শব্দটির উৎপত্তি যখন প্রাচীন গ্রিক ভাষা থেকে, তখন বুঝতে হবে যে খ্রিস্টপূর্ব যুগেও গ্রিকদেশের জলপথে ছিল বোম্বেটেদের উৎপাত। কেবল গ্রিস কেন, রোম, মিশর, ভারতবর্ষ ও চীন প্রভৃতি প্রত্যেক প্রাচীন দেশকেই স্মরণাতীত কাল থেকে জলদস্যুদের মারাত্মক উপদ্রবের জন্যে বর্ণনাতীত যন্ত্রণাভোগ করতে হয়েছে।

এক শ্রেণীর ডানপিটে লোক দুঃসাহসিক কাজ করে আনন্দ পায়। তার উপর থাকে যদি প্রচুর অর্থলোভের প্রলোভন, তাহলে তো আর কথাই নেই। অনেক তথাকথিত সাধুও তখন আর শয়তান হয়ে উঠতে লজ্জা পায় না। আর এ কথাও সকলেই জানে যে মনুষ্যসমাজে শয়তানের দলই প্রবল।

স্থলপথে সতর্ক পাহারা। সশস্ত্র সৈনিক, জাগ্রত জনতা, পদে পদে আইনের বাধা। চম্পট দেবার আগেই চটপট ধরা পড়বার সম্ভাবনা।

জলপথেও আইনবিরুদ্ধ কাজ করে ধরা পড়লে শাস্তি পেতে হয়। কিন্তু আগেকার যুগে স্থলপথের মতো জলপথেও উচিতমতো পাহারা দেবার ব্যবস্থা ছিল না। বিশেষত অসীম সাগরে। জলদস্যুরা লুঠপাট করে কোথায় ডুব মারত, তাদের গ্রেপ্তার করবার আশা ছিল সুদূরপরাহত। বারবার দেখা গেছে, ভারত সাগরে বোম্বেটেদের অত্যাচার হয়ে উঠেছে মারাত্মকরূপে ভয়াবহ, অথচ "সর্বশক্তিমান" উপাধিধারী দিল্লীর বাদশাহ তাদের নাগাল ধরতে পারছেন না। এই সব কারণে বোম্বেটেদের প্রাধান্য ছিল বিশেষ করে সেকালেই।

এ কালেও বোম্বেটে হতে চায় এমন দুরাত্মার অভাব নেই। কিন্তু স্থলে সৈন্যবাহিনীর মতো জলে রাজার নৌবাহিনীও এতটা প্রবল হয়ে উঠেছে যে, বোম্বেটেগিরি আর নিরাপদ ও লাভজনক নয়। বোম্বেটেরা আর সশস্ত্র ও দ্রুতগামী জাহাজের অধিকারী হতে পারে না এবং

প্রত্যেক দেশে থাকে ওই শ্রেণীর শত শত সরকারি জাহাজ। আজকাল তাই সহজেই দমন করা যায় জলদস্যুতা। একমাত্র চীন সমুদ্র ছাড়া আর কোথাও আজ জলদস্যুতার কথা শোনা যায় না।

কিন্তু যে জলপথে হানা দিতে চায়, রণতরীর অধিকারী হলে সে যে কি সাংঘাতিক হুলুস্থুলু বাধিয়ে দিতে পারে, গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে "এমডেন" জাহাজের জার্মান ক্যাপ্তেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ রেখে গিয়েছেন। দিনের পর দিন দীর্ঘকাল ধরে এমডেন বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল দিকে দিকে, কিন্তু সমগ্র ভারতসাগরে দিশেহারার মতো ছুটোছুটি করেও তার পাত্তা পায়নি ইংরেজদের দুর্ধর্ষ যুদ্ধজাহাজগুলো।

জলদস্যুতা বেআইনি হলেও তার সঙ্গে আছে রোমান্সের সম্পর্ক। দেশ-বিদেশের সমুদ্রে ও নদনদীতে অর্থ আর রক্তলোভী সেই বেপরোয়া মানুষদের রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়তে ভালবাসে ছেলেবুড়ো সকলেই। তাদের কথা নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য গল্প ও শত শত উপন্যাস এবং তাদের চাহিদা আছে সমগ্র পৃথিবীতে। তবে কেবল হানাহানি, রক্তারক্তি ও লুঠতরাজের জন্যে নয়, সে সব কাহিনী অধিকতর চিত্তোত্তেজক হয়ে ওঠে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে যখন নায়ক রূপে দেখা দেয় এক একজন সাধু ব্যক্তি।

কিন্তু আজ আমি তোমাদের কাছে যে সব দুষ্ট লোকের কথা বলতে বসেছি, তারা কল্পিত গল্প উপন্যাসের কেউ নয়, রক্তমাংসের দেহ নিয়ে বিদ্যমান ছিল তারা সত্যিকার পৃথিবীতেই। জাতে তারা হচ্ছে মগ বা আরাকানি ও ফিরিঙ্গি বা পর্তুগিজ। তাদের পেশা ছিল বাংলাদেশের নদীতে নদীতে জলদস্যুতা করা! সে সব হচ্ছে প্রধানত সপ্তদশ শতাব্দীর ব্যাপার।

আরও কয়েক বৎসর পিছিয়ে গেলে আমরা উপলব্ধি করতে পারব আর একটি পরম সত্য।

ভারতের মাটিতে মুসলমানরা প্রথম শিকড় গাড়বার সুযোগ পেয়েছিল কেন?

উত্তরে ইতিহাস বলবে, বোম্বেটেদের জন্যেই।

পশ্চিম এশিয়ার কতক অংশ তখন আরবদের করতলগত। মুসলমানদের ধর্মনেতা ও নরপতি বা খলিফার অধীনে হাজাজ ছিলেন ইরাকের শাসনকর্তা।

সিংহলের রাজা ওই খলিফা ও হাজাজের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন বহুমূল্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ নয়খানা জাহাজ।

জাহাজগুলো অগ্রসর হচ্ছিল সিন্ধুদেশের নিকটস্থ সাগরপথ দিয়ে। আচম্বিতে একদল জলদস্যু (খুব সম্ভব তারা ভারতীয়) সেই সব জাহাজ লুণ্ঠন করে সরে পড়ল।

সিন্ধুদেশের রাজা তখন দাহীর। মূল্যবান সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে হাজাজ দূত পাঠিয়ে দাহীরকে বললেন, "এর জন্যে ক্ষতিপূরণ করতে ও দস্যুদের শাস্তি দিতে হবে আপনাকেই।"

দাহীর বললেন, "সে কি কথা? দস্যুরা তো আমার হাতধরা নয়, আমি তাদের শাস্তি দেব কেমন করে?"

এ যুক্তি হল না হাজাজের মনের মতো। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি দাহীরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন সৈন্যদল এবং প্রথম যুদ্ধে হেরে ও দ্বিতীয় যুদ্ধে জিতে হাজাজ সিন্ধুদেশ অধিকার করলেন।

সেই হল ভারতে মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাত। সেটা হচ্ছে ৭১২ খ্রিস্টাব্দের কথা।

দুই

বাংলাদেশে বোম্বেটেরা যখন দস্তুরমতো পসার জমিয়ে তুলেছে সেই সময়ে ইউরোপে ও আমেরিকাতেও সকলকে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে মারছিল জলদস্যুরা। আগে সংক্ষেপে তাদেরও কিছু কিছু পরিচয় দিয়ে রাখি, কারণ ওই ফিরিঙ্গি বোম্বেটেদেরই একদল হয়েছিল ভারতীয় জলপথের পথিক।

আগেই বলেছি, গ্রিক ও রোমানদের সময়েও ইউরোপে জলদস্যুর অভাব ছিল না। বিশ্ববিখ্যাত দিগ্বিজয়ী জুলিয়াস সিজারকেও একবার জলদস্যুর কবলে পড়ে বিস্তর নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল।

রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর উত্তর আফ্রিকার মুসলমান জলদস্যুরা ভূমধ্যসাগরে অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। পনের শতাব্দীর শেষভাগে স্পেন থেকে বিতাড়িত হয়ে মুসলমানরা উত্তর আফ্রিকার মরক্কো প্রভৃতি প্রদেশে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তারপর তাদের অনেকে জলদস্যুর পেশা নিয়ে ইউরোপীয়দের উপরে অবাধ অত্যাচার চালাতে থাকে। তাদের বিপুল প্রতাপে সারা ইউরোপ হত থরথরি কম্পমান। তারা কেবল সমুদ্রযাত্রীদের সর্বস্ব কেড়ে নিত না মানুষদেরও ধরে নিয়ে গিয়ে গোলাম করে রাখত—এইভাবে হাজার হাজার ইউরোপীয়কে চিরজীবনের জন্য বন্দী হয়ে থাকতে হত। তারা ক্রমে ক্রমে এমন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, সমগ্র ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য একেবারে পারেনি। খৈর এদ-দিন, দ্রাগুত্ ও আলি বাসা প্রভৃতি বোম্বেটের নাম শুনেই তখনকার ইউরোপীয় বণিকদের পেটের পিলে চমকে উঠত। একদিকে দিয়ে বাংলাদেশের ফিরিঙ্গি বোম্বেটেরাও ছিল তাদের সুযোগ্য ছাত্র। সে কথা বলব যথাসময়ে।

ভূমধ্যসাগরে মুসলমান বা মুর জাতীয় বোম্বেটেরা আর সকলের উপরে টেক্কা মেরেছিল বটে, কিন্তু তা বলে মনে কোরো না যে, নানাদেশীয় ইউরোপীয় জলডাকাতরা হাত গুটিয়ে চুপ করে বসেছিল নিতান্ত ভালমানুষের মতো। সুবিধা পেলেই তারা প্রাণপণে উৎপাত করত যেখানে সেখানে। নিম্নশ্রেণীর সাধারণ জলডাকাতরা তো ছিলই, তার উপরে আত্মপ্রকাশ করে নূতন একশ্রেণীর বোম্বেটে। জাতে তারা ইংরেজ, এবং অনেক সময়ে ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানরাও তাদের দলে যোগ দিতে ইতস্তত করত না। ইংরেজ ছাড়া আর সব জাতের জাহাজ তারা নির্বিচারে লুণ্ঠন করত।

ক্রমে ইউরোপীয় বোম্বেটের দল দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরদিকে আছে ক্যারিবিয়ান সমুদ্র, তা হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগরেরই একটি শাখা। ওইখানেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলটা ছিল ফিরিঙ্গি বোম্বেটেদের জন্য অত্যন্ত কুখ্যাত। তাদের নির্দয়তা ছিল মর্মভেদী। তারা কেবল জাহাজ লুণ্ঠন করেই ক্ষান্ত হত না, সর্বস্ব কেড়ে নেবার পর যাত্রীদেরও অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বাধ্য করত। এইভাবে কত হাজার হাজার অভাগাকেই যে জীবন্ত অবস্থাতেই সলিল সমাধি লাভ করতে হয়েছে, তার হিসাব কেউ রাখতে পারেনি।

নতুন এক অজুহাত দেখিয়ে সমুদ্রে জাহাজ ভাসালে আর এক শ্রেণীর ইংরেজ জাতীয় জলদস্যু। তখন ইংলণ্ডের সঙ্গে স্পেনের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ চলেছে। সে সময়ে স্পেনের

সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল আমেরিকার নানা স্থানে। ইংরেজ বোম্বেটেরা সুবিধা পেলেই স্পেনের কোনও জাহাজেই লুণ্ঠন করতে ছাড়ত না। এত বড় তাদের বুকের পাটা ছিল যে, সরকারি যুদ্ধজাহাজের সঙ্গেও তারা লড়াই করতে ভয় পেত না। কেবল সমুদ্রে নয়, প্রায়ই তারা ডাঙায় নেমে বড় বড় অরক্ষিত নগরকে আক্রমণ করত! সে এক বিষম সর্বনেশে ব্যাপার—লুঠতরাজের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিকাণ্ড ও হত্যাকাণ্ড! তাদের কবলে পড়ে বহু শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ জনপদ পরিণত হয়েছে প্রাণীশূন্য ভস্মস্তূপে। লাভের লোভে এদের দলে যোগ দিয়েছিল ফরাসি বোম্বোটেরাও! ইংরাজিতে এদের এক নূতন নামকরণ হয়েছে—বাক্যানিয়ার (Buccaneer)। এই দলের কাপ্তেন বার্থো লোমিউ রবার্ট নামে একজন ডাকাত একাই লুণ্ঠন করেছিল চারশ জাহাজ। এ ছাড়া কীড, টীচ ও লোলোনয়েজ প্রমুখ প্রসিদ্ধ বোম্বেটেরাও হিংস্রতা ও ভীষণতার জন্যে অতিশয় কুখ্যাত হয়ে আছে।

স্বার্থের গন্ধ পেয়ে নীতিজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল ইংরেজ গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত। "আমি স্পানিয়ার্ডদের সঙ্গে লড়াই করেছি" বললেই অত্যন্ত নরাধম যে কোনও জলডাকাতের সাত খুন মাফ হয়ে যেত। হেনরি মর্গ্যান নামে এই দলের এক পাপাত্মাকে বন্দী করে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল—শাস্তিলাভ করবার জন্যে। ইংরেজের আইনে বোম্বেটের শাস্তি হচ্ছে প্রাণদণ্ড। কিন্তু তখনকার ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস মর্গ্যানকে বোম্বেটে জেনেও "স্যর" উপাধিতে ভূষিত করেও তৃপ্ত হলেন না, তাকে লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর রূপে পাঠিয়ে দিলেন জামাইকা দ্বীপে। ভক্ষক হল রক্ষক!

তিন

ফিরিঙ্গি বোম্বেটেদেরই এক দলের কার্যক্ষেত্র হল বঙ্গদেশ। ওই দলে ইউরোপের অন্যান্য জাতির লোকও ছিল, হানা দিয়ে বেড়াত তারা ভারতসাগরে। কিন্তু তাদের মধ্যে সব চেয়ে মাথা চাগাড় দিয়ে উঠল পর্তুগিজরাই।

তার কারণও আছে। সমুদ্রপথে তখন পর্তুগালের প্রভুত্ব সীমা নেই। পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ইউরোপ থেকে ভারতে আসবার জন্যে নতুন সমুদ্রপথ আবিষ্কার করে মস্ত নাম কিনেছেন। আমরা তাঁকে যদি ভদ্রবংশীয় বোম্বেটে বলে ডাকি, তবে কিছুমাত্র অন্যায় হবে না। কারণ ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতের কালিকট নগরকে কামানের মুখে সমর্পণ করেন এবং প্রভূত সম্পত্তি লুণ্ঠন ও নরহত্যা করে স্বদেশে ফিরে যান।

প্রথম ইমানুয়েল ছিলেন পর্তুগালের রাজা। পর্তুগিজরা তখন দক্ষিণ ভারতের একাধিক প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ভাস্কো-দা-গামার দস্যুতা রাজার কাছে গৃহীত হল বীরত্ব রূপে এবং পুরস্কার স্বরূপ ভাস্কো-দা-গামা লাভ করলেন পর্তুগালের ভারতীয় উপনিবেশের রাজ-প্রতিনিধিত্ব বা শাসনকর্তৃত্ব। তিন মাস পরে দক্ষিণ ভারতেই (কোচিনে) তাঁর মৃত্যু হয়।

ভারতের সঙ্গে পর্তুগালের ওই সম্পর্কের ফলে তাড়াতাড়ি বড়লোক হবার লোভে দলে দলে পর্তুগিজ এদেশে আসতে আরম্ভ করলে এবং অন্যান্য ইউরোপীয়দের চেয়ে তারাই দলে ভারি হয়ে উঠতে লাগল। ক্রমে তারা বৈধ ও অবৈধ উপায়ে বাংলাদেশের স্থানে স্থানে আড্ডা

গেড়ে কায়েমি হবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল। প্রথমে তারা কুঠি স্থাপন করলে চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে। তারপর আরও নানা জায়গায় তাদের আস্তানার সংখ্যা বেড়ে উঠতে লাগল ক্রমে ক্রমে।

ইংরেজরা যে বৈধ ভাবে বাংলাদেশে প্রধান হয়ে উঠেছিল, ইতিহাস এ কথা বলে না। পর্তুগিজরাও গোড়া থেকেই এখানে প্রাধান্য বিস্তার করতে চেয়েছিল অবৈধ উপায়ে। কিন্তু তারা ছিল ইংরেজদের চেয়ে বেশি অসৎ। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তারা কোনরকম সঙ্কোচ বা ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারত না। দরকার হলেই তারা জলদস্যুতা করত বঙ্গোপসাগরের যেখানে সেখানে। বাংলার বাসিন্দারা তাদের বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে পারেনি।

তার কারণও ছিল। পর্তুগালের রাজা ভারতেও সুবৃহৎ উপনিবেশ স্থাপন করতে চেয়েছিল, কিন্তু রাজ্যবিস্তার করবার মতো লোকবল তাঁর ছিল না কারণ পর্তুগাল হচ্ছে ক্ষুদ্র দেশ—ভারতবর্ষের বৃহৎ আসর জমাতে পারে, এমন যোগ্য ও শিষ্ট লোকের সংখ্যা সেখানে বেশি নয়।

যোগ্য লোকের অভাবে পর্তুগালের কর্তৃপক্ষ যে উপায় অবলম্বন করলেন, শেষ পর্যন্ত সেইটেই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁদের সর্বনাশের কারণ।

পর্তুগালের কারাগারে ছিল দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীগণ। তাদের বলা হল, "তোমরা স্বদেশে বসে জেল খাটতে কিংবা ভারতবর্ষে গিয়ে স্বাধীনতার ভাগ্যপরীক্ষা করতে চাও?"

বলা বাহুল্য, কয়েদিরা ভারতবর্ষে যাওয়াই শ্রেয়স্কর বলে মনে করলে।

তাদের দলে ছিল গুরুতর অপরাধের জন্যে দণ্ডিত অপরাধীরাও—কেউ খুনি, কেউ ডাকাত, কেউ গুণ্ডা। ভারতে তথা বাংলাদেশে গিয়েও তারা নিজেদের স্বভাব বদলাতে পারলে না বরং দেশের সমাজ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে তাদের চক্ষুলজ্জা পর্যন্ত ঘুচে গেল। আর কয়লার ময়লাও যায় না।

তখন নানা দেশের ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা ভারত পর্যটন করতে আসতেন। তাঁদের ভ্রমণকাহিনীতে ভারতের পর্তুগিজদের "বন্য মানুষ" এবং "পোষ-না-মানা ঘোড়া" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের উপনিবেশে সুশাসনের গুণে পর্তুগিজরা অপেক্ষাকৃত ভদ্রভাবে জীবনযাপন করতে বাধ্য হত। এটা যাদের সহ্য হত না, তারা সেখান থেকে সরে পড়ে বাংলাদেশে গিয়ে পদার্পণ করত কারণ বাংলার নদীতে নদীতে ছিল জলডাকাতি করে রাতারাতি বড়লোক হবার সুযোগ।

চার

চতুর্দিকে হাহাকার! ফিরিঙ্গি বোম্বেটেদের অত্যাচার। সমাজ সংসার উচ্ছন্নে যেতে বসল, বাংলায় গ্রামের পর গ্রাম শ্মশানের মতো হয়ে উঠল।

ফিরিঙ্গিরা নদীতে নদীতে হানা দেয় এবং সুযোগ পেলেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের ইউরোপীয় জলদস্যুদের মতো তীরে নেমেও লুঠপাট করে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়, মানুষদের বন্দী করে নিয়ে যায়। দেখতে দেখতে তাদের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে বাসিন্দারা পলায়ন করতে লাগল—দেশ হয়ে উঠল অরাজক বা "ফিরিঙ্গিরাজক"।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর "কবিকঙ্কণ" কাব্য নাকি ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত। তার মধ্যেও ওই বোম্বেটে-বিভীষিকার প্রমাণ আছে। ধনপতি সওদাগর নদীতে নৌকো ভাসিয়ে চলেছেন—

"ফিরিঙ্গির দেশ" খান বাহে কর্ণধারে,
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হরমাদের ভরে।"

"হরমাদ" মানে রণপোতবহর। পাছে ফিরিঙ্গি বোম্বেটেদের দ্বারা আক্রান্ত হতে হয়, সেই আশঙ্কায় নৌকা চালানো হয়েছিল রাত্রির অন্ধকারে চুপে চুপে। আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে কবি মুকুন্দরাম ওই অঞ্চলটিকে "ফিরিঙ্গির দেশ" বলে বর্ণনা করেছেন। বাংলাদেশ তখন মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এবং তার কয়েকটি প্রান্তে এমন কয়েকটি রাজ্য ছিল, যাদের স্বাধীন বা প্রায় স্বাধীন বলা চলত। কিন্তু পূর্বোক্ত অঞ্চলে তখন ফিরিঙ্গি পর্তুগিজ জলডাকাতদের প্রাধান্য ছিল এত বেশি যে, তা কেবল "ফিরিঙ্গির দেশ" বলেই বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু কেবল কি ফিরিঙ্গি? তাদের সহচর ছিল মগরাও। মগ ও ফিরিঙ্গি—দুষ্টামি ও নষ্টামিতে "কে হারে, কে জিতে, দুজনে সমান!" বাংলার "মগের মুল্লুক" বলে একটা চলতি কথা আছে। মগের মুল্লুক—অর্থাৎ অরাজক দেশ। ফিরিঙ্গি এবং মগদের অত্যাচারে তখন বাংলাদেশের কতকাংশ সত্য সত্যই অরাজক হয়ে উঠেছিল।

আরাকান হচ্ছে ব্রহ্মদেশেরই একটা প্রদেশ। ত্রিপুরার দক্ষিণ দিক থেকে আরাকান রাজ্য আরম্ভ হয়েছে। মগরা হচ্ছে সেখানকারই বাসিন্দা। ধর্মে বৌদ্ধ হলেও তারা অহিংসার মন্ত্র উচ্চারণ করত না। এক সময়ে তারা বাংলাদেশেও আক্রমণ করে সমগ্র চট্টগ্রাম জেলা এবং নোয়াখালি আর ত্রিপুরারও কতক অংশ অধিকার করেছিল। এইজন্যে অবশেষে তাদের সঙ্গে মোগলদের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়।

কথায় বলে "চোরে চোরে মাসতুতো ভাই"! কাজেই ফিরিঙ্গি দস্যুদের সঙ্গে মগ দস্যুদের মিতালি হতে দেরি লাগল না। মগ ও ফিরিঙ্গিরা মনে মনে পরস্পরকে পছন্দ করত না, কিন্তু তারা একজোট হয়েছিল কেবল একই স্বার্থের খাতিরে। মগদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দরকার হলে ফিরিঙ্গিরা মোগলদের সঙ্গে লড়াই করেছিল। এবং আরাকানের দুই জায়গায় তাদের দুটো বড় বড় ঘাঁটিও ছিল বটে, কিন্তু তারা কোনদিনই সম্পূর্ণরূপে আরাকানরাজের বশ্যতা স্বীকার করেনি।

আসলে বাংলায় প্রবাসী ফিরিঙ্গি বা পর্তুগিজরা ছিল জাতিভ্রষ্ট বা সমাজচ্যুত জীব। পর্তুগাল তাদের স্বদেশ হলেও পর্তুগালপতির বা তাঁর রাজ প্রতিনিধিরও কোন ধারই তারা ধারত না—মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো ছেলেদের মতো যা খুশি তাই করতে পারত।

কিন্তু তারা ছিল নিপুণ নাবিক ও জলযুদ্ধে মহা ওস্তাদ। তাদের নৌকা বা জাহাজ ছিল রণপোতেরই নামান্তর, সর্বদাই তার মধ্যে থাকত কামান, বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র। এইজন্যে বাংলার কয়েক বিদ্রোহী রাজা তাদের অনেককে বেতন দিয়ে নিজেদের দলে নিযুক্ত করতেন—যেমন শ্রীপুর ও বিক্রমপুরের রাজা চাঁদ রায় ও কেদার রায় এবং যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য।

চট্টগ্রামে ও আরাকানে ছিল পর্তুগিজ বোম্বেটেদের প্রধান আস্তানা। সাধারণত তারা চট্টগ্রাম থেকে বেরিয়ে নদীপথে নৌবাহিনী চালিয়ে যখন তখন হানা দিত হুগলি, যশোহর, ভূষণা, বাকলা, বিক্রমপুর, সোনারগাঁ ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানে। বলা বাহুল্য, তাদের পাপকার্যের সঙ্গী হত মগের দলও এবং তারাও ছিল তাদেরই মতো নিপুণ নাবিক।

শোনা যায়, এখন যেখানে হিংস্র জন্তুপূর্ণ, জনশূন্য সুন্দরবন, আগে সেখানে ছিল সব সমৃদ্ধিশালী জনপদ। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে মগ ও ফিরিঙ্গি বোম্বেটেদের কবলে নির্যাতিত হয়ে নাগরিকরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিল।

পরিত্যক্ত, বিজন নগর আচ্ছন্ন হয়ে যায় ঝোপঝাড় আগাছায়, কালক্রমে বাড়িঘরের ধ্বংসাবশেষের উপরে মাথা তুলে দাঁড়ায় মহা মহা মহীরুহ এবং চতুর্দিকে নরনারীর কলকোলাহলের পরিবর্তে শোনা যেতে থাকে ভয়াল জন্তুদের ভৈরব গর্জন!

নাম হয় তার সুন্দরবন। সুন্দর বটে, কিন্তু ভীষণসুন্দর!

পাঁচ

"আরাকানি জলদস্যুরা (মগ ও ফিরিঙ্গি) নিয়মিত ভাবে বাংলাদেশ লুণ্ঠন করত! হিন্দু বা মুসলমান যাকে হাতের কাছে পেত তাকেই তারা গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেত।

বন্দীদের হাতের তেলোয় ছ্যাঁদা করে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হত বেতের ফালি (বা রজু), তারপর তাদের নিক্ষেপ করা হত জাহাজের পাটাতনের তলায়। দিনের পর দিন তারা সেইখানে অন্ধকারে গাদাগাদি করে বাস করত। প্রতিদিন সকালে তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে উপর থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হত কয়েক মুঠো আরাঁধা চাউল—যেমন করে লোকে ছড়িয়ে দেয় মুরগিদের জন্যে।

ফিরিঙ্গিরা দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন বন্দরে গিয়ে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসিদের কাছে বন্দীদের বিক্রয় করে ফেলত। কিন্তু মগরা তা করত না, তারা স্বদেশে নিয়ে গিয়ে বন্দীদের নিযুক্ত করত কৃষিক্ষেত্রে বা গৃহস্থালীর কাজে।"

এই হল ঐতিহাসিকের উক্তি।

তমলুকের কিছুদূর থেকে গঙ্গার একটি শাখা চলে গিয়েছিল ঢাকা ও চট্টগ্রামের দিকে। এই জলপথ দিয়েই আনাগোনা করত মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুদল। ইংরেজ বণিকরা ওই জলপথের নাম দিয়েছিল "দুরাত্মাদের নদী"।

আগেই ইউরোপীয় সমুদ্রে মূর জলদস্যুদের কথা বলা হয়েছে। বন্দীদের তারা এখানে ওখানে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে ফেলত।

লুণ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে তারা চালাত দাস ব্যবসায়। খুব সম্ভব তাদের দেখাদেখি বাংলাদেশের ফিরিঙ্গি বোম্বেটেরাও ওই পেশা অবলম্বন করেছিল।

ভেবে দেখো, সে কি নিদারুণ ব্যাপার! চারিদিকে অখণ্ড শান্তি, নদীর ধারে ঘুমিয়ে আছে সবুজ বাংলার গ্রাম্য প্রকৃতি। সোনার ধান দোলানো ক্ষেতের আশেপাশে মাঠে মাঠে নির্ভয়ে খেলা করছে গৃহস্থদের শিশুর দল—তাদের কারুর নাম রাম বা শ্যাম কিংবা কাশেম বা কাদের!

আচম্বিতে দিকে দিকে হই-চই উঠল—"ওরে, পালা, পালা!" "ফিরিঙ্গিরা আসছে, বোম্বেটেরা আসছে।"

নদীর ধারে হুড়মুড় করে এসে পড়ল বোম্বেটেদের জাহাজ এবং তার ভিতর থেকে টপাটপ লাফিয়ে পড়ল মূর্তিমান যমদূতের মতো পর্তুগিজ গোরার দল।

ছেলের দল খেলা ভুলে প্রাণপণে দৌড় মারলে যে যেদিকে পারে কিন্তু সবাই পালাতে পারলে না, ধরা পড়ল অনেকেই।

তারপর? ফিরিঙ্গি বোম্বেটেরা তাদের নিয়ে গিয়ে বেচে ফেলল ইংরেজ ফরাসি ও ওলন্দাজ বণিকদের কাছে। ক্রীতদাস নিয়ে তারা ফিরে গেল সাত সমুদ্র তের নদীর পারে আপন আপন দেশে।

বাংলাদেশের কচি কচি শ্যামলা ছেলে যেখানে গিয়ে পড়ল সেখানকার মানুষ, ভাষা, তুষারপাত ও জীবনযাত্রা—সবই তাদের কাছে নূতন, আজব, দুর্বোধ্য! কোথায় আদরভরা মা-বাপের কোল আর কোথায় অজানা বিদেশিদের কাছে যন্ত্রণাপূর্ণ ক্রীতদাসের জীবন। ছিল সবাই আনন্দময় ফুলের বাগানে, গিয়ে পড়ল নির্জন নির্মম মরুভূমিতে।

ম্যাডাম দ্যু মেরী ছিলেন ফরাসিদেশের এক পরামাসুন্দরী বিলাসিনী, রাজা পঞ্চদশ লুই-এর প্রিয় বান্ধবী। এমনই এক বাংলার ছেলে গিয়ে পড়েছিল তাঁর কাছে, তিনি তাকে সখ করে দামী পোশাক পরিয়ে লালনপালন করতেন—মানুষ যেমন করে পাখি পোষে সোনার খাঁচায়। তার বাঙালি বাপ-মা কি নাম ধরে তাকে ডাকতেন কেউ তা জানে না, কিন্তু ফরাসি দেশে সবাই তাকে জামোর বলে ডাকত।

জামোর কি খুশি ছিল? মোটেই নয়, মোটেই নয়। স্বাধীন পাখি কি সোনার খাঁচায় খুশি থাকতে পারে? জামোর জানত, সবাই তাকে বলে "বিকটাকার ক্ষুদে জন্তু"! বুকের তলায় প্রাণ তার বিদ্রোহী হয়ে উঠত।

অবশেষে সে প্রতিশোধ নিলে। শুরু হল ফরাসি বিপ্লব, রাজা পঞ্চদশ লুই-এর প্রিয়পাত্রী ও জামোরের কর্ত্রী দ্যু মেরী হল বন্দিনী।

বিচারালয়ে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে জামোর। দ্যু মেরীর উপরে হল প্রাণদণ্ড।

পূর্ববাংলায় মগরাও করত ফিরিঙ্গিদের মতো অমানুষিক অত্যাচার। মুসলমান ঐতিহাসিক তাদের সম্বন্ধে বলেছেন :

"বাংলার সীমান্ত প্রদেশে মগদের অত্যাচারে আকাশে উড়ত না একটা পাখি, স্থলে বিচরণ করত না একটা জন্তু। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত যাতায়াত করবার পথের দুই পাশে দেখতে পাওয়া যেত না একজন মাত্র গৃহস্থকেও।"

এমন অস্বাভাবিক অবস্থা কল্পনাও করা যায় না। এবং এমন অস্বাভাবিক অবস্থা চিরদিন কখনও স্থায়ী হতেও পারে না। অবশেষে মোগলসম্রাট ও মুসলমান শাসনকর্তাদের টনক নড়ল। প্রথমে তাঁরা ব্যাপারটার গুরুত্ব না বুঝে দুই-চারিদল সেপাই পাঠিয়ে বোম্বেটেদের দমন করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বোম্বেটেরা অনায়াসেই তাদের হারিয়ে দিলে। তখন তাঁরা দস্তুরমতো আয়োজন করে কোমর বেঁধে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন।

ছয়

১৬৩২ খ্রিস্টাব্দের কথা

সর্বপ্রথমে ভারতসম্রাট সাজাহানের দৃষ্টি পড়ল হুগলির পর্তুগিজ উপনিবেশের উপর। তাঁর আজ্ঞায় সেনাপতি কাশিম খাঁ সসৈন্যে যাত্রা করলেন হুগলির দিকে।

বাংলার মধ্যে হুগলিতেই পর্তুগিজ উপনিবেশ ছিল সবচেয়ে সুপরিচালিত, সুরক্ষিত ও সুবৃহৎ। সেখানকার পর্তুগিজদের অধিকাংশ জলদস্যু ছিল না বটে, কিন্তু তারা মোগলদের শত্রু আরাকানরাজকে সৈনিক ও গোলা-বারুদ প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করত। উপরন্তু বাংলার ফিরিঙ্গি বোম্বেটেরা হুগলিতে এসে ফলাও ভাবে দাস-ব্যবসায় চালিয়ে যেত। তাঁর অভাগা প্রজাদের বন্দী করে ফিরিঙ্গিরা যে হাটে নিয়ে গিয়ে গরু-ছাগলের মতো বিক্রি করে ফেলবে। সম্রাট সাজাহানের পক্ষে এটা অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

মোগলরা যে সৈন্যবলে ছিল অধিকতর বলীয়ান, সে কথা বলাই বাহুল্য। আগে জল-স্থলের চারিদিক থেকে হুগলিকে ঘিরে ফেলে তারা আক্রমণ করতে অগ্রসর হল। কিন্তু পর্তুগিজদের যুদ্ধপ্রতিভা ছিল অসামান্য, সংখ্যায় দুর্বল হলেও তারা দীর্ঘ তিন মাস ধরে মোগলদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিলে। অবশেষে তারা গঙ্গায় জাহাজ ভাসিয়ে যুদ্ধ করতে করতে কতক পলায়ন করলে। কতক মারা পড়ল এবং কতক বন্দী হল। মোগলসম্রাট উপহার লাভ করলেন চারিশত বন্দী ফিরিঙ্গি নরনারী। এই ভাবে পশ্চিম বাংলায় হুগলি বন্দরে পর্তুগিজদের প্রধান আস্তানা বিলুপ্ত হয়।

কিন্তু এর আগে এবং এর পরে অনেক কাল ধরেই পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার ফিরিঙ্গি বোম্বেটেদের প্রভাব বা অত্যাচার ছিল অপ্রতিহত। তারা নিষ্ঠুর ও দস্যু ছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে কোনদিনই তাদের সাহস ও বীরত্বের অভাব হয়নি। মোগলদের সঙ্গেও তারা লড়াই করেছে, মগদের সঙ্গে বিবাদ বাধলেও তারা অস্ত্র ধরেছে এবং জয়ী হয়েছেও বারংবার।

তাদের মধ্যে দুইজন নেতার নাম বাংলার ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। ডোমিঙ্গো কার্ভালহো ও সিবাস্টিয়ো গঞ্জেলেস।

কার্ভালহো শ্রীপুরের রাজা কেদার রায়ের অধীনে কাজ করত। সে মগদের কবল থেকে নবদ্বীপ কেড়ে নিয়ে কেদার রায়ের হাতে সমর্পণ করেছিল। এবং কেদার রায়ের রাজধানী মোগলদের দ্বারা আক্রান্ত হলে কার্ভালহোই তাদের হারিয়ে শ্রীপুরকে রক্ষা করে। পরে রাজা প্রতাপাদিত্যের আদেশে সে নিহত হয়।

গঞ্জেলেস ছিল একের নম্বরের দুরাত্মা। তার নেতা হবার উপযুক্ত বিশিষ্ট গুণ থাকলেও দস্যুতায়, নৃশংসতায় ও বিশ্বাসঘাতকতায় তার তুলনা ছিল না। বাক্‌লার বাঙালি রাজার কাছ থেকে সৈন্যসাহায্য পেয়ে সে মুসলমানদের হারিয়ে সনদ্বীপ অধিকার করে, অথচ পরে ওই রাজাকেই বঞ্চিত করে নিজেই সেখানে প্রভু হয়ে বসে শাসনকার্য চালাতে থাকে। কিন্তু গঞ্জেলেসের ক্রূরতা ও কঠিন স্বভাবের জন্যে তার অধীনস্থ অন্যান্য ফিরিঙ্গি বোম্বেটেরা পর্যন্ত তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না। ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের রাজা তার কাছ থেকে সনদ্বীপ কেড়ে নেন এবং গঞ্জেলেসের নামও ডুবে যায় বিস্মৃতির অন্ধকারে!

শেষের দিকে মগদের সঙ্গে ফিরিঙ্গিদের আর বিশেষ সদ্ভাব ছিল না।

দুই জাতির মধ্যে প্রায়ই খিটিমিটি বাধতে থাকে। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের বিখ্যাত শাসনকর্তা শায়েস্তা খাঁ যখন সনদ্বীপ দখল করে চট্টগ্রাম আক্রমণের উদ্যোগ করেছিলেন, সেই সময়ে মগদের সঙ্গে ঝগড়া করে ফিরিঙ্গিরা তাঁর ফৌজে যোগ দেয় সদলবলে। সেই সম্মিলিত

মোগল ও ফিরিঙ্গি সৈন্যদের আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে না পেরে আরাকানিরা সে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল এবং অবশেষে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হল মগের মুল্লুক। সেখানে বন্দীদশায় জীবনযাপন করছিল হাজার হাজার বাঙালি কৃষক। স্বাধীনতা পেয়ে ঘরের ছেলে আবার ফিরে এলো।

প্রথমে হুগলি এবং তারপর চট্টগ্রাম—এই দুই প্রধান বন্দর ও আস্তানা থেকে বঞ্চিত হয়ে বোম্বেটেদের মেরুদণ্ড একেবারেই ভেঙে গেল। মগরা আর বাংলার দিকে লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারেনি এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষের দিকেও বাংলাদেশে পর্তুগিজরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল বটে, কিন্তু তাদের অবস্থা হয়ে পড়েছিল বিষদাঁত ভাঙা ভুজঙ্গের মতো।

বোম্বেটেদের হাতে ইংরেজদের নাকাল হতে হয়নি। তারা এখানে কায়েমি হয়ে বসবার আগেই বাংলাদেশ থেকে বোম্বেটেরাজ বিলুপ্ত হয়েছে।

পাহাড়ি নদীর ধারে

অন্ধকার!

অন্ধকারের পর অন্ধকার যেন ধাক্কার পর ধাক্কার মেরে তলিয়ে দিলে আমাকে আরও বেশি, আরও ঘন অন্ধকারের অতলে!

কি এক আশ্চর্য স্তব্ধতার মধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে গেল আমার অস্তিত্ব।

তারপর...

তারপর আবার অন্ধকারের ঘোর কাটতে লাগল ধীরে ধীরে। চারিদিক যেন ছায়াময়, মায়াময়।

তারপর কে যেন সেই ছায়া মায়ার অন্তঃপুরে জ্বেলে দিলে প্রদীপের মিটমিটে আলো। ক্রমে ক্রমে সেই আলো একটু একটু করে হয়ে উঠল আরও, আরও জোরালো। চোখের সামনে জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগল নতুন নতুন আলো;—অনেক আলোর ধারায় ধুয়ে-মুছে গেল অন্ধকারের কালো। চারিদিক আবার দিনের আলোয় ঝলমল ঝলমল! ফিরিয়ে পেলুম আবার আমার অস্তিত্ব!

একে একে সব কথা মনে পড়তে লাগল।

ছিলুম আমরা সবুজ মাঠের কোলে, পাহাড়ি নদীর ধারে। আমি আর মুকুল।

পশ্চিমে সূর্য ডুবু ডুবু। আকাশে রাঙা মেঘ। পাখিদের গলায় বেলা শেষের গান।

ধু-ধু-ধু সবুজ মাঠ। যাকে বলে তেপান্তর। মাঠের ওপারে বহুদূরে একটানা বনরেখা। তারই উপরে আকাশকে মাথায় নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের পর পাহাড়—যেন নিরেট কালো মেঘ দিয়ে গড়া। মাঠের এধারে সঙ্গীতের মাধুর্য ছড়াতে ছড়াতে বয়ে যাচ্ছে ছোট্ট একটি নাচুনী নদী।

নদীর উঁচু পাড়ের উপরে পথ। বাঁধানো নয় বটে, কিন্তু সমতল। সেই পথে মোটর চালিয়ে যাচ্ছিলুম আমি এবং পাশে বসেছিল আমার বন্ধু মুকুল।

মুকুল বললে, "বিনয়, আমরা শহুরে জীব বটে, কিন্তু এ দৃশ্য ছেড়ে শহরে আর ফিরতে ইচ্ছা হয় না। চারিদিক কি সুন্দর, কি শান্তিময়!"

আমি বললুম, "কিন্তু একটু পরেই এখানটাকে আর শান্তিময় বলে মনে হবে না।"

—"কেন?"

—"একটু পরেই সূর্য ডুবে যাবে, আসবে সন্ধ্যা—তারপর রাত্রি।"

—"ও, তুমি অন্ধকারের কথা বলছ? কিন্তু আজ তো পূর্ণিমা, একটু পরেই চাঁদ উঠে তাড়িয়ে দেবে অন্ধকারকে।"

—"না, আমি অন্ধকারের কথা বলছি না। একটু পরেই চাঁদ উঠবে বটে, কিন্তু রাত্রির সঙ্গে সঙ্গেই আর যারা আসবে, চাঁদ তাদের তাড়াতে পারবে না।"

—"কে তারা?"

—"বাঘ, ভাল্লুক, সাপ। তুমি কি তাদের শান্তির দূত বলে মনে কর?"

আমার কথার জবাব না দিয়ে মুকুল মোহিত স্বরে বলে উঠল, "আহা কি চমৎকার! দেখো বিনয়, দেখো, সবুজ বনের পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে এক ঝাঁক বক, ঠিক যেন সাদা ফুলের একগাছি মালা!"

মোটর চালাতে চালাতে পথের উপর থেকে চোখ তুলে ফিরে তাকালুম আকাশের দিকে—

পরমুহূর্তে শুনলুম যেন এক বজ্রনাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে আর কিছু বোঝবার বা শোনবার আগেই ঝট করে নিভে গেল পৃথিবীর আলো।

কিন্তু পৃথিবীর আলো আবার ফিরে পেয়েছি। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আবার সব দৃশ্য।

ওই তো আবিরের ছোপ মাখানো নীলাকাশ। সূর্য অস্ত গিয়েছে বটে, কিন্তু এখনও উতরে যায়নি গোধূলি লগ্ন—এখনও কানে আসছে বিহঙ্গদের বিদায়ী সঙ্গীত।

তবে? তবে একটু আগেই আচম্বিতে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলুম না।

মনে সন্দেহ জাগল, হয়তো হঠাৎ আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলুম। মানুষের দেহ হচ্ছে এক অদ্ভুত যন্ত্র, কখন যে তার কোনখানটা বিকল হয়ে বিগড়ে যাবে, আগে থাকতে কেউ বলতে পারে না।

কিন্তু মুকুল? কোথায় গেল মুকুল? সে তো ছিল আমার পাশেই?

আর আমার মোটর? আমি তো গাড়ি চালাচ্ছিলুম, আমার মোটর কোথায় গেল?

অবাক হয়ে একমনে এই সব ভাবছি, এমন সময়ে—

এমন সময়ে শুনতে পেলুম একটা গোলমাল। অনেক লোকের ছুটোছুটি—অনেক লোকের কণ্ঠস্বর!

সচমকে অন্যদিকে ফিরে দেখলুম, অদূরেই উত্তেজিত লোকজনের ভিড়, আমার মোটরগাড়িখানা উল্টে একটা গাছতলায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে এবং খানিক তফাতে মাটির উপরে রক্তাক্ত দেহে শুয়ে রয়েছে আমার বন্ধু মুকুল!

এখানে কি কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে? তাড়াতাড়ি মুকুলের পাশে বসে পড়ে ব্যাকুল স্বরে বললুম, "মুকুল, মুকুল, কি হয়েছে? তোমার গায়ে রক্ত কেন?"

কিন্তু মুকুল আমার কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না, সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "আমাকে নিয়ে আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আপনারা বিনয়কে দেখুন—সে মোটরের তলায় চাপা পড়েছে!"

আমি বললুম "না মুকুল, আমার কিছুই হয়নি! দেখো, আমি তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে!"

তবু মুকুল আমার কথা আমলে না এনে বার বার চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "আগে বিনয়কে দেখুন—আগে বিনয়কে দেখুন, সে গাড়ির তলায় চাপা পড়েছে!"

আঘাত পেয়ে মুকুল কি কানা ও কালা হয়ে গিয়েছে—আমাকে দেখতেও পাচ্ছে না আমার কথা শুনতেও পাচ্ছে না?

হঠাৎ আবার জোরে হইচই উঠল। ব্যাপার কি?

ফিরে দেখলুম উল্টে পড়া মোটরের তলা থেকে কয়েকজন লোক একটা ক্ষতবিক্ষত দেহকে বাইরে টেনে নিয়ে এল। সেটা হচ্ছে মৃতদেহ।

কিন্তু কার মৃতদেহ? নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারলুম না—কারণ সেই মৃত মানুষটাকে দেখতে অবিকল আমারই মতন। আমি স্বচক্ষে দেখছি আমারই মৃতদেহ! আরে দূর, এও কি সম্ভব?

মুকুল কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল, "বিনয়, বিনয়! আমার বিনয় আর বেঁচে নেই!"

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। তবে কি মোটর দুর্ঘটনায় সত্যিই আমার মৃত্যু হয়েছে? তবে কি আমি এখন অশরীরী—আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, আমার কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে না! তবে কি—হা ভগবান! তবে কি আমি এখন প্রেতাত্মা?

রক্ত-বাদল ঝরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

বোম্বেটে না বর্বর

বোম্বেটে কাকে বলে সবাই তা জানে। বোম্বেটে বা জলদস্যু পৃথিবীর সব দেশেই সব সময়ে ছিল। এখনও আছে।

তবে বোম্বেটে-জীবনের গৌরবময় যুগ আর নেই। আগেকার বোম্বেটেদের ক্ষমতা ছিল অবাধ ও খ্যাতি ছিল আশ্চর্য, এখনকার বোম্বেটেরা তাদের কাছে হচ্ছে তিমিমাছের কাছে পুঁটিমাছের মতো।

উড়োজাহাজ, বাষ্পীয় পোত ও বেতার টেলিগ্রাফের মহিমায় আজ আর কোনও বোম্বেটেই বেশি মাথা তুলতে বা বেশিদিন কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে না। চীনে বোম্বেটেরা আজও মাঝে মাঝে মাথা চাগাড় দেয় বটে, কিন্তু তাদের জারিজুরি ওই চীনা সমুদ্রের ভিতরেই। চীনদেশের ভিতরকার অবস্থা ভাল নয়, রাজ্যবিপ্লব নিয়েই সেখানকার গভর্নমেন্ট ব্যতিব্যস্ত, সেইজন্যেই চীনে বোম্বেটেরা মাঝে মাঝে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করবার সুযোগ পায়।

অন্যান্য দেশের আধুনিক বোম্বেটেরা উল্লেখযোগ্য জীব নয়। তারা আছে—এইমাত্র।

বাংলাদেশে 'বোম্বেটে' কথাটি বেশিদিনের নয়। বার ভুঁইয়ার সময়ে বাংলাদেশে পর্তুগিজ জলদস্যুদের বিষম উপদ্রব হয়েছিল। তখনকার রডা, গঞ্জালিস ও কার্ভালো প্রভৃতি জলদস্যুর নাম বাঙালি এখনও ভুলতে পারেনি, কারণ বর্গির অত্যাচার ও মগের অত্যাচারের মতো পর্তুগিজ জলদস্যুদের অত্যাচারও ছিল তখনকার বাংলাদেশের নিত্য-নৈমিত্তিক বিভীষিকা। ওই সময়েই 'বোম্বেটে' কথাটি বাংলাদেশে চলতে শুরু হয়। ইংরেজি Bombardier-এর বাংলা হচ্ছে 'গোলন্দাজ সৈন্য'। পর্তুগিজ জলদস্যুরা গোলন্দাজিতে অর্থাৎ কামান-বন্দুকের ব্যবহারে দক্ষ ছিল। তাই বোধহয়, ওই ইংরেজি কথাটা থেকে বাংলা 'বোম্বেটিয়া' বা 'বোম্বেটে' কথাটির সৃষ্টি হয়, আর সাধারণভাবে জলদস্যুদেরই প্রতি ব্যবহৃত হতে থাকে।

'বোম্বেটে' কথাটি খাঁটি বাংলা কথা না হলেও খাঁটি বাঙালি বোম্বেটের অভাব বাংলাদেশে ছিল না। তবে এখানে তো সমুদ্রতীরবর্তী নগর বেশি নেই, কাজেই বোম্বেটেদের ছোট ছোট নৌকা করে নদ-নদীর ভিতরে এসেই ব্যবসা চালাতে হত। বড় বড় জাহাজে চড়ে পৃথিবীর নামজাদা বোম্বেটেদের মতো সমুদ্রের উপর বড়রকমের ডাকাতি করার সুযোগ তাদের বেশি ছিল না।

সেকেলে বাংলার জল-ডাকাতদের সাধারণ নিয়ম ছিল এই রকম : কোনও যাত্রীনৌকো দেখলেই তারা নিজেদের নৌকো নিয়ে তার কাছে গিয়ে বলত, "আমাদের আগুন নিবে গেছে। একটু আগুন দেবে ভায়া?" যাত্রী নৌকোর লোকেরা কোনরকম সন্দেহ না করে আগুন দেবার জন্যে বোম্বেটে নৌকোর পাশে গিয়ে হাজির হত এবং অমনি সেই সুযোগে বোম্বেটেরা যাত্রী নৌকোর ভিতরে লাফিয়ে পড়ে সর্বনাশের সৃষ্টি করত। বারে বারে এমনি ঠকে শেষটা অচেনা নৌকো আগুন চাইলেই তারা তাড়াতাড়ি আরও তফাতে সরে পড়ে পলায়ন করত।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মধ্য আমেরিকা

বাংলাদেশে জল-ডাকাতরা প্রায়ই ছিপ নৌকো ব্যবহার করত। এখানকার ডাঙার ডাকাতরা তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে ব্যবহার করত 'রণপা'। রণপা হচ্ছে দু'টো লম্বা বাঁশের ডাণ্ডা—মানুষের মাথার চেয়ে অনেক উঁচু। সেই ডাণ্ডার মাঝখানে পা রাখবার জায়গা থাকে। (ইউরোপেরও অনেক দেশের চাষীরা শস্যক্ষেতে চলাফেরা করবার সময়ে এমনই রণপা ব্যবহার করে থাকে।) কিন্তু বাংলার ডাঙার ডাকাতরাও জলপথে তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে বোম্বেটেদেরই মতো ছিপ ব্যবহার করত।

আইনের চোখে অপরাধী হলেও সামাজিক হিসাবে, আগেকার বোম্বেটেরা বোধহয় সাধারণ খুনি বা ডাকাতের চেয়ে উচ্চশ্রেণীর জীব ছিল। কারণ, দেখা যায়, আগেকার এমন কয়েকজন লোক নৌ-যোদ্ধারূপে বিখ্যাত হয়ে প্রভূত যশ ও রাজসম্মান অর্জন করে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হয়ে রয়েছেন, যাঁদের বোম্বেটে বললে খুব ভুল করা হয় না।

যেমন ভাস্কো ডা গামা। পর্তুগালের এই নামজাদা যোদ্ধা-নাবিক পর্তুগিজ অধিকৃত 'ভারতবর্ষে'র বড়লাটরূপে কোচিতে প্রাণত্যাগ করেন (১৫২৪)। কিন্তু আফ্রিকার স্থানে স্থানে ও ভারতের কালিকটে তিনি যেসব কাজ করে গেছেন, তা বোম্বেটের পক্ষেই সাজে। পর্তুগালের আর এক নাবিক-নেতা ফার্ণান ম্যাগেল্যানও স্বদেশে যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রীতি লাভ করেছেন, কিন্তু তিনি সাধারণ ইতর বোম্বেটের চেয়ে ভাল লোক ছিলেন না।

ইংলন্ডকে স্পেনের 'আর্মাডা'র কবল থেকে বাঁচিয়ে এবং অনেক নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার ও ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত করে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক আজ স্বদেশভক্ত বীর বলে সুপরিচিত। সে হিসাবে সত্যসত্যই তিনি এই সম্মানের অধিকারী। কিন্তু জলদস্যুরা যে কাজ করলে নিন্দিত হয়,

তাঁর অনেক অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যেই তা লক্ষ্য করা যায়। ড্রেক একালে জন্মালে, পৃথিবী বোধহয় তাঁকে ক্ষমা করত না। ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়ে তিনি যথেচ্ছভাবে লুটতরাজ করেছেন, হাজার হাজার অসহায় মানুষকে হত্যা করেছেন, বড় বড় শহরকে আগুনের মুখে সমর্পণ করেছেন। সে দেশের লোকের কাছে তিনি নিশ্চয়ই বীর নামে পরিচিত হন নাই। যুদ্ধের নামগন্ধ নেই, নগর লুণ্ঠনও শেষ হয়ে গেছে, তবু হাইতি দ্বীপের রাজধানী স্যান্টো ডোমিঙ্গো শহরের নিরীহ বাসিন্দাদের উপর ড্রেক অনবরত গুলিগোলা বৃষ্টি করেছেন। নগরের চতুর্দিকে যখন ভীষণ অগ্নির তাণ্ডবলীলা, নিরপরাধ নর-নারী ও শিশুর আর্তনাদে যখন আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ এবং ড্রেকের সৈন্যরা যখন ক্রমাগত গুলিগোলা বৃষ্টি করে একেবারে নেতিয়ে কাবু হয়ে পড়েছে, তখনও লক্ষাধিক মুদ্রা ঘুষ না পাওয়া পর্যন্ত ইংলন্ডের এই মহাবীর তুষ্ট হতে পারেননি।

পনের, ষোল ও সতের শতাব্দীতে ইংলন্ডবাসীরা নৌ-যোদ্ধা ও বোম্বেটেকে যে প্রায় অভিন্ন বলে মনে করত, তার অসংখ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তখন সমুদ্রে ও সাগর তীরবর্তী স্থানে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময়ে, ইংরেজরা অধিকাংশ সময়েই সাধারণ বোম্বেটেদের সাহায্য গ্রহণ করত। ইংলন্ডের রাজা, রানী ও শাসনকর্তারা পর্যন্ত বেতনভুক নিয়মিত নৌ-সৈন্যদের সঙ্গে বোম্বেটেদের পালন করতে লজ্জিত হতেন না—যেমন হতেন না বাংলা দেশের বার ভুঁইয়ারাও। রাজার সাহায্য পেয়ে বোম্বেটেদেরও বুক দশহাত হয়ে উঠত, তারা রাজশত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার অজুহাতে নিরীহ প্রজাদের ধন-প্রাণ নির্ভয়ে লুণ্ঠন করত।

এই শ্রেণীর বোম্বেটেদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে হেনরি মর্গ্যান। এই ভীষণ বোম্বেটেকে ইংলন্ডের রাজসরকার টাকা, জাহাজ ও লোকজন দিয়ে সাহায্য করেন। তার ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছাকাছি দ্বীপপুঞ্জে এবং দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে কারুর পক্ষে ধন-প্রাণ বজায় রেখে বাস করাই অসম্ভব হয়ে ওঠে। পানামার মতো শহরেও হেনরি মর্গ্যান হানা দিতে ভয় পায় নি, তার কবলগত হয়ে পানামার অধিকাংশ অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়ে যায় এবং যথাসর্বস্ব হারিয়েও এখানকার কত হাজার বাসিন্দা যে মৃত্যুমুখে পড়তে বাধ্য হয়, তার কোনও হিসাব নেই। ওই ওঁচা বোম্বেটেকে জলদস্যুরা পর্যন্ত ঘৃণা করত। কারণ সে কাক হয়েও কাকের মাংস খেত,—অর্থাৎ মর্গ্যান কেবল পরিচিত নির্দোষ ব্যক্তিরই ধন-প্রাণ কেড়ে নিত না, নিজের দলের লোকদেরও টাকা দু'হাতে চুরি করত। জলপথে ও স্থলপথে অসংখ্য অত্যাচার, নরহত্যা, লুণ্ঠন ও পাপকাজ এবং বোম্বেটেদেরও তহবিল তছরুপ করে, শেষটা সে সকলকে ফাঁকি দিয়ে হঠাৎ একদিন লুকিয়ে সরে পড়ে। তখন ইংলন্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের ধর্মভাব হঠাৎ জেগে উঠল। তাঁর হুকুমে মর্গ্যানকে ধরে দেশে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু বোম্বেটে সর্দারকে স্বচক্ষে দেখে রাজার মন এত খুশি হয়ে উঠল যে, শাস্তি দেওয়া দূরে থাক, 'স্যার' উপাধি ও 'কর্নেল' পদ দিয়ে তিনি তাঁকে আবার জামাইকা দ্বীপের ছোটলাট করে পাঠালেন।

রেমব্রাণ্ডের মতো বিশ্ববিখ্যাত ও সর্বজনমান্য চিত্রকর আঁকলেন কর্নেল স্যার হেনরি মর্গ্যানের ছবি এবং যার মরা উচিত ছিল ফাঁসিকাঠে, ছোটলাটের উঁচু, পুরু ও নরম গদিতে বসে সে সাধু-অসাধুর শাসনভার—অর্থাৎ মুণ্ডপাতের ভার পেয়ে চৌদ্দ বৎসর সুখে সম্মানে কাটিয়ে তিয়াত্তর বৎসর বয়সে পরম নিশ্চিন্তভাবে ইহলোক ত্যাগ করলে! পাপের এমন জয়ের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের ইতিহাসে দেখা যায় না! এমনকি আজও দেখি,

অনেক নামজাদা ইংরেজ লিখিয়ে এই বোম্বেটের কলঙ্ক ক্ষালনের জন্যে প্রাণপণে ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। আশ্চর্য!

অথচ ওই সময়কার ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা কানহোজি আংগ্রেকে জলদস্যু রূপে বর্ণনা করতে লজ্জিত হন নি। ভারতে যখন ঔরংজেবের রাজত্ব, মারাঠী নৌ-বীর কানহোজি আংগ্রের নামে তখন আরবসাগরগামী সমস্ত জাহাজ ভয়ে থরহরি কম্পমান হত। স্থলপথে ছত্রপতি শিবাজির মতন জলপথে কানহোজি আংগ্রেও ছিলেন সমান অজেয়। ইংলন্ডে জন্মালে তিনি ড্রেক বা নেলসনেরই মতো পৃথিবীজোড়া অমর নাম অর্জন করবার সুযোগ পেতেন। মোগল, ইংরেজ, ওলন্দাজ ও পর্তুগিজদের কোনও জাহাজই তাঁর কবল থেকে সহজে নিস্তার পেত না। ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিরা একসঙ্গে অনেক যুদ্ধজাহাজ নিয়ে বার বার তাঁকে আক্রমণ করেছে, কিন্তু প্রতিবারই একাকী লড়েও জলযুদ্ধে জয়ী হয়েছেন মহাবীর কানহোজি আংগ্রেই! অথচ তখন ইউরোপের পূর্বোক্ত জাতিরা স্থলযুদ্ধের চেয়ে জলযুদ্ধেই বেশি বিখ্যাত ছিলেন। বার বার পরাজিত শত্রুদের কলমে 'বোম্বেটে' বলে নিন্দিত এই অসাধারণ ভারতীয় নৌ-বীরের বীরত্বকাহিনী যে আজও এখানে ঘরে ঘরে পরিচিত হয়নি, আমাদের ঐতিহাসিকদের পক্ষে এটা অল্প কলঙ্কের কথা নয়। বাংলা ভাষায় প্রায় তিন যুগ আগে পুরাতন 'ভারতী'তে একবার কানহোজি আংগ্রে সম্বন্ধে একটি ছোট প্রবন্ধ দেখেছিলুম, তারপর আর কারুর তাঁকে মনে পড়েনি!

সাধারণ হত্যা বা দস্যুতার মধ্যে লুকোচুরি ও কাপুরুষতা আছে যতটা, বোম্বেটের কাজে যে ততটা নেই, সত্যের অনুরোধে এ কথা স্বীকার করা চলে অনায়াসেই। যে যুগে বোম্বেটেদের প্রাধান্য ছিল খুব বেশি, তখন সমুদ্রযাত্রার সময়ে প্রত্যেক জাহাজের আরোহীরাই তাদের দেখা পাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যেতেন ও সাবধান হয়ে থাকতেন এবং বোম্বেটেদের ভয়ে অধিকাংশ সওদাগরী জাহাজেও কামান-বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র রাখা হত। অনন্ত সমুদ্র,—সাধারণ খুনে বা ডাকাতের মতো বোম্বেটেরা অতর্কিতে হঠাৎ এসে আক্রমণ করতে পারত না, তাদের অনেক দূর থেকেই স্পষ্ট দেখা যেত এবং আক্রান্তরাও আত্মরক্ষা করবার সুযোগ পেত যথেষ্ট। কিন্তু তবু যে তারা বাঁচতে পারত না, তার প্রধান কারণ হচ্ছে বোম্বেটেদের সাহস ও বীরত্ব।

তবে জলদস্যুদের এত নিন্দা কেন? তাদের মূলমন্ত্র হচ্ছে, জোর যার মুল্লুক তার। এ মূলমন্ত্র সমাজের শান্তিরক্ষার পক্ষে অচল। তার উপরে সেকালকার বোম্বেটেদের নিষ্ঠুরতা ও হিংসুকতা ছিল অসম্ভব—দয়ামায়ার অস্তিত্ব পর্যন্ত তারা মানত না। অধিকাংশ সময়েই তারা কোনও জাহাজ দখল ও লুট করে সমস্ত আরোহীকেই নির্বিচারে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করত। প্রাণে মারবার আগে অনেক লোককে তারা অমানুষিক যন্ত্রণা দিতেও ছাড়ত না। তারা নরপশু ছিল বলেই তাদের সমস্ত সাহস ও বীরত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভস্মে ঘৃতাহুতির মতো। যে বীরত্বে ক্ষমা নেই, দয়া নেই, মনুষ্যত্ব নেই, তা একেবারেই উল্লেখযোগ্য নয়।

ওয়েস্ট্ ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের ফরাসি জলদস্যু লোলোনজের পাশবিক বীরত্বের কাহিনী আমরা পরে বিবৃত করব। ব্রেজিলিয়ানো নামে আর এক বোম্বেটের গল্পও আমরা পরে বলব, যা পড়তে পড়তে পাঠককে শিউরে উঠতে হবে। এ শ্রেণীর লোকের সাহস ও বীরত্ব না থাকলেই ভাল ছিল।

জলদস্যু হচ্ছে প্রাচীন যুগেরই জীব। গ্রিকদের সময়েও জলদস্যুদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। সে সময়ে সমুদ্রে বেরিয়ে এক জাহাজ যদি আর এক জাহাজকে দেখতে পেত, তাহলে সর্বাগ্রে প্রশ্ন করত, "তোমরা বোম্বেটে, না সওদাগর?" রোমানদের সময়েও গ্রিক বোম্বেটেরা দলে এত ভারি ছিল যে, ভূমধ্যসাগর দিয়ে সাধারণ জাহাজ প্রায় চলাফেরা করতে পারত না বললেই চলে।

ভূমধ্যসাগরে বোম্বেটে জাহাজের সংখ্যা তখন এক হাজারের কম ছিল না। রোমানরা শেষটা বাধ্য হয়ে বিপুল এক রণতরীর বাহিনী পাঠিয়ে এই দস্যুতা দমন করেছিল। কিন্তু এর পরেও অনেকবার জলদস্যুদের অত্যাচারে রোমকে যারপরনাই কষ্টভোগ করতে হয়েছিল। সেকালকার ইংলন্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল ও স্পেনের সমুদ্রতীরবর্তী নগরগুলি নানাদেশি বোম্বেটেদের অত্যাচারে যখন তখন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ত।

পঞ্চদশ শতাব্দীর আরম্ভে চীনারা সিংহলদেশের উপরে কি বিষম ডাকাতি করেছিল এইবারে সেই কথাই বলি। চেং হো নামে এক চীনা খোজা একবার জাহাজে চড়ে সিংহলদেশে গিয়েছিল। সেখানে বুদ্ধদেবের পবিত্র দাঁত আছে শুনে সে আব্দার ধরে বসল, তাকে ওই দাঁত উপহার দিতে হবে। বলাবাহুল্য, সিংহলের তখনকার রাজা অলগাক্কোনারা (?) তার সে অন্যায় আব্দার গ্রাহ্য করলেন না। চেং হো সেবারের মতো মুখ চুন করে খালি হাতেই চীনদেশে ফিরে গেল।

কিন্তু ১৪০৯ খ্রিস্টাব্দে বাষট্টিখানা জাহাজ নিয়ে সে আবার সিংহলদেশে আবির্ভূত হল। সিংহলের রাজার সৈন্যদের সঙ্গে চীনাদের তুমুল লড়াই লেগে গেল। সেই ফাঁকে চেং হো একদল সৈন্য নিয়ে সিংহলি সৈন্যদের চোখে ধুলো দিয়ে হঠাৎ রাজধানীতে এসে কৌশলে নগর দখল করলে এবং রাজা ও রাজপরিবারের ছেলেমেয়ে ও রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকদের বন্দি করে সটান আবার চীনদেশে গিয়ে হাজির হল। পরে রাজ্যচ্যুত রাজাকে চীনারা আবার সিংহলদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু তারপর, কিছুকাল পর্যন্ত সিংহল দেশকে চীন-সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করে কর পাঠাতে হত! এই বোম্বেটেগিরির পরে, ভারতসাগরে চীনাদের প্রভাব দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছিল।

চীনদেশেরও সমুদ্রতীরবর্তী স্থানগুলি নিরাপদ ছিল না—সেসব জায়গায় জাপানি বোম্বেটেরা সকলকে নাস্তানাবুদ করে তুলেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পর ইংরেজ ও ওলন্দাজ বোম্বেটেদের দৌরাত্ম্যেও চীনাদের বড় কম নাকাল হতে হয়নি।

আগেই বলেছি, ইংরেজরাও সেকালে বোম্বেটের ব্যবসায়ে যথেষ্ট বদনাম কিনেছিল। রানী এলিজাবেথ অনেক ইংরেজ বোম্বেটেকে নিজের নৌ-সেনাদলে ভর্তি করে নিয়েছিলেন। সে সময়ে জন স্মিথ নামে এক মহা ধড়িবাজ বোম্বেটের জ্বালায় ইংরেজরা পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিল এবং তাকে বন্দি করে ফাঁসিকাঠে লটকে দেবার জন্যে চারিদিকে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেউ তাকে ধরতে পারেনি।

এমন যে শয়তান, তারও মনে ছিল প্রচুর দেশভক্তি। হঠাৎ সে একদিন নিজেই কর্তৃপক্ষের কাছে এসে হাজির—ধরা দিলে মুক্তি নেই জেনেও। সকলেই অবাক হয়ে গেল! কিন্তু বোম্বেটে জন স্মিথ বললে, "দেশের বিপদ দেখেই আমি ধরা দিচ্ছি। সবাই প্রস্তুত হও! আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, ইংলন্ড ধ্বংস করবার জন্যে 'স্প্যানিস আর্মাডা' আসছে।" এ খবর তখনও দেশের কেউ পায়নি,—শুনেই সারা ইংলন্ডে 'সাজো সাজো' রব উঠল, সকলে যথাসময়ে

সাবধান হবার সুযোগ লাভ করলে। বলা বাহুল্য, বোম্বেটে জন স্মিথের নিঃস্বার্থ আত্মসমর্পণ ব্যর্থ হল না। কেবল শাস্তি থেকে মুক্তি নয়—সেই সঙ্গে সে যথেষ্ট পুরস্কারও লাভ করলে।

স্পেন থেকে মরক্কোয় বিতাড়িত হবার পর ষোড়শ শতাব্দীর মূররা ভয়ঙ্কর বোম্বেটে রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাদের ভয়ে ভূমধ্যসাগরের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার মতো হয়েছিল। সারা ইউরোপের শক্তি তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারেনি। প্রথমে উর্জ ও পরে তার ভাই খয়েরুদ্দিনের নামে তখনকার খ্রিস্টান নাবিকদের বুক ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যেত। কারণ মূর বোম্বেটেরা কেবল জাহাজ লুট করত না, উপরন্তু খ্রিস্টানদেরও ধরে নিয়ে গিয়ে আফ্রিকায় গোলাম করে রাখত এবং তাদের পথের কুকুরের মতো কষ্ট দিত। একবার আন্দ্রিয়া ডোরিয়া নামে এক নৌ-বীর বহু জাহাজ ও সৈন্য নিয়ে জলযুদ্ধে মূর বোম্বেটেদের হারিয়ে দেন এবং তাদের কবল থেকে বিশ হাজার খ্রিস্টান স্ত্রী-পুরুষকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন—তাদের মধ্যে ইউরোপের অনেক বড়ঘরের ছেলে-মেয়েও ছিল। কিন্তু তবু মূর বোম্বেটেরা কাবু হয়ে পড়ল না। অবশেষে কয়েক শত বৎসরের প্রাণপণ চেষ্টার পরে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, মূর জলদস্যুদের প্রতাপ দূর হয়। ইংরেজ নৌ-সেনাপতি লর্ড এক্সমাউথ ওলন্দাজদের সঙ্গে মিলে মূর বোম্বেটেদের আস্তানা ভেঙে দেন এবং তারপর ফরাসিরা আলজিয়ার্স দেশ অধিকার করলে মূররা আর মাথা তুলতে পারলে না। ইউরোপে এমন বোম্বেটের বিভীষিকা আর কখনও হয়নি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এরা কারা—কবেকার—কোথাকার?

আমরা পৃথিবীর বোম্বেটেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু এখন আমরা কেবল ইউরোপীয় বোম্বেটেদেরই গল্প বলব। প্রথমেই বলে রাখি, এই গল্পগুলির ঘটনাস্থল ইউরোপ নয়—আমেরিকা।

ঘটনাগুলি পড়বার আগে দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার মানচিত্রের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে পানামা। তার বামে প্রশান্ত মহাসাগর ও ডাইনে আটলান্টিক মহাসাগর। এখন পানামায় খাল কেটে এই দুই মহাসাগরকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যখনকার কথা বলছি (সপ্তদশ শতাব্দী) তখন এই খাল ছিল না।*

আটলান্টিক মহাসাগরের একটা অংশকে বলে ক্যারিবিয়ান সমুদ্র। তারই ভিতরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ—হাইতি, জামাইকা, কিউবা প্রভৃতি। কিউবার বামদিকে হচ্ছে মেক্সিকো উপসাগর।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে ক্যারিবিয়ান সমুদ্র দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা প্রদেশকে স্পর্শ করেছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে, তার চারিপাশের সমুদ্রবক্ষে ও নিকটবর্তী ভূভাগে ষোড়শ থেকে সপ্তদশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে রোমাঞ্চকর রক্তাক্ত নাটকের একটানা অভিনয় হয়েছিল, কাল্পনিক উপন্যাসও তার কাছে হার মানে। কিন্তু সকলের কাছে আর একটু ধৈর্য প্রার্থনা করি, কারণ

* পানামা খাল ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে কাটা হয়।

মূল গল্প শুরু করবার আগে স্থান-কাল-পাত্রের কথা আরও কিছু না বললে আসল ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে না।

সর্বপ্রথমে কলম্বাস এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। কলম্বাস নিজে স্পানিয়ার্ড ছিলেন না, কিন্তু স্পেনদেশের রানী ইসাবেলার আনুকূল্য লাভ করে এই অসমসাহসিক নাবিক নূতন দেশ আবিষ্কারের জন্য সমুদ্রযাত্রা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। অজানা সমুদ্রের উপর ক্ষুদ্র পোতে ভাসমান হয়ে, শত বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে, নিদারুণ কষ্ট সহ্য করে, তিনি ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কোনও এক অজ্ঞাতনামা দ্বীপে** উপস্থিত হয়েছিলেন; আর স্পেনদেশের রাজা ও রানির নামে দ্বীপটি দখল করে, সেখানে স্পেনের রাজপতাকা প্রোথিত করেছিলেন। কাজেই স্পানিয়ার্ডরাই সর্বপ্রথম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে দলে দলে এসে উপনিবেশ স্থাপন করবার সুবিধা পেয়েছিল। তারা কিন্তু অধিকৃত দ্বীপগুলি সব সময়ে শাসনে বা দখলে রাখতে পারত না। ফরাসি, ইংরেজ, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ প্রভৃতি জাতির দুঃসাহসিক লোকেরা মাঝে মাঝে দল বেঁধে জাহাজে চড়ে এসে ওই সকল দ্বীপে উৎপাত করত, আর এক একটা দ্বীপ বা তার খানিকটা, স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে দখল করে বসত। এই সব কাজে বোম্বেটেদের সাহায্য নিতে তারা কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করত না।

১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে একদল দুঃসাহসিক ইংরেজ ও ফরাসি জল-ডাকাতি করে টাকা রোজগার করবার জন্যে সেন্ট ক্রিস্টোফার দ্বীপে এসে আড্ডা গাড়ে। তারা স্পানিয়ার্ডদের অধিকৃত হিস্পানিওলা বা হাইতি দ্বীপে* লুটতরাজ করত, আর লুট করা শূকরের মাংস শুকিয়ে চলতি সওদাগরি জাহাজে বিক্রি করত। ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে তারা টর্টুগা দ্বীপে চলে যায়। মেক্সিকোর উপসাগরের মুখে দশটি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। সেগুলিকে টর্টুগা দ্বীপপুঞ্জ বলে। টর্টুগা দ্বীপ ও টর্টুগা দ্বীপপুঞ্জ যে এক নয়, তা মনে রাখা দরকার।

বোম্বেটেরা টর্টুগা দ্বীপে নূতন করে আড্ডা গাড়লে, ইউরোপের নানা দেশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন জাতির দুঃসাহসিক দুর্বৃত্তেরা এসে তাদের দলে ভিড়ে যেতে লাগল। এইরূপে বোম্বেটেরা দলে বেশ ভারি হয়ে উঠল। স্পানিয়ার্ডদের জাহাজ লুট করা বা তাদের দখলি দ্বীপে বা ভূভাগে এসে হানা দেওয়া তাদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল। স্পানিয়ার্ডরা অস্থির হয়ে উঠল।

সমুদ্রে ডাকাতি করে ফিরে তারা টর্টুগা দ্বীপে অথবা জামাইকা বা অন্য কোনও দ্বীপে এসে আশ্রয় গ্রহণ করত। তারপর দু'এক মাসের মধ্যেই মদ খেয়ে, জুয়া খেলে ও অন্যান্য বদখেয়ালিতে সব টাকা ফুঁকে দিয়ে তারা আবার নতুন শিকারের খোঁজে জাহাজে চড়ে বেরিয়ে পড়ত। এই সব দ্বীপের শাসনকর্তারা প্রায়ই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মতো হতেন না। বোম্বেটেরা তাঁদের সঙ্গে একটা পাকা বন্দোবস্ত করে ফেলত, নিজেদের পাপের টাকার খানিক অংশ ঘুষ দিয়ে তাঁদের মুখ বন্ধ করে রাখত। দু'একজন কড়া শাসনকর্তা তাদের যদি শাসনে রাখবার চেষ্টা করতেন, তাহলে হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াত। কারণ বোম্বেটের দল এতটা প্রবল ছিল যে, সকলে

** কলম্বাস এই দ্বীপটির নাম রেখেছিলেন 'স্যান স্যালভেডর', সম্ভবতঃ আধুনিক 'ওয়াটলিং দ্বীপ'।

* পূর্বে সমগ্র দ্বীপের নাম ছিল হাইতি বা হিস্পানিওলা। পরবর্তীকালে হাইতি দ্বীপের রাজধানী সান্টো ডোমিঙ্গোর নাম অনুসারে ওই দ্বীপের পূর্বখণ্ডের নামকরণ হয় 'সান্টো ডোমিঙ্গো' আর পশ্চিমখণ্ডের নাম 'হাইতি' থাকিয়া যায়। ম্যাপ দেখুন।

একসঙ্গে বিদ্রোহ প্রকাশ করে যেন-তেন-প্রকারেণ সাধু শাসনকর্তাকে সেখান থেকে না তাড়িয়ে ছাড়ত না। সময়ে সময়ে, শাসনকর্তা যেখানে শাসন করছেন, সেই দ্বীপ পর্যন্ত তারা কেড়ে নিত। কাজেই সাধুতা ছিল সেখানে ব্যর্থ।

ও সব দ্বীপে স্পানিয়ার্ডরাই সংখ্যায় ছিল বেশি। তাদের শূকরের ব্যবসাই ছিল প্রধান। তারা পাল পাল শূকর পুষত এবং এই সব শূকরের রক্ষিত মাংস তারা জাহাজে করে নানা দেশে চালান দিত। ওসব জায়গায় ফরাসি, ইংরেজ বা ওলন্দাজেরও অভাব ছিল না। তারা এখানে সেখানে আড্ডা গেড়ে বসবাস করত, অনেকে তামাক বা আখের চাষ করত, আবার অনেকের শিকারই ছিল ব্যবসা। স্পানিয়ার্ডরা ছিল ঘোর অত্যাচারী, তারা সুযোগ পেলে এদের উপরও অত্যাচার করতে ছাড়ত না; এরাও তাদের দু'চক্ষে দেখতে পারত না, অত্যাচারের নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিত। স্পানিয়ার্ড, ফরাসি, ইংরেজ, ওলন্দাজ—সবাই ওই সকল দ্বীপের আদিম অধিবাসী লাল মানুষদের বা আফ্রিকা থেকে চালানি নিগ্রোদের ক্রীতদাস করে রাখত।

অনেক শ্বেতাঙ্গকেও ইউরোপ থেকে লোভ দেখিয়ে, চুরি করে বা জোর-জবরদস্তি করে ধরে এনে ওসব দ্বীপে বিক্রি করা হত। শ্বেতাঙ্গরাই তাদের কিনত। কিন্তু মনিবদের অত্যাচার ছিল এত অমানুষিক যে, গোলামরা পালিয়ে গিয়ে বোম্বেটের দলে মিশে নিষ্ঠুর জঘন্য জীবন যাপন করাও বাঞ্ছনীয় বোধ করত।

তা হলেই অবস্থাটা কেমন দাঁড়িয়েছিল, দেখুন। স্পানিয়ার্ডরা অধিকাংশ দ্বীপের মালিক—তারা ঘোরতর অত্যাচারী; ক্ষেত-বাড়ির শ্বেতাঙ্গ মালিকরা অত্যাচারী, শিকারীরা অত্যাচারী; বোম্বেটেরা জলে অত্যাচারী, স্থলে অত্যাচারী; শ্বেতাঙ্গ কৃতদাসেরা প্রভুদের হুকুমে বা ব্যবহারে অত্যাচারী; লাল মানুষ বা নিগ্রো ক্রীতদাসেরা মনিবদের অত্যাচারে বা তাঁদের নিষ্ঠুর আদেশ পালনে অভ্যস্ত হয়ে অত্যাচারী। সর্বত্র অত্যাচার। শুধু অত্যাচার নয়, পাপের বীভৎস লীলা। সুরাপান, ব্যভিচার, জুয়াখেলা, লুটতরাজ, মারামারি, কাটাকাটি, খুন, জখম, অগ্নিকাণ্ড—পাপ যত মূর্তিতে প্রকাশ পেতে পারে তাই। সপ্তদশ শতাব্দীর সভ্যতার চমৎকার এক পৃষ্ঠা!

বোম্বেটেদের রীতিনীতি সম্বন্ধেও দু'চার কথা বলে নিই, কারণ পরে আর বলবার সময় হবে না।

বোম্বেটেদের কোনও নতুন দল গঠিত হলে, সমুদ্রযাত্রা করবার আগে দলের সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হত, কবে তাদের জাহাজ ছাড়বে এবং কাকে কত বারুদ ও বন্দুকের গুলি আনতে হবে। তারপর যাত্রাকালের খাবার জোগাড় করবার ব্যবস্থা হত। তাদের প্রধান খোরাক ছিল শূকর ও কচ্ছপের মাংস। বোম্বেটেরা প্রায়ই জাহাজ ছাড়বার আগে ছলে-বলে-কৌশলে শূকর সংগ্রহ করত—যথামূল্যে শূকর কেনবার জন্যে কোনওদিনই তারা আগ্রহ প্রকাশ করত না।

তারপর পরামর্শসভায় স্থির হত, শিকার জুটলে কার ভাগে কত অংশ পড়বে। অবশ্য সবচেয়ে বেশি অংশ পেত কাপ্তেন, তারপর জাহাজের ডাক্তার। ছুতারমিস্ত্রীও অন্য লোকের চেয়ে বেশি অংশ লাভ করত। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও স্থির থাকত যে শিকার না জুটলে কারুর ভাগ্যে কিছুই জুটবে না।

যুদ্ধবিগ্রহে কেউ মারা পড়লে বা কারুর অঙ্গহানি হলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকত। সবচেয়ে বেশি দাম ছিল ডান হাতের। তারপর যথাক্রমে বাম হাত, ডান পা ও বাম পায়ের দাম। সর্বশেষে, একটা চোখ বা হাতের বা একটা আঙুলের দাম ছিল সমান!

নিজেদের ভিতরে তাদের রীতিমতো একটা বোঝাপড়া ছিল। তাদের প্রত্যেককেই শপথ করতে হত যে, দল ছেড়ে সে পালাবে না বা লুটতরাজের কোনও জিনিসও দলের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবে না। কেউ অবিশ্বাসী হলে তখনই তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হত।

এমন যে অমানুষ ও হিংস্র পশুর দল, কিন্তু দলের ভিতরে তাদেরও পরস্পরের সঙ্গে স্নেহ, প্রেম ও সদ্ভাব ছিল যথেষ্ট। একের দুঃখকষ্টে অন্যে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করত তো বটেই, উপরন্তু সেই দুঃখকষ্ট দূর করবার জন্য টাকা দিয়ে দেহ দিয়ে যে কোনরকম সাহায্য করতেও নারাজ হত না।

আমরা অতঃপর গল্প শুরু করব। কিন্তু এই গল্প প্রধানত যাঁর বই থেকে নেওয়া হয়েছে তাঁরও পরিচয় দেওয়া দরকার। তাঁর নাম হচ্ছে আলেক্স অলিভিয়ার এক্সকুইমেলিন, জাতে তিনি ওলন্দাজ। তিনি ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। এক্সকুইমেলিন সাহেব আগে নিজেও একজন বোম্বেটে ছিলেন এবং এই পুস্তকে বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনাই তাঁর চোখের সামনেই ঘটেছিল। কোনও কোনও ঘটনা, ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল এমন সব বোম্বেটের মুখে তিনি নিজের কাণে শ্রবণ করেছিলেন। তিনি যা দেখেছেন ও যা শুনেছেন সমস্তই হুবহু লিখে ১৬৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। সে পুস্তকের এত আদর হয়েছিল যে, ইউরোপের অধিকাংশ ভাষাতেই তার অনুবাদ দেখা যায় এবং এতকাল পরেও তাঁর পুস্তকের নূতন সংস্করণ হচ্ছে। বোম্বেটের নিজের মুখেই বোম্বেটের কাহিনী শুনতে কার না আগ্রহ হয়? আর এক্সকুইমেলিন সাহেবের পক্ষে বিশেষ প্রশংসার কথা হচ্ছে এই যে, কোনও অন্যায়কেই কোথাও তিনি গোপন করেননি বা ফেনানো ভাষার আড়ালে অস্পষ্ট করে তোলবার চেষ্টা করেননি। তাঁর ভাষা সহজ ও সরল। এইজন্যেই তাঁর কথিত কাহিনীগুলির ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য নয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'পিটার দি গ্রেট'—বোম্বেটের আদিপুরুষ

টর্টুগা দ্বীপে সর্বপ্রথমে যে জলদস্যু বিশেষ নামজাদা হয়, জাতে সে ফরাসি। তার নাম ছিল ইংরেজিতে 'পিটার দি গ্রেট'। সে একলা নিজের বুদ্ধিতে জনকয় লোকের সাহায্যে যে অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল, তাইতেই তার ডাকনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

একদিন সে একখানা বড় নৌকোয় চড়ে হাইতি দ্বীপের কাছে সমুদ্রে শিকারের সন্ধানে ফিরছিল এবং তার সঙ্গে ছিল আটাশজন বোম্বেটে।

কয়েকদিন ধরে শিকারের অভাব, নৌকোয় খাবার ফুরিয়ে এল বলে। সকলকার মন বড় খারাপ,—পেট চলবে কেমন করে?

এমন সময়ে সমুদ্রের বুকে দেখা গেল, স্পেনের এক 'ফ্লোটা'। ফ্লোটা হচ্ছে অনেকগুলো বড় বড় জাহাজের সমষ্টি এবং তাদের কাজ হচ্ছে ইউরোপের জিনিস আমেরিকার বন্দরে আনা ও আমেরিকার মাল ইউরোপে নিয়ে যাওয়া।

দেখা গেল, মস্ত একখানা জাহাজ 'ফ্লোটা'র দলছাড়া হয়ে অনেক দূরে এগিয়ে পড়েছে।

পিটার তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। সে বললে, "ভাই সব! যা থাকে কপালে! ওই দলছাড়া জাহাজখানাকে আমরা আজ দখল করবই করব!"

পিটার অসম্ভব কথা বললে। একখানা নৌকো, উনত্রিশজন মাত্র তার আরোহী! এরই জোরে শত শত লোকের সঙ্গে লড়াই করে অতবড় জাহাজ দখল করা আর লতা দিয়ে হাতি বাঁধবার চেষ্টা করা একই কথা।

কিন্তু পিটারের দলের লোকেরাও আসন্ন অনাহারের সম্ভাবনায় তারই মতন মরিয়া। তারাও পিটারের কথায় সায় দিয়ে বললে, "তাই সই, সর্দার!"

নৌকো বেয়ে জাহাজের কাছে এসে বোম্বেটেরা বুঝলে, দিনের আলোয় এমন অসাধ্যসাধন করা একেবারেই অসম্ভব। জাহাজের লোকরা একবার দেখতে পেলে মরণের মুখ থেকে তাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না। অতএব তারা বুদ্ধিমানের মতো সন্ধ্যার অন্ধকারের অপেক্ষা করতে লাগল।

সন্ধ্যা এল।

পিটার বললে, "আমাদের নৌকোর তলায় ছ্যাঁদা করে দিই এস! সেই ছ্যাঁদা দিয়ে জল ঢুকে আমাদের নৌকোখানাকে ডুবিয়ে দিক। এই অকূল সমুদ্রে নৌকো ডুবে গেলে আমাদের আর বাঁচবার কি পালাবার কোনও উপায়ই থাকবে না। তাহলে আমরা আরও বেশি মরিয়া হয়ে লড়তে পারব আর আরও তাড়াতাড়ি জাহাজে ওঠবার জন্যে চেষ্টা করব। অত বড় জাহাজ আমাদের পক্ষে এখন ভয়ের কারণ বটে। কিন্তু তখন ওই জাহাজকেই মনে করব আমাদের একমাত্র আশ্রয়!"

তখনই এই অদ্ভুত প্রস্তাব অনুসারে কাজ করা হল। ছ্যাঁদা করা নৌকো ধীরে ধীরে অতলে তলিয়ে যেতে আরম্ভ করল।

কিন্তু তার আগেই সাঁঝের আবছায়ায় গা ঢেকে বোম্বেটেরা চুপিচুপি একে একে জাহাজের উপর উঠতে লাগল—ছায়ামূর্তির সারির মতো। তাদের প্রত্যেকেরই কাছে একটি করে পিস্তল ও একখানা করে তরবারি ছাড়া আর কোনও অস্ত্র নেই!

জাহাজের এক কামরায় বসে কাপ্তেন ও আরও কয়েকজন লোক নিশ্চিন্ত আরামে তাস খেলছিলেন।

আচম্বিতে একটা লোক কামরায় ঢুকে কাপ্তেনের বুকের উপরে পিস্তল ধরে বললে, "একটু নড়েচ কি গুলি করেচি!"

কাপ্তেন একেবারে থ। এ যে বিনামেঘে বজ্রাঘাত!

কাপ্তেনের অন্যান্য সঙ্গীরা সচকিতকণ্ঠে বলে উঠল, "যীশু আমাদের রক্ষা করুন! কে এরা! কোত্থেকে এল? এরা কি সাক্ষাৎ শয়তান!"

ততক্ষণে পিস্তল বাগিয়ে ও তরবারি উঁচিয়ে আরও কয়েকজন বোম্বেটে কামরায় এসে হাজির হয়েছে এবং দলের বাকি কয়েকজন লোক সর্বাগ্রে গিয়ে জাহাজের অস্ত্রশালা দখল করে

বসেছে! কেউই এই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, যারা বাধা দেবার চেষ্টা করলে তাদের প্রত্যেককেই মরতে হল!

তখন জাহাজের বাকি সকলেই ভয়ে ভয়ে বোম্বেটেদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে!

পরে শোনা গেল, সন্ধ্যার আগে কেউ কেউ নৌকোখানাকে দেখতে পেয়ে নাকি বলেছিল, "ওখানা বোম্বেটে-নৌকো!"

জবাবে কাপ্তেন বুক ফুলিয়ে বলেছিলেন, "বয়ে গেল! আমার এত বড় জাহাজ, এত লোকবল, আমি কি ওই ক্ষুদে পিঁপড়ের মতো নৌকোখানাকে দেখে ভয় পাব? আমার জাহাজের সমান জাহাজ এলেও আমি থোড়াই কেয়ার করি।"

জাহাজের জনকয় মাহিনা করা নাবিককে দলে রেখে, পিটার বাকি সবাইকে ডাঙায় নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিলে। তারপর সেই মূল্যবান মালে বোঝাই সুবৃহৎ জাহাজ নিয়ে ফ্রান্সের দিকে যাত্রা করলে। পিটার আর কখনও আমেরিকায় ফিরে আসেনি।

টর্টুগার যে সব লোক স্পানিয়ার্ডদের অত্যাচারে অবিচারে কাবু হয়ে হাহাকার করছিল, তারা যখন পিটারের এই অদ্ভুত বিজয়কাহিনী ও অপূর্ব সম্পদ লাভের কথা শুনলে, তখন একবাক্যে বিপুল উৎসাহে বলে উঠল, "আমরাও তবে বোম্বেটে হব,—স্পানিয়ার্ডদের ওপরে প্রতিশোধ নেব!"

কিন্তু জল-ডাকাত হতে গেলে আগে দরকার অন্তত একখানা করে ছোট জাহাজ বা একখানা করে বড় নৌকো। তার মূল্য কে দেয়? ভেবেচিন্তে তারা উপায় আবিষ্কার করলে।

বন্দরে বন্দরে স্পানিয়ার্ডরা ছোট ছোট নৌকো করে চামড়া ও তামাক প্রভৃতি সংগ্রহ করত। তারপর তারা সেই সব মাল নিয়ে হাভানা শহরে গিয়ে হাজির হত। কারণ ইউরোপ থেকে স্পানিয়ার্ডরা সেইখানেই ব্যবসা করতে আসত।

নতুন বোম্বেটেরা দল পাকিয়ে সেই সব মালবোঝাই জাহাজ স্পানিয়ার্ডদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে আরম্ভ করলে। তারপর সেই লুটের মাল বেচে তারা বড় বোম্বেটে হবার মূলধন সংগ্রহ করে ফেললে। ব্যাপারটা শুনতে খুব সোজা বটে, কিন্তু এর জন্যে বড় কম মারামারি, রক্তপাত ও নরহত্যা হল না।

তার মাস খানেক পরেই স্পেনদেশিয় ব্যবসায়ীদের বড় বড় দু'খানা জাহাজ বোম্বেটেদের হাতে ধরা পড়ল—সে জাহাজ দু'খানার ভিতরে ছিল প্রচুর সোনা ও রুপো।

টর্টুগার যে সব লোক তখনও নতমাথায় অত্যাচার সহ্য করছিল, তারাও আর লোভ সামলাতে পারলে না, তারাও বোম্বেটেদের দলে যোগ দিলে! বছর দুইয়ের মধ্যেই লুটের ঐশ্বর্যে টর্টুগারও যেমন শ্রীবৃদ্ধি হল, ব্যাঙের ছাতার মতো বোম্বেটের দলও তেমনই বাড়তে লাগল! তখন এই দ্বীপটি একরকম বোম্বেটেদেরই স্বর্গ হয়ে দাঁড়াল—স্পানিয়ার্ডরা সেখান থেকে একেবারেই পিট্টান দিতে বাধ্য হল!

দেখতে দেখতে টর্টুগা দ্বীপে বোম্বেটে জাহাজের সংখ্যা হয়ে দাঁড়াল কুড়িখানারও বেশি।

বুকে বসে এই দাড়ি ওপড়ানো স্পানিয়ার্ডরা আর সইতে পারলে না, দেশে—অর্থাৎ স্পেনে খবর পাঠিয়ে আত্মরক্ষা ও বোম্বেটে দমন করবার জন্যে প্রকাণ্ড দু'খানা যুদ্ধজাহাজ আনাবার বন্দোবস্ত করলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পর্তুগিজ ও ব্রেজিলিয়ানো

এ অঞ্চলে এক বোম্বেটে ছিল, তার নাম বার্থোলোমিউ পর্তুগিজ। নাম শুনেই বোঝা যায় তার জন্ম পর্তুগালে। সবাই তাকে পর্তুগিজ বলে ডাকত। এর কাহিনী 'পিটার দি গ্রেটে'র চেয়েও বিচিত্র।

জামাইকা দ্বীপের কাছে সে একখানা বজরা নিয়ে শিকার অন্বেষণ করছিল। তার সঙ্গে ছিল চারটে ছোট কামান ও ত্রিশজন লোক।

সমুদ্রের মাঝখানে একখানা প্রকাণ্ড জাহাজ দেখতে পেয়ে পর্তুগিজ তার কাছে বজরা নিয়ে গেল।

সে বড় যে-সে জাহাজ নয়। তার ওপরে আছে কুড়িটা মস্ত মস্ত কামান ও সত্তর জন যোদ্ধা। আর আছে অনেক যাত্রী ও নাবিক।

কিন্তু পর্তুগিজ জানত না ভয় কাকে বলে। চারটে পুঁচকে কামান, ত্রিশজন মাত্র লোক ও বজরা নিয়েই সে সেই জাহাজখানাকে আক্রমণ করলে। প্রথম আক্রমণ সফল হল না। পর্তুগিজকে পিছনে হটে আসতে হল।

তারপর খানিক বিশ্রাম করে সে আবার সতেজে আক্রমণ করলে। আবার বড় বড় কামানের গোলা হজম করতে না পেরে সে পিছিয়ে এল। তার খানিক পরে আবার আক্রমণ! এমনই বারবার আক্রমণ ও সুকৌশলে অথচ সতেজে যুদ্ধ করে অনেকক্ষণ পরে পর্তুগিজ সত্যসত্যই সেই প্রকাণ্ড জাহাজখানাকে দখল করে ফেললে!

কিন্তু তার এত বীরত্বও ব্যর্থ হল। কারণ সেই বিজিত জাহাজখানাকে নিয়ে খানিক দূর এগুতে না এগুতেই, আচম্বিতে দৈবগতিকে স্পানিয়ার্ডদের আরও তিনখানা প্রকাণ্ড জাহাজের আবির্ভাব হল। পর্তুগিজ এদের সঙ্গে আর পাল্লা দিতে পারলে না—জয়ের আনন্দ ভাল করে ভোগ করতে না করতেই সদলবলে তাকে বন্দি হতে হল!

একটু পরেই উঠল বেজায় ঝড়। যে বিরাট জাহাজে বোম্বেটেরা বন্দি হয়ে ছিল, সেখানা অন্য জাহাজগুলোর সঙ্গ হারিয়ে অনেক কষ্টে একটা বন্দরে গিয়ে আশ্রয় নিলে।

বন্দরের কয়েকজন বড় ব্যবসায়ী জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে দেখা করতে এসে বন্দি পর্তুগিজকে দেখেই ত্রস্তস্বরে বলে উঠল, "এ বদমাইশ বোম্বেটেকে আমরা চিনি! এ যে পর্তুগিজ! এ যে আমাদের অনেক সর্বনাশ করেছে, অনেক লোক খুন করেছে!"

যে শহরের বন্দরে জাহাজ থেমেছিল, সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট বোম্বেটেদের ডাঙায় পাঠাতে হুকুম দিলেন। কেবল পর্তুগিজকে পাঠাতে নিষেধ করলেন—পাছে সেই ফাঁকে কোনগতিকে সে পালিয়ে যায়, কারণ কিছুদিন আগে এই শহরেরই জেল ভেঙে সে লম্বা দিয়েছিল। তার জন্যে জাহাজের ওপরেই ফাঁসিকাঠ খাড়া করা হল। পরদিন সকালেই তাকে লটকে দেওয়া হবে।

এই চমৎকার সুখবরটি পর্তুগিজকে ঘটা করে শোনানো হল। শুনে সে যে খুশি হয়ে হাসেনি, সেটা আর না বললেও চলে।

জাহাজে তাকে যেখানে রাখা হয়েছিল, সেখানে বড় বড় দু'টো মাটির খালি জালা ছিল—এই জালায় স্পানিয়ার্ডরা মদ রাখত। পর্তুগিজ একটুও সাঁতার জানত না, কাজেই জলে লাফিয়ে পড়ে সে যে সাঁতরে পালাবে, তারও উপায় নেই। অথচ কাল পৃথিবীর সূর্যোদয়ের সঙ্গেই তার জীবনের সূর্যাস্ত! ফাঁসিকাঠে দোল খাবার শখ তার মোটেই ছিল না। কোনওরকমে সে মাটির জালা দু'টোর মুখ এঁটে বন্ধ করলে। তারপর চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে রইল নেহাৎ ভালমানুষটির মতো। তার আচরণের কারণ কেউ বুঝতে পারলে না।

রাত হল। সেপাই বন্দুক ঘাড়ে করে বসে বসে ঢুলছে।

হঠাৎ পর্তুগিজ বাঘের মতো তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেউ কিছু টের পাবার আগেই সেপাই ইহলোক থেকে বিদায় নিলে।

পর্তুগিজ জালাদুটো জলে নামিয়ে দিয়ে নিজেও জাহাজ ত্যাগ করলে। মুখবন্ধ করা জালা জলে ভাসতে লাগল। পর্তুগিজ তাদের উপরে ভর দিয়ে ভাসতে ভাসতে ডাঙায় গিয়ে উঠল। তারপর গভীর অরণ্যে ঢুকে একটা গাছের কোটরে লুকিয়ে বসে রইল—কারণ সকাল হতে দেরি ছিল না।

সকাল। কর্তৃপক্ষ জাহাজে এলেন—একটা জাঁহাবাজ বোম্বেটেকে নিশ্চিন্তপুরে পাঠাবার জন্য। কিন্তু দেখা গেল, ফাঁসিকাঠে যে দুলবে সে অদৃশ্য!

চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব উঠল। দলে দলে লোক বন তোলপাড় করে খুঁজে দেখলে, কিন্তু পর্তুগিজের দেখা না পেয়ে হতাশভাবে ফিরে এল।

পর্তুগিজ তখন জঙ্গল ভেঙে চলতে শুরু করেছে। সমুদ্রের ধারে পাথর উলটে 'সেল' মাছ কুড়িয়ে এনে কোনরকমে পেটের জ্বালা নিবারণ করে। কাছে ছিল শুকনো লাউয়ের খোল, আর তাতে একটুখানি জল,—তাতেই তেষ্টা মেটায়। এইভাবে একশ কুড়ি মাইল পথ পার হল!

পথের মাঝে মাঝে নদী পড়েছে—অথচ সে সাঁতার জানে না। কেমন করে সে বাধা দূর করলে, তাও বড় কম আশ্চর্য কথা নয়!

সমুদ্রের ধারে জাহাজ ভাঙা একখানা তক্তা পাওয়া গেল, তার গায়ে বেঁধানো ছিল গোটাকয়েক মস্তবড় পেরেক বা হুক। সে বসে বসে পাথরের উপরে ঘষে ঘষে পেরেকের গায়ে অনেকটা ছুরির মতো ধার করলে। তারপর সেই অদ্ভুত ছুরির সাহায্যে গাছের ডালপালা কেটে ছোটখাট ভেলার মতো একটা কিছু বানিয়ে গভীর নদী পার হল। আপনারা অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন, এ রূপকথা? না, এ সম্পূর্ণ সত্য কথা!

একশ কুড়ি মাইল পথ পেরিয়ে পর্তুগিজ একদল চেনা বোম্বেটের দেখা পেলে। ইতিমধ্যে চোদ্দদিন কেটে গেছে।

বন্ধুদের কাছে নিজের বিপদের গল্প বললে। শুনে তারা যে তাকে খুব বাহাদুরি দিয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পর্তুগিজ বললে, "ভাই, আমাকে একখানা নৌকো আর কুড়িজন লোক দাও। আমি প্রতিশোধ নেব।"

তারা আপত্তি করলে না।

আট দিন পরে সেই আশ্চর্য সাহসী পর্তুগিজ কুড়িজন সঙ্গীর সঙ্গে যে জাহাজে বন্দি হয়েছিল, যার ওপরে এখনও তার জন্যে আনা ফাঁসিকাঠ দাঁড়িয়ে আছে, আবার তার কাছেই বুক ফুলিয়ে ফিরে এল এবং অতর্কিতে আক্রমণ করে সেই প্রকাণ্ড জাহাজখানাকে আবার বন্দি করে ফেললে! উপন্যাসেও এমন বিচিত্র কাহিনী পড়া যায় না!

কিন্তু নিয়তি আবার তাকে নিষ্ঠুর পরিহাস করলে! প্রাণের ভয় থেকে এখন সে মুক্ত এবং মাল বোঝাই জাহাজ পেয়ে এখন সে ধনবান! কিন্তু তার আনন্দ বেশি দিন স্থায়ী হল না। ভবিষ্যতের অনেক সুখ-সৌভাগ্যের কল্পনা করতে করতে দিনকয় মস্ত জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে সে ঘুরে বেড়ালে—কিন্তু তারপরেই দুর্ভাগ্য আবার ঝড়ের মূর্তিতে এসে পর্তুগিজের এই নতুন পাওয়া ঐশ্বর্যকে পাতালের অতল তলে তলিয়ে দিলে! সঙ্গীদের নিয়ে একখানা ডিঙিতে চড়ে সে প্রাণে বাঁচল বটে, কিন্তু আবার সে গরিব—নিছক গরিব!

সে জামাইকা দ্বীপে এসে উঠল। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তার ওপরে আর কোনদিন প্রসন্ন হননি। তার এত বুদ্ধি, সাহস ও বীরত্বও আর কোনও কাজে লাগল না। অবশ্য এ সব দুষ্প্রাপ্য গুণ আজীবনই তার কাজে লাগত, যদি সে অসৎ পথ অবলম্বন না করত। পর্তুগিজ যদি সত্যিকার মানুষ হত, তাহলে মরণের পরেও সে আজ মরত না, হয়তো পৃথিবীতে দেশে দেশে চিরস্মরণীয় হয়েই থাকতে পারত।

আর একজন বোম্বেটেও ওই সময়ে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। অনেককাল ব্রেজিলে বাস করেছিল বলে তার নাম হয়েছিল ব্রেজিলিয়ানো।

জলদস্যুর দলে ঢুকে প্রথমে সে সাধারণ বোম্বেটেরই মতন নিম্নশ্রেণীতে কাজ করত। কিন্তু নিজের প্রকৃতি ও বুদ্ধির গুণে সে শীঘ্রই সকলের স্নেহের ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠল।

যে দলে সে ছিল তার কাপ্তেনের সঙ্গে একবার সেই দলের অনেকের মনোমালিন্য হয়। তারা তখন দল ছেড়ে চলে এল এবং সকলের সম্মতি অনুসারে ব্রেজিলিয়ানোই দলপতি বা কাপ্তেনের পদ লাভ করলে।

নতুন কাপ্তেন দিনকয়েক পরেই নিজের বুদ্ধি ও শক্তির পরিচয় দিলে। আমেরিকায় তখন অনেক সোনা, রুপো ও অন্যান্য দামী ধাতু পাওয়া যেত। স্পানিয়ার্ডরা সেই সব ধাতুর 'বার' বা তাল জাহাজে চাপিয়ে স্পেনে চালান দিত। এমনই সোনা-রুপোর তাল নিয়ে একখানা মস্ত জাহাজ স্পেনে বা অন্য কোথাও যাচ্ছিল, ব্রেজিলিয়ানো হঠাৎ তাকে ধরে ফেললে। স্পানিয়ার্ডরা যথাসাধ্য বাধা দিয়েও কিছু করে উঠতে পারলে না। ব্রেজিলিয়ানো বামাল সমেত সেই জাহাজখানাকে গ্রেপ্তার করে জামাইকা দ্বীপে এসে উঠল। তার নামে চারিদিকে 'ধন্য ধন্য' পড়ে গেল!

কিন্তু ব্রেজিলিয়ানো ছিল যেমন মাতাল, তেমনই গোঁয়ার ও নির্দয়। যখন সে ছুটি নিয়ে ডাঙায় এসে ফূর্তি করত, তখন কেউ তার সামনে দাঁড়াতে ভরসা করত না। মদ খেয়ে রাজপথে হুল্লোড় করে বেড়াবার সময়ে যাকে সমুখে পেত তাকেই মেরে-ধরে হাড় গুঁড়িয়ে দিত। তার গায়েও ছিল অসুরের মতো ক্ষমতা, তাই কেউ বাধা দিতে বা প্রতিবাদ করতেও সাহস করত না।

সময়ে সময়ে এক পিপে মদ নিয়ে রাস্তার ওপরে বসে থাকত। সামনে দিয়ে কোনও পথিক গেলেই ডেকে বলত—"এসো ভায়া, আমার সঙ্গ মদ খেয়ে ফূর্তি করে যাও!" পথিক

যদি বলত, "না, আমি মদ খাব না!"—তাহলেই আর রক্ষে নেই, ব্রেজিলিয়ানো অমনই পিস্তল বার করে বলত, "মদ খাবে, না খাবি খাবে?"

কখনও কখনও তার আর এক খেয়াল হত। রাস্তা দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ কেউ গেলেই সে তাদের জামাকাপড়ে সর্বাঙ্গে হুড়হুড় করে মদ ঢেলে দিত!

স্পানিয়ার্ডদের ওপরে ছিল তার বিষম আক্রোশ। একবার সে শূকর চুরি করতে যায়। কিন্তু চুরি করতে না পেরে কয়েকজন স্পানিয়ার্ডকে ধরে শুধোলে, "তোমরা কোথায় শূওর লুকিয়ে রেখেছ বলো।"

তারা বললে, "শূওরের সন্ধান আমরা জানি না।"

ব্রেজিলিয়ানো দু'চোখ পাকিয়ে বললে, "কী জান না? রোসো, দেখো তবে মজাটা! ওরে, এদের ধরে রোস্ট বানিয়ে ফ্যাল তো! শূওর যখন পেলুম না তখন মানুষেরই রোস্ট হোক!"

সাহেবরা মাংসের মধ্যে কাঠের শলাকা বিঁধিয়ে আগুনের আঁচে রেখে রোস্ট তৈরি করে। ব্রেজিলিয়ানোর চ্যালারা তখনই সেই হতভাগ্য স্পানিয়ার্ডদের জীবন্ত দেহের ভিতরে পড় পড় করে কাঠের শলা চালিয়ে দিলে এবং জীবন্ত অবস্থাতেই তাদের দেহগুলোকে আগুনের ওপর ঝুলিয়ে রাখলে। ধীরে ধীরে তাদের জ্যান্ত দেহগুলো আগুনের আঁচে সিদ্ধ হতে লাগল।

অভাগাদের পরিত্রাহি চিৎকারে আকাশ পর্যন্ত কেঁপে উঠল, কিন্তু ব্রেজিলিয়ানোর মন তাতে একটুও গলল না—সে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই আর্তনাদ শুনতে লাগল, যেন খুব মিষ্টি গানই শুনছে!

একদিন ঝড়ে তার জাহাজ ডুবে গেল—ঝড়ে জাহাজ ডুবে যাওয়া ছিল তখনকার কালে খুব সহজ ব্যাপার। ব্রেজিলিয়ানো সঙ্গীদের নিয়ে একখানা নৌকোয় চড়ে কোনওরকমে ডাঙায় এসে উঠল। কিন্তু সেখানেও আবার নূতন বিপদ! দেখা গেল, একশ জন বন্দুকধারী ঘোড়সওয়ার স্পানিয়ার্ড তাদের দিকে আবার এক নতুন ঝড়ের মতন বেগে তেড়ে আসছে! বোম্বেটেদের সংখ্যা ত্রিশজনের বেশি নয়! তিনগুণেরও বেশি লোকের সঙ্গে কেউ কখনও যুঝতে পারে? এবারে ব্রেজিলিয়ানোর লীলাখেলা বুঝি সাঙ্গ হয়!

অন্য কেউ হলে তখনই বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করত। কিন্তু ব্রেজিলিয়ানো দমবার পাত্র নয়। সে দলের লোকদের ডেকে নির্ভয়ে বললে, "ভাই সব! স্পানিয়ার্ড কুকুররা তেড়ে আসছে—আসুক! ওরা বাগে পেলে আমাদের ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করবে! আমরা হচ্ছি বীর সৈনিক,—এসো আমরা লড়াই করতে করতে বীরের মতন মরি!"

লড়াই শুরু হল—বোম্বেটেরা সবাই মরতে প্রস্তুত! এখন মরবার আগে যে যত শত্রু নিপাত করতে পারে, তারই তত বাহাদুরি! বোম্বেটেরা এমন আশ্চর্যভাবে লক্ষ্যস্থির করে বন্দুক ছুড়তে লাগল যে, প্রায় প্রত্যেক গুলিতেই এক একজন ঘোড়সওয়ারের পতন হয়! স্পানিয়ার্ডরা আর কাছে আসতে সাহস পেলে না, দূর থেকেই যুদ্ধ করতে লাগল।

এক ঘণ্টা লড়াই চলল। শেষটা বোম্বেটেদের গরমাগরম গুলি আর হজম করতে না পেরে স্পানিয়ার্ডরা ভয়ে পিট্টান দিলে। তাদের প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন লোক হত বা আহত হয়ে মাটির ওপরে ছড়িয়ে পড়ে রইল। যারা তখনও বেঁচে ছিল, বোম্বেটেরা বন্দুকের কুঁদো

দিয়ে মাথার খুলি ফাটিয়ে তাদেরও ভবযন্ত্রণা শেষ করে দিলে। বোম্বেটেদের দলে হত হয়েছিল দু'জন ও আহত হয়েছিল দু'জন মাত্র লোক!

বোম্বেটেরা তখন স্পানিয়ার্ডদের সওয়ারহীন ঘোড়াগুলোর পিঠে চেপে জয় জয় নাদে নতুন শিকারের খোঁজে যাত্রা করলে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মারি তো গণ্ডার

এইবারে আমরা যে ভয়ঙ্কর ও অতুলনীয় বোম্বেটের কথা আরম্ভ করব, তার নাম হচ্ছে ফ্রান্সিস্ লোলোনেজ। জাতে ফরাসি। রোমাঞ্চকর তার কাহিনী।

ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত হয়ে সে ওয়েস্ট ইন্ডিজে আসে। মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে পর ছাড়া পায়। কিন্তু তারপর সে আর স্বদেশে ফিরে না গিয়ে হাইতি দ্বীপে এসে আশ্রয় নেয়। প্রথমে হয় শিকারি, তারপর বোম্বেটে। তার ভবিষ্যৎ জীবন কি ভয়াবহ হবে এবং সে যে কত প্রলয়-কাণ্ডের অনুষ্ঠান করবে, কর্তৃপক্ষ যদি তা কল্পনাও করতে পারতেন, তাহলে কখনই তাকে মুক্তি ও স্বাধীনতা দিতেন না। বোম্বেটেরূপে সে হয়ে উঠেছিল মূর্তিমান নরপিশাচ! অথচ তার সাহস, বুদ্ধি, বীরত্ব, উৎসাহ ও উদ্যম ছিল অসাধারণ। মানুষ এইসব দুর্লভ গুণের জন্যে আজন্ম সাধনা করে। কিন্তু অপাত্রে এইসব গুণ যে কতটা সাংঘাতিক হতে পারে, লোলোনেজ হচ্ছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

টর্টুগা দ্বীপ তখন ফরাসিদের অধিকারে এসেছে। সেখানকার লাটও ফরাসি। তখন স্পানিয়ার্ডদের সঙ্গে ফরাসিদের সম্পর্ক ছিল সাপ আর নেউলের সম্পর্ক।

আগেই বলেছি, এখানকার লাটেরা প্রায়ই সাধু মানুষ হতেন না, তাঁরা নিজেরাই বোম্বেটে পুষতেন। টর্টুগার ফরাসি লাট লোলোনেজকে বুদ্ধিমান ও সাহসী দেখে তার উপরে দয়া করলেন। অর্থাৎ তাকে একখানা জাহাজ ও লোকজন দিয়ে কাপ্তেন করে দিলেন। তারপর কাপ্তেন লোলোনেজ সমুদ্রের নীলজলে নিজের অদৃষ্ট পরীক্ষা করতে বেরুল। কিন্তু সে-ও যদি তখন নিজের ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে পারত, তাহলে সভয়ে এ পথ ছেড়ে ফিরে আসত। অদৃষ্টকে আগে থাকতে দেখা গেলে পৃথিবীর অনেক দুঃখই ঘুচে যেত—মানুষ এমন অন্ধের মতো বিপথে ঘুরে মরত না।

প্রথম কিছুকাল বেশ সুখেই কাটল। লোলোনেজ উপরি উপরি স্পানিয়ার্ডদের কয়েকখানা ধনরত্নে ও বাণিজ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ জাহাজ দখল করে ডাকসাইটে নাম কিনে ফেললে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্পানিয়ার্ডদের ওপরে তার ভীষণ নিষ্ঠুরতার কাহিনীও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল—তারা বুঝলে, আবার এক মারাত্মক আপদের আবির্ভাব হয়েছে। তখন তারাও মরিয়া হয়ে উঠল! লোলোনেজ তাদের আক্রমণ করলে তারা আর সহজে আত্মসমর্পণ করতে চাইত না—কারণ তারা বুঝে নিয়েছিল যে লোলোনেজের কাছে তাদের ক্ষমা নেই, সে তাদের কয়েদ করতে পারলে বিষম যন্ত্রণা দিয়ে প্রাণবধ না করে ছাড়বে না। তার চেয়ে লড়াই করে বা জলে ডুবে মরা ঢের ভাল!

তারপরই লোলোনেজ অদৃষ্টের কাছ থেকে প্রথম ধমক খেলে। আচম্বিতে একদিন নাবিকদের সবচেয়ে বড় শত্রু ঝড় এসে তার জাহাজ ডুবিয়ে দিলে। সে আর তার সঙ্গীরা সমুদ্রের কবল থেকে কোনগতিকে বাঁচল বটে, কিন্তু ব্রেজিলিয়ানোর মতো সেও তীরে উঠে স্তম্ভিত নেত্রে দেখলে, দলে দলে স্পানিয়ার্ড অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তেড়ে আসছে দলবদ্ধ যমের মতো!

যুদ্ধ হল। কিন্তু শত্রুরা দলে এত ভারি ছিল যে, লোলোনেজের সঙ্গীরা অধিকাংশই প্রাণ হারালে—যারা বাঁচল, বন্দি হল।

লোলোনেজও আহত হল, কিন্তু চালাকির জোরে শত্রুদের চোখে ধুলো দিলে। নিজের ক্ষতের রক্তের সঙ্গে তাড়াতাড়ি সমুদ্র তীরের বালি মিশিয়ে সে তার মুখে ও দেহের নানা জায়গায় মাখিয়ে ফেললে এবং বোম্বেটেদের মৃতদেহের সঙ্গে মিশিয়ে মড়ার মতো মাটিতে পড়ে রইল। শত্রুরা তাকে মৃত মনে করে চলে গেল।

লোলোনেজ তখন উঠে বনের ভিতর গিয়ে ঢুকল। আগে নিজের দেহের ক্ষতস্থানগুলো যেমন তেমন করে ব্যান্ডেজ করে ফেললে। তারপর এক শহরে গিয়ে স্পানিয়ার্ডের ছদ্মবেশ গ্রহণ করলে।

স্পানিয়ার্ডরা অনেক ক্রীতদাস রাখত। কয়েকজন ক্রীতদাসের সঙ্গে তার আলাপ হল এবং দিনকয়েকের ভিতরেই সে আলাপ জমিয়ে তুলল রীতিমতো।

সে তাদের বললে, "তোমরা যদি আমার কথা শোনো, তাহলে আমি তোমাদের স্বাধীন করে দেব। তোমাদের মনিবের একখানা নৌকো চুরি করে আমার সঙ্গে চলো,—আমি তোমাদের রক্ষা করব।"

অবশেষে তারা রাজি হয়ে গেল। এবং একখানা নৌকো চুরি করে লোলোনেজের সঙ্গে জলপথে বেরিয়ে পড়ল।

ওদিকে স্পানিয়ার্ডরা লোলোনেজের সঙ্গীদের খুব সাবধানে বন্দি করে রাখলে। এবং যখন শুনলে যে লোলোনেজ আর বেঁচে নেই, তখন তাদের আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা রইল না। এত বড় শত্রু নিপাত হয়েছে শুনে চারিদিকে আলোকমালা সাজিয়ে তারা উৎসবে মত্ত হয়ে উঠল।

লোলোনেজ ফিরে এসে সব দেখলে—সব শুনলে। তারপর সেখান থেকে সরে পড়ে একেবারে টর্টুগা দ্বীপে এসে হাজির!

ওয়েস্ট ইন্ডিজে যত শয়তান আছে, এই দ্বীপ হচ্ছে তাদের নিরাপদ স্বদেশ। তার উপরে লোলোনেজ হচ্ছে তখন একজন নামজাদা ব্যক্তি—তার কীর্তিকাহিনী লোকের মুখে মুখে। সুতরাং এখানে এসে একখানা ছোটখাট জাহাজ ও লোকজন জোগাড় করতে তার বেশিদিন লাগল না। একুশজন লোক ও দরকার মতো হাতিয়ার জোগাড় করে এবারে সে কিউবা দ্বীপের দিকে বেরিয়ে পড়ল। এই দ্বীপের দক্ষিণে এক শহর তখন তামাক, চিনি ও চামড়ার ব্যবসার জন্যে বিখ্যাত। লোলোনেজ আন্দাজ করলে যে, সেখানে নিশ্চয়ই কোনও বড়গোছের শিকার পাওয়া যাবে।

নিজেদের সৌভাগ্যক্রমে কয়েকজন জেলে মাছ ধরতে ধরতে তাকে দেখেই চিনে ফেললে এবং তখনই চটপট দ্বীপের লাটসাহেবের কাছে গিয়ে ধর্না দিয়ে পড়ে বললে, "হুজুর, রক্ষা করুন! লোলোনেজ আমাদের সর্বনাশ করতে এসেছে!"

লাটসাহেবের কাছে তখন খবর গিয়ে পৌঁচেছে যে, লোলোনেজ আর বেঁচে নেই। তাই তিনি জেলেদের কথায় নির্ভর করতে পারলেন না। তবু সাবধানের মার নেই ভেবে তিনি জেলেদের সঙ্গে একখানা বড় জাহাজ, নব্বইজন সৈনিক ও দশটা কামান পাঠিয়ে দিলেন। জাহাজের সেনাপতির ওপরে হুকুম রইল—"বোম্বেটে বিনাশ না করে তিনি যেন ফিরে না আসেন। প্রত্যেক বোম্বেটেকে ফাঁসিকাঠে লটকে আসতে হবে—কেবল দলের সর্দার লোলোনেজ ছাড়া। তাকে জ্যান্ত বন্দি করে হাভানা শহরে ধরে আনতে হবে।" জাহাজের সঙ্গে একজন জল্লাদও চলল।

জাহাজখানা ঘটনাস্থলে এল। বোম্বেটেদের গুপ্তচর সর্দারকে এসে খবর দিলে—"লাটসাহেবের জাহাজ তাদের ধরবার জন্যে বন্দরে গিয়ে হাজির হয়েছে।"

কিন্তু লোলোনাজ এত সহজে ভড়কে যাবার ছেলে নয়। সে বললে, "আমি পালাব না। ওই জাহাজখানাকেই আমরা বন্দি করব। আমাদের একখানা ভাল জাহাজ দরকার!"

বোম্বেটেরা জনকয় জেলেকে ধরে ফেললে। লোলোনেজ তাদের বললে, "আজ রাত্রে বন্দরে ঢোকবার পথ আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে। নইলে তোদের খুন করব।"

জেলেরা বাধ্য হয়ে সেই রাত্রে তাদের নিয়ে বন্দরে গিয়ে ঢুকল।

লাটের জাহাজের প্রহরী জিজ্ঞাসা করলে, "কে তোমরা?"

প্রাণের দায়ে জেলেরা বললে, "আমরা জেলে।"

—"বোম্বেটেরা এখন কোথায়?"

—"আমরা কোনও বোম্বেটে দেখিনি।"

জাহাজের লোকরা ভাবলে, তাদের দেখে কাপুরুষ বোম্বেটেরা নিশ্চয়ই ভয়ে লম্বা দিয়েছে।

ভোর যখন হয় হয় তাদের ভুল ভাঙল তখন। বোম্বেটের দল দুই পাশ থেকে জাহাজ আক্রমণ করেছে!

স্পানিয়ার্ডরা বীরের মতো লড়াই করলে, কিন্তু তবু হেরে গেল। এরা দুর্জয় শত্রু, আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া উপায় নেই।

জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে বিজয়ী লোলোনেজ বললে, "স্পানিয়ার্ডগুলোকে একে একে আমার সামনে নিয়ে এসো।"

বন্দীদের একে একে সর্দারের সামনে আনা হতে লাগল।

লোলোনেজ বললে, "একে একে এদের মাথা কেটে ফেলো।"

একে একে তাদের মাথা উড়ে গেল।

সবশেষে নিয়ে আসা হল সেই জল্লাদকে। জাতে সে কাফ্রি।

জল্লাদ সর্দারের হাতে পায়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "আমাকে মারবেন না হুজুর! আপনি যা জানতে চান সব কথা খুলে বলব—কিছু লুকোব না।"

লোলোনেজ তাকে গোটাকয়েক গুপ্তকথা জিজ্ঞাসা করলে। প্রাণরক্ষার আশায় সে সব কথার সঠিক জবাব দিলে।

লোলানেজ বললে, "আর কিছু জানিস না?"

—"না হুজুর!"

লোলোনেজ বললে, "এ কালামানিককে নিয়ে আর আমার দরকার নেই। এর মাথাটা কেটে ফেলো।"

জল্লাদেরও মাথা উড়ে গেল।

কেবল একজন লোককে বোম্বেটেরা বধ করলে না।

তাকে ডেকে লোলোনেজ বললে, "যা, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যা! তোদের লাটসাহেবকে আমার এই কথাগুলো জানিয়ে দিস : আজ থেকে কোনও স্পানিয়ার্ডকে আমি আর একফোঁটাও দয়া করব না। লাটসাহেব আমাদের ওপরে যে অসীম দয়া প্রকাশের চেষ্টা করেছিলেন তাও আমি কখনও ভুলব না। আমি খুব শীঘ্রই তাঁর ওপরেও ঠিক সেইরকম দয়া দেখাবার জন্যে ফিরে আসব।"

লাটসাহেব সব শুনে রাগে তিনটে হয়ে বললেন, "আচ্ছা, আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, এবার থেকে কোনও বোম্বেটেকে হাতে পেলে আমিও ছেড়ে কথা কইব না—তার একমাত্র দণ্ড হবে প্রাণদণ্ড!"

হাভানার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বললেন, "কখনও অমন প্রতিজ্ঞা করা উচিত নয়! তাহলে বোম্বেটে ধরা পড়ুক আর না পড়ুক —আমাদেরই মারা পড়বার সম্ভাবনা বেশি!"

লাটসাহেব তখন মনের রাগ মনেই পুষে নিজের প্রতিজ্ঞাকে বাতিল করতে বাধ্য হলেন।

লোলোনেজ কিছুদিন ধরে সমুদ্রের এ বন্দর থেকে ও বন্দরে জাহাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ালে এবং একখানা খুব মূল্যবান জাহাজকেও বন্দি করলে—তার ভিতরে অনেক সোনা-রুপোর তাল ছিল। তারপর রীতিমতো ধনীর মতো সে আবার বোম্বেটে দ্বীপে—অর্থাৎ টর্টুগায় ফিরে এল। সেখানকার বাসিন্দারা মহাসমারোহে তাকে সংবর্ধনা করলে!

লোলোনেজের মাথার ভিতরে তখন এমন এক বিরাট ফন্দির উদয় হয়েছে, এতদিন বোম্বেটে জগতে যা কল্পনাতীত ছিল। বোম্বেটে বলতে বোঝায়, জলপথে যারা ছোটখাট নৌকা বজরা বা বড়জোর জাহাজ লুট করে। সেই লুটের মাল নিয়েই তারা খুশি হয়ে গা-ঢাকা দেয়।

কিন্তু লোলোনেজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এইটুকুতেই তৃপ্ত হয়ে থাকতে পারলে না। সে দেখাতে চায়, ইচ্ছা করলে বোম্বেটেরাও কত অসামান্য কাজ করতে পারে!

তার ফন্দি হচ্ছে এই, লুটের মাল বেচে এবারে সে অনেকগুলো জাহাজ কিনে প্রকাণ্ড এক নৌবাহিনী গঠন করবে । তার অধীনে বোম্বেটে সৈন্যের সংখ্যা হবে অন্তত পাঁচশত! তারপর সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের নানা স্পেনিয় রাজ্যে হানা দিয়ে গ্রাম ও ছোটবড় নগর লুণ্ঠন করবে।

তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত উচ্চ! স্পেনরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা! স্পেন সাম্রাজ্য সে সময়ে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল—ইউরোপের কোনও শক্তিই তার কাছে পাত্তা পেত না!

বোম্বেটে দ্বীপও লোলোনেজের এ অসম্ভব প্রস্তাব শুনে আনন্দে ও উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল! মারি তো গণ্ডার—লুটি তো ভাণ্ডার!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কালাপাহাড়ি কাণ্ড

বোম্বেটে দ্বীপের সমস্ত বোম্বেটের কাছে খবর গেল—স্পেনরাজ্য লুণ্ঠনে মহাবীর লোলোনেজ তোমাদের আহ্বান করছেন!

মড়ার খোঁজ পেলে দলে দলে শকুনি যেমন আকাশ ছেয়ে উড়ে আসে, অ্যাডমিরাল লোলোনেজের কালো পতাকার তলায় চারিদিক থেকে তেমনই করে ডাকাত, বোম্বেটে ও হত্যাকারীর দল ছুটে আসতে লাগল।

এখন, বোম্বেটে দ্বীপে আর একজন মস্ত মাতব্বর ব্যক্তি বাস করে, তার নাম মাইকেল ডি বাস্কো, আপাতত মেজরের পদে অধিষ্ঠিত। ইউরোপের সমুদ্রেও আগে সে বড় একজন বোম্বেটে বলে নাম কিনেছিল। আজকাল অনেক টাকা রোজগার করে বকধার্মিক সেজে পায়ের উপরে পা দিয়ে পরম আরামে বসে বসে খাচ্ছে।

কিন্তু লোলোনেজের বিপুল আয়োজনে প্রচুর লাভের সম্ভাবনা দেখে সে আবার ভালমানুষের মুখোশ খুলে রাখলে। লোলোনেজের কাছে গিয়ে বাস্কো বললে, "অ্যাডমিরাল, ওয়েস্ট ইন্ডিজের সমস্ত পথঘাট আমার নখদর্পণে। তুমি যদি আমাকে প্রধান কাপ্তেনের পদ দাও, আমি তাহলে তোমাকে সাহায্য করতে পারি।"

লোলোনেজ এতবড় একজন জাঁদরেল ও শক্তিশালী লোককে পেয়ে তখনই রাজি হয়ে গেল। বাস্কোকে সে কেবল প্রধান কাপ্তেন নয়, স্থলপথেও নিজের ফৌজের সেনাপতির পদে নিযুক্ত করলে।

এবারে আটখানা জাহাজ ও প্রায় সাতশজন লোক নিয়ে লোলোনেজ স্পানিয়ার্ডদের সর্বনাশ করতে বেরুল। সবচেয়ে বড় জাহাজখানা নিলে নিজে, তার ওপরে ছিল দশটা কামান।

হাইতি দ্বীপের উত্তরদিক দিয়ে যেতে যেতে প্রথমেই তাদের নজরে পড়ল একখানা প্রকাণ্ড জাহাজ। লোলোনেজের নিজের জাহাজেরও চেয়ে সে জাহাজখানা বড়।

সে ইচ্ছা করলেই আটখানা জাহাজ নিয়ে আক্রমণ করে খুব সহজেই জয়লাভ করতে পারত। কিন্তু এখানে সে যথেষ্ট বীরত্ব ও আত্মশক্তির ওপরে নির্ভরতার দৃষ্টান্ত দেখালে। সে কেবল নিজের জাহাজখানাকে রেখে বাকি সাতখানা জাহাজকে সাভোনা দ্বীপের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করতে বললে, তারপর শত্রু-তরীর দিকে অগ্রসর হল।

স্পানিয়ার্ডরা বোম্বেটে জাহাজকে আসতে দেখেও ভয় পেলে না। কারণ তাদের জাহাজে যোলটা কামান ও পঞ্চাশজন সৈনিক ছিল। এই দুঃসাহসই হল তাদের কাল।

যুদ্ধ হল তিন ঘণ্টা ধরে। তারপর স্পানিয়ার্ডদের সমস্ত শক্তি উবে গেল। জাহাজ, ধনরত্ন ও মালপত্তর বোম্বেটেদের হস্তগত হল। বন্দীদের কি দশা হল, প্রকাশ পায়নি। খুব সম্ভব তাদের কারুর কাঁধের উপরে কেউ আর মাথা বলে কোনও জিনিস দেখতে পায়নি।

অধিকৃত জাহাজখানা নিয়ে লোলোনেজ সানন্দে সাভোনা দ্বীপের দিকে নিজের নৌবাহিনীর খোঁজ করতে গেল। আনন্দের উপরে আনন্দ! সেখানে গিয়ে শোনে, তারাও একখানা ধনরত্নে পরিপূর্ণ জাহাজ হস্তগত করছে! লোলোনেজ বললে, "আমাদের যাত্রা শুভ দেখছি! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!"

সে আবার বোম্বেটে দ্বীপে ফিরে এল। আগে তাড়াতাড়ি ধনরত্ন, মালপত্তর বিলি করবার ও দ্বীপের লাটকে ঘুষ দেবার ব্যবস্থা করলে। আরও নতুন লোকজন নিলে। তারপর যে শত্রু-জাহাজ দখল করেছিল সেখানাকে নিজে নিয়ে আবার সদলবলে যাত্রা শুরু করলে। এবারে তার দৃষ্টি বিখ্যাত মারাকেবো নগরের দিকে।

মারাকেবো হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা প্রদেশের একটি বন্দর নগর। এখান থেকে এখন কফি, চিনি, রবার, কাঠ, চামড়া, নানা ধাতু ও কুইনিন প্রভৃতি চালান দেওয়া হয়। তখনও এ শহরটি প্রসিদ্ধ ব্যবসায়প্রধান স্থান ছিল। এর উত্তরে আছে পঁচাত্তর মাইল বিস্তৃত ভেনেজুয়েলা উপসাগর ও দক্ষিণে আছে বৃহৎ মারাকেবো হ্রদ। এর বর্তমান লোকসংখ্যা চুয়াত্তর হাজার, কিন্তু যখনকার কথা বলছি, তখন এই শহরের লোকসংখ্যা এত বেশি ছিল না।

লোলোনেজ এই শহরের কাছে এসে নঙ্গর ফেললে। তারপর সদলবলে ডাঙায় গিয়ে নামল। শহরে যাবার পথেই পড়ে এক কেল্লা। তাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় জেনে সে যুদ্ধ করবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।

কিন্তু দ্বীপের লোকরাও অপ্রস্তুত ছিল না, লোলোনেজের শনির দৃষ্টি যে তাদের উপরে পড়েছে এ খবর তারা আগেই পেয়েছিল।

বোম্বেটের দল কেল্লার দিকে আসছে শুনে সেখানকার লাট একদল সৈন্যকে জঙ্গলের ভিতরে লুকিয়ে থাকবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের উপরে হুকুম রইল, কেল্লার সৈন্যেরা যখন বোম্বেটেদের সমুখ থেকে আক্রমণ করবে, তখন তারা তাদের আক্রমণ করবে পিছনদিক থেকে। দু'দিক থেকে আক্রান্ত হলে পর বোম্বেটেদের জনপ্রাণীও আর প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না।

বন্দোবস্ত খুব ভাল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লোলোনেজও ঘুমিয়ে ছিল না, সব খবরই সে জানতে পেরেছিল যথাসময়ে। সেও নিজের একদল লোককে জঙ্গলের ভিতরে পাঠিয়ে দিলে এবং তারা এমন বিক্রমে ও সবেগে শত্রুদের আক্রমণ করলে যে, একজন স্পানিয়ার্ডও আর কেল্লার ভিতরে ফিরে যেতে পারলে না!

তারপর তারা কেল্লার দিকে অগ্রসর হল। কেল্লার সৈন্যেরা পাঁচিলের ওপর বড় বড় ষোলটা কামান বসিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ছিল।

বোম্বেটেরা বার বার কেল্লার দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু ষোলটা তোপের প্রতাপে বার বার ফিরে আসে। তাদের সঙ্গে তোপও ছিল না, বন্দুকও ছিল না—তাদের সম্বল খালি পিস্তল ও তরবারি!

কিন্তু অনেকবার ফিরে আসার পর তারা এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে দুর্গ আক্রমণ করলে যে, কামানের গোলা ও বন্দুকের অগ্নিবৃষ্টিও আর তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারলে না, প্রাণের সব মায়া ছেড়ে পাঁচিল টপকে তারা কেল্লার ভিতরে লাফিয়ে পড়ল। তিনঘণ্টা যুদ্ধের পর দুর্গ এল তাদের দখলে।

ইতিমধ্যে ভগ্নদূত গিয়ে শহরে খবর রটিয়ে দিয়েছে যে, হাজার হাজার বোম্বেটে কেল্লা ফতে করে শহর লুটতে ছুটে আসছে! ভয়ে সে কিছু বাড়িয়েই বললে!

এই মারাকেবো শহর এর আগেও আরও তিন-চারবার শত্রুদের হাতে পড়েছে। সে যে কী বিপদ, কী যন্ত্রণা, কী বিভীষিকা, বাসিন্দারা আজও তা ভুলতে পারেনি। তখনই চারিদিকে রব উঠল—ওই এল রে, ওই এল! পালা! পালা! পালা! টাকাকড়ি ও মালপত্তর নিয়ে সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে শহর ছেড়ে লম্বা দিলে—কেউ গেল বনের ভিতরে, কেউ গেল জিব্রালটারের দিকে! বলা বাহুল্য, এই জিব্রালটার হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার নতুন শহর। কিন্তু এই নতুন শহরের [illegible] আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

ওদিকে দুর্গপ্রাকারের উপর থেকে লোলোনেজ সঙ্কেত করে নিজের নৌ-বাহিনীকে জানিয়ে দিলে—পথ পরিষ্কার, তারা ভিতরে ঢুকে অনায়াসেই শহরের দিকে যাত্রা করতে পারে!

জলপথে মারাকেবো শহর সেখান থেকে আঠার মাইল। বোম্বেটেরা আগে দুর্গটাকে সমূলে ধ্বংস করলে এবং সেই কাজেই গেল পুরো একটি দিন। তারপর তারা নৌবাহিনী নিয়ে একেবারে শহরের কাছে গিয়ে নঙ্গর ফেললে।

একদল বোম্বেটে সমুদ্র থেকে শহরের উপরে গোলাবর্ষণ করতে লাগল, আর একদল নৌকো বেয়ে তীরে উঠে শহরের ভিতরে সার বেঁধে প্রবেশ করলে। কেউ বাধা দিলে না।

বাধা দেবে কে? সব লোক সে মুল্লুক ছেড়ে পিটটান দিয়েছে! বোম্বেটেরা শহরে ঢুকে দেখলে, চারিদিকে খাঁ খাঁ করছে! তখন তারা সেখানকার বড় বড় ও ভাল ভাল বাড়িগুলো দখল করে বসল—তেমন সব বাড়িতে তারা জীবনে কোনওদিন বাস করেনি। বাড়িগুলোর ভিতরে ময়দা, রুটি, শূকর ও মদ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পেলে, কিন্তু ধনরত্ন সব যেন অদৃশ্য হয়েছে ফুসমন্ত্রে! যা পেলে তাই নিয়েই তারা আপাতত আমোদ-আহ্লাদ করতে বসল বটে, তবে তাদের বড় আশায় ছাই পড়ল!

কিন্তু লোলোনেজ হাল ছাড়লে না। সে জনকয়েক বোম্বেটেকে পাঠিয়ে দিলে বনের ভিতরটা আঁতিপাতি করে খুঁজে দেখতে।

সেই রাত্রেই বোম্বেটেরা বনের ভিতর থেকে বিশজন স্ত্রী-পুরুষ, গাধার পিঠে চাপানো নানারকম মাল ও প্রায় নগদ লক্ষ টাকা নিয়ে ফিরে এল। কিন্তু একটা এত বড় শহরের পক্ষে লক্ষ টাকা তো তুচ্ছ জিনিস!

লোলোনেজ স্পানিয়ার্ডদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, 'টাকাকড়ি কোথায় লুকিয়ে ফেলেছিস?"

তারা কোনও সন্ধান দিলে না।

তখন তাদের ভীষণ যন্ত্রণা দেওয়া হতে লাগল। তার ফলে কেবল জানা গেল যে টাকাকড়ি সব বনের ভিতরে লুকানো আছে। কিন্তু কোথায় আছে, সে ঠিকানা পাওয়া গেল না।

লোলোনেজ রাগে অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠল। সে হঠাৎ খাপ থেকে তলোয়ার খুলে একজন স্পানিয়ার্ডকে তখনই কেটে কুচি কুচি করে ফেললে। তারপর চোখ পাকিয়ে বললে, "কী! বলবিনি! তাহলে একে একে সকলকেই আমি মোরগের মতো জবাই করব!"

এই নরপশুর ভয়ঙ্কর স্বভাব দেখে বন্দীরা স্তম্ভিত হয়ে গেল! একজন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে, "বনে যারা লুকিয়ে আছে, চলুন তাদের দেখিয়ে দিচ্ছি!"

কিন্তু ডাকাতরা তাদের খুঁজতে আসছে, বনবাসী নাগরিকরা সে খবর পেয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে আবার নতুন এক জায়গায় গিয়ে গা ঢাকা দিলে। বোম্বেটেরা কারুর টিকি পর্যন্ত দেখতে পেলে না।

নিরুপায় হয়ে বোম্বেটেরা দিন পনের সেই শহরেই বাস করলে।

তারপর লোলোনেজ বললে, "বন্ধুগণ, এই শহরের ধড়িবাজ লোকগুলো আমাদের কলা দেখাতে চায়! এখানে অনেক খাবারদাবার আছে বটে, কিন্তু খাবার খেতে আমরা এখানে আসিনি। এখানকার ধনরত্ন ওরা সব জিব্রালটারে নিয়ে গেছে,—চলো, আমরা জিব্রালটার আক্রমণ করিগে!"

তার অভিপ্রায় হাওয়ার আগেই জিব্রালটারে গিয়ে পৌঁছল! সবাই আবার সে শহর ছেড়ে অন্য জায়গায় পালাবার জোগাড় করলে।

কিন্তু সেখানকার শাসনকর্তা বললেন, "তোমাদের কোনও ভয় নেই! আসুক না বোম্বেটেরা—এখানে এলে বাছারা মজাটা টের পাবেন! আমি তাদের সমূলে বিনাশ করব!"

শাসনকর্তা ছিলেন একজন পাকা যোদ্ধা, তিনি ইউরোপে অনেক লড়াই করেছেন। তিনি তখনই অসংখ্য কামান ও আটশজন সৈন্য নিয়ে বোম্বেটেদের অভ্যর্থনার আয়োজন করতে লাগলেন। সমুদ্রের দিকে কুড়িটি কামান বসানো হল। আর একদিকে বসানো হল আটটা বড় বড় কামান। শহরে যাবার একটি রাস্তা খুব শক্ত বেড়া দিয়ে বন্ধ করা হল। আর একটা রাস্তা খুলে রাখা হল—তাতে এমন পুরু পাঁক ও কাদা ছিল যে, সেখান দিয়ে পথ-চলাচল করা প্রায় অসম্ভব। সে পথে যারা আসবে সৈন্যদের অগ্নিবৃষ্টিতে তাদের অবস্থা হবে শোচনীয়।

বোম্বেটেরা যথাসময়ে নগর থেকে খানিক তফাতে এসে দেখলে, শহরের উপরে স্পেনরাজের পতাকা উড়ছে সগর্বে এবং স্পানিয়ার্ডরা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে তাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। এরা যে যুদ্ধের জন্যে এমন বিপুল আয়োজন করবে, লোলোনেজ তা কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু এজন্যে সে ভীত হল না, দলের মাথাওয়ালা লোকদের ডেকে পরামর্শ করতে বসল। পরামর্শ হচ্ছে এই যে, স্পানিয়ার্ডরা যখন উচিতমতো আত্মরক্ষা করবার জন্যে এত বেশি সময় পেয়েছে এবং তাদের সৈন্যসংখ্যাও যখন এমন অসামান্য, তখন তাদের আর আক্রমণ করা উচিত কিনা!

লোলোনেজ বললে, "কিন্তু তবু আমি হতাশ হবার কারণ দেখি না। তোমরা অনায়াসেই বুক বেঁধে দাঁড়াতে পারো! বীরপুরুষের মতো আত্মরক্ষা করবার শক্তি আমাদের আছে। আমি তোমাদের সর্দার, আমি যা বলি তাই করো! এর আগেও আজকের চেয়ে কম লোক নিয়ে আমরা এর চেয়েও বড় বিপদকে এড়াতে পেরেছি। শত্রুরা দলে যত ভারি হবে, আমাদের গৌরবও তত বাড়বে!"

বোম্বেটেদের ধারণা ছিল যে মারাকেবোর সমস্ত ধনরত্নই এইখানে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। অতএব তারা একবাক্যে বললে, "সর্দার, তুমি যা বলবে আমরা তাই করব! তুমি যেখানে যাবে আমরা সেইখানেই যাব!"

লোলোনেজ বজ্রগম্ভীর স্বরে বললে, "সাবাস! কিন্তু শুনে রাখো, তোমাদের মধ্যে যে কেউ একটু ভয় পাবে, আমি তাকেই নিজের হাতে গুলি করে মেরে ফেলব!"

প্রায় চারশ বোম্বেটে যুদ্ধের আগে পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিলে—সে দিন যে কার জীবনের শেষদিন, তা কে জানে?

লোলোনেজ সকলকার আগে গিয়ে দাঁড়িয়ে নেতার স্থান অধিকার করলে। তারপর শূন্যে তরবারি তুলে দৃপ্তকণ্ঠে বললে, "ভাই সব! এসো আমার সঙ্গে—মাভৈঃ!" সকলে তার অনুসরণ করলে।

প্রথম পথে গিয়ে তারা দেখলে, তা এমন ভাবে বন্ধ যে এগুবার কোনও উপায় নেই।

দ্বিতীয় পথ হচ্ছে পাঁক ও কাদাভরা পথ—সেটা স্পানিয়ার্ডদের ফাঁদ!

তারা বনজঙ্গল থেকে ডালপালা-পাতা কেটে এনে পথের ওপরে পুরু করে ছড়িয়ে দিতে লাগল—যাতে করে পাঁকে-কাদায় পা বসে যাবে না। ইতিমধ্যে স্পানিয়ার্ডদের কামান ও

বন্দুক এমন ভীষণ গর্জন করতে লাগল যে, বোম্বেটেরা পরস্পরের গলার আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পেলে না! কিন্তু সেই ভয়াবহ গুলিগোলা বৃষ্টির ভিতর দিয়েও তারা নির্ভয়ে ও অটল পদে সমান অগ্রসর হতে লাগল।

অবশেষে তারা শুকনো মাঠের উপরে এসে পড়ল। এখানে আরও ছয়টা বড় বড় নতুন কামান অগ্নি উদগার করতে আরম্ভ করলে! ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারিদিক অমাবস্যার চেয়ে অন্ধকার! তার উপরে শত্রুরা আবার দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে এসে সবেগে তাদের আক্রমণ করলে! সে এমন প্রবল আক্রমণ যে, বোম্বেটেরা পিছু না হটে পারলে না! তাদের দলের অনেক লোক হত ও আহত হয়ে রক্তাক্ত মাটির উপরে লুটোতে লাগল।

বোম্বেটেরা বনের ভিতরে অন্য কোনও নতুন রাস্তা আবিষ্কারের চেষ্টা করলে—কিন্তু রাস্তা কোথাও নেই! শত্রুরা আর কেল্লা ছেড়ে বেরুবার নামও করলে না—কিন্তু আড়াল থেকে সমান গোলাগুলি চালাতে লাগল।

লোলোনেজ তখন ভেবে চিন্তে পৃথিবীতে সব দেশেই সুপরিচিত একটি পুরনো উপায় অবলম্বন করলে—সকলকেই দিলে হঠাৎ একসঙ্গে পালিয়ে যেতে হুকুম!

তাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে দেখে স্পানিয়ার্ডরা মহা উৎসাহে বলে উঠল—“ওরা পালাচ্ছে! ওরা পালাচ্ছে! এসো, পিছনে পিছনে গিয়ে ওদের আমরা বধ করি!”—তারা সার ভেঙে বিশৃঙ্খল হয়ে বোম্বেটেদের পিছনে পিছনে তেড়ে এল।

স্পানিয়ার্ডরা যখন অতিরিক্ত উৎসাহের ঝোঁকে কামানের গোলার সীমানা ছাড়িয়ে এগিয়ে এসেছে,—বোম্বেটেরা তখন সর্দারের হুকুমে আচম্বিতে আবার ফিরে দাঁড়াল এবং প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল! বিষম হাতাহাতি লড়াই শুরু হল।

খানিক পরে দেখা গেল, দু'শ স্পানিয়ার্ডের দেহ পৃথিবীকে বুকের রক্তে রাঙা করে ছেয়ে আছে এবং বাকি সবাই কেল্লার দিকে আসতে না পেরে বনের দিকে প্রাণের ভয়ে পলায়ন করছে!

কেল্লার স্পানিয়ার্ডরা তাই দেখে হতাশ ভাবে কামান ছোঁড়া বন্ধ করে বলে উঠল—“আমরা আত্মসমর্পণ করছি। আমাদের বধ কোরো না!”

কেল্লার উপর থেকে তখনই স্পেনের রাজপতাকা নামিয়ে ফেলা হল—সেখানে উড়তে থাকল বোম্বেটেদের পতাকা। কেল্লা ফতে! শহর তাদের হাতের মুঠোয়!

কিন্তু সাবধানের মার নেই—বলা তো যায় না, বনের পলাতক শত্রুরা আবার যদি সাহস সঞ্চয় করে ফিরে আসে! বোম্বেটেরা কেল্লার কামানগুলো আবার নিজেদের সুবিধামতো সাজিয়ে রাখলে।

মিথ্যা ভয়! রাত্রি প্রভাত, যারা পালিয়েছে তারা আর ফিরল না।

তখন হিসাব নিকাশ করে দেখা গেল, শত্রুদের মৃতদেহের সংখ্যা পাঁচশত! শহরের ভিতরে আহত লোকও অসংখ্য এবং তাদের ভিতরেও অনেকে মারা পড়ছে ও মারা পড়বে। বন্দি শত্রুর সংখ্যা একশ পঞ্চাশ ও ক্রীতদাসেরা গুণতিতে পাঁচশত।

বোম্বেটেদের লোক মরেছে মাত্র চল্লিশ জন এবং জখম হয়েছে চল্লিশ জন—যদিও ক্ষত বিষিয়ে আহতদেরও অধিকাংশই মারা পড়ল।

বোম্বেটেরা শত্রুদের মৃতদেহ নিয়ে দু'খানা নৌকো বোঝাই করলে, তারপর সমুদ্রের ভিতরে গিয়ে নৌকো দু'খানা ডুবিয়ে দিলে।

তারপর আরম্ভ হল লুট! সোনার তাল, রুপোর তাল, হীরে-মুক্তো, ভাল ভাল দামী আসবাব ও নানারকম মাল—শহরের কোথাও আর কিছু বাকি রইল না! কিন্তু লোভ এমনই জিনিস, সারা শহর লুটেও বোম্বেটেদের আশ মিটল না, তাদের সন্দেহ হল আরও অনেক ধনরত্ন লুকিয়ে ফেলা হয়েছে! সুদীর্ঘ আঠার দিন ধরে চলল অবাধে এই পরস্বাপহরণের বীভৎস পালা!

এরই মধ্যে বন্দি স্পানিয়ার্ডদের অধিকাংশই ইহলোক ত্যাগ করলে—অনাহারে! শহরে খাবার জিনিস—বিশেষ করে তাদের প্রধান আহার্য মাংসের যারপরনাই অভাব! যা ছিল তা বোম্বেটেদেরই পক্ষে অপ্রচুর। তা থেকে বন্দীদের ভাগ কেউ দিলে না। বন্দীদের খেতে দেওয়া হত খচ্চর ও গাধার মাংস। অনেকে তা মুখেই তুলতে পারত না, ক্ষিধের চোটে যারা তাও খেতে বাধ্য হত, অনভ্যাসের দরুন তারা পেটের অসুখে ভুগে ভবলীলা সাঙ্গ করলে। অনেক বন্দীকে গুপ্তধন দেখিয়ে দেবার জন্যে এমন দুঃসহ ও পাশবিক যন্ত্রণা দেওয়া হল যে, সইতে না পেরে তারাও পরলোকে প্রস্থান করলে।

অল্প যে কয়েকজন বেঁচে ছিল, লোলোনেজ তাদের ডেকে বললে, "তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি। তোমরা বনের ভিতর গিয়ে তোমাদের সঙ্গীদের বলগে যাও যে, আমাকে আরও অনেক টাকা না দিলে আমি এই শহরে আগুন ধরিয়ে দেব। যাও, দু'দিন সময় দিলুম।"

দু'দিন কেটে গেল। বোম্বেটেরা তখন শহরে আগুন ধরাতে আরম্ভ করলে।

স্পানিয়ার্ডরা দূর থেকে তাই দেখতে পেয়ে তখনই দূত পাঠিয়ে দিলে। সে এসে জানালে,—টাকা এখনই নিয়ে আসা হবে, দয়া করে আপনারা আগুন নিবিয়ে দিন!

বোম্বেটেরা রাজি হল বটে, কিন্তু ততক্ষণে শহরের এক অংশ পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেছে!

তারপর তাদের টাকা এল। তবু চার হপ্তা সেই শহরে দৈত্যলীলা করে সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে তারা আবার জাহাজে গিয়ে উঠল।

আবার তারা মারাকেবো শহরে এসে হাজির! পাপ বিদায় হয়েছে ভেবে যারা ভরসা করে শহরে ফিরে এসেছিল, তারা ফের পালাতে লাগল!

বোম্বেটেরা তাদের খবর পাঠিয়ে দিলে যে, হয় আমাদের ধনরত্ন দিয়ে খুশি কর, নয় আমরা সারা শহর আবার লুট করে আগুন ধরিয়ে দেব!

অনেক টাকা পাঠিয়ে মারাকেবোর অধিবাসীরা এই আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধারলাভ করলে।

বিজয়গর্বে ফুলে উঠে লোলোনেজ আবার বোম্বেটে দ্বীপে ফিরে এল। তাদের অপূর্ব সৌভাগ্যের কাহিনী ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল—যারা তার সঙ্গী হয়নি তারা অনুতাপে হাহাকার করতে লাগল।

লোলোনেজ দলের প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অংশ কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিলে—প্রত্যেকেরই রোগা পকেট মোটা হয়ে ফুলে উঠল। কিন্তু তারা এমনই লক্ষ্মীছাড়া যে, জুয়া খেলে আর মদ খেয়ে দু'হাতে টাকা ওড়াতে লাগল। সে পাপের ধন আর বেশিদিন রইল না—অল্পদিন পরেই

তারা যে গরিব ছিল সেই গরিবই হয়ে পড়ল! তখন তারা আবার নতুন শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়বার জন্যে আগ্রহপ্রকাশ করতে লাগল!

সবাই বলে, "সর্দার! আবার সাগরে জাহাজ ভাসাও!"

সর্দার বলে, "তথাস্তু!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মহাবিচারকের বিচার

বোম্বেটে দ্বীপে যদি ভাল গণৎকার থাকত তাহলে নিশ্চয়ই সে বলত, "লোলোনেজ, সাবধান! এবারের যাত্রা শুভ নয়!"

কিন্তু সে কথা সে কানে তুলত কিনা, সন্দেহ! নিয়তির সূত্র তাকে বাইরে টানছে! সে অনেক পাপ করেছে, এবারে প্রতিক্রিয়ার সময় এসেছে!

ভবিষ্যৎ ভাববার সময় তার ছিল না, বর্তমানের ঔজ্জ্বল্যে সে অন্ধ! বোম্বেটে দ্বীপে তার চেয়ে বড় নাম আজ আর কারুর নেই,—সবাই তাকে ভয় করে সম্মান করে শ্রদ্ধা করে, যেন সে নরদেবতা! যেমন তার শক্তি, তেমনই ঐশ্বর্য!

কিন্তু তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাকে স্থির থাকতে দিলে না। তাই আবার সে যেদিন সমুদ্রযাত্রা করবে বললে, সেদিন সারা দেশে আনন্দ ও উৎসাহের বন্যা বইল! এবারে আর লোকজনের জন্যে তাকে একটুও মাথা ঘামাতে হল না, লোলোনেজের সঙ্গী হয়ে বিপদে পড়তেও লোকের এত আগ্রহ যে, তার দরজার সামনে উমেদার আর ধরে না। যত লোক সে চায়, তার চেয়ে ঢের বেশি লোক এসে তার কাছে ধর্না দিয়ে পড়ল।

লোলোনেজ নতুন করে ছয়খানা জাহাজ সাজালে। এবারে তার সঙ্গীর সংখ্যা হল সাতশত, এর মধ্যে তিনশজন আগের বারেও তার সঙ্গে গিয়েছিল।

লোলোনেজ বললে, "এবারে আমি নিকারাগুয়া জয় করতে যাব।"

আবার সমুদ্র! বাংলায় সমুদ্রের আর এক নাম 'রত্নাকর' এবং এই বোম্বেটেদের পক্ষে সমুদ্র রত্নাকরই বটে!

কিন্তু এবারে রত্নের এখনও দেখা নেই! তার উপরে অনুকূল বায়ুর অভাব, বোম্বেটেদের জাহাজগুলো যেন অগ্রসর হতেই নারাজ! এইভাবে কিছুদিন কাটবার পরেই খাদ্যাভাব উপস্থিত হল। তখন বাধ্য হয়েই বোম্বেটেরা প্রথম যে বন্দর দেখতে পেলে সেইখানেই জাহাজ নঙ্গর করলে।

সমুদ্র থেকে একটা নদী ডাঙার মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে, নাম তার জাগুয়া। তার তীরে তীরে অসভ্য ও দরিদ্র লাল মানুষ বা রেড ইন্ডিয়ানের বাস। বোম্বেটেরা নৌকোয় চড়ে সেই নদীর ভিতরে গেল এবং রেড ইন্ডিয়ান বেচারাদের পালিত পশু ও অন্যান্য মালপত্তর নিঃশেষে কেড়ে নিলে—নিজেদের খাদ্যাভাব দূর করবার জন্যে।

কেবল তাইতেই খুশি হল না। তারা স্থির করলে, যতদিন না অনুকূল বাতাস বয় ততদিন তারা আর বাহির সমুদ্রে যাবে না, এই দেশের যত শহর আর গ্রাম লুট করে সময় কাটাবে আর পকেট পূর্ণ করবে।

তারা গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর লুট করতে করতে পুয়ের্টো কাভাল্যো* নামে এক বন্দরে এসে হাজির হল। সেখানে স্পানিয়ার্ডদের একটা আস্তানা ও একখানা বড় জাহাজ ছিল। তারা তৎক্ষণাৎ জাহাজখানা দখল করে স্পানিয়ার্ডদের আস্তানা লুটে আগুন জ্বালিয়ে দিলে।

এর মধ্যে তারা কত লোককে বন্দি করেছে, কত বন্দীকে অকথ্য যন্ত্রণা দিয়েছে ও কত বন্দীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে, তার আর সংখ্যা হয় না। লোলোনেজের প্রকৃতি অতি ভয়ঙ্কর! কারুর জিভ সে নিজের হাতে টেনে বার করে ফেলে, কারুকে বা স্বহস্তে কেটে খণ্ড খণ্ড করে! যেখান দিয়ে তার দল পথ চলে সেখানটাই যেন ধু ধু শ্মশান হয়ে যায়! যেন সে নরদেহে প্রলয়কর্তা, যথেচ্ছভাবে ধ্বংস করাই তার একমাত্র কর্তব্য! স্পানিয়ার্ডদের কাছে সে যেন সাক্ষাৎ যম!

লোলোনেজের সঙ্গে আছে এখন তিনশ বোম্বেটে,—বাকি লোকজন ও জাহাজগুলি সে তার সহকারী মোসেস ফ্যান ফিন নামে এক ওলন্দাজের তত্ত্বাবধানে সমুদ্র উপকূলে রেখে এসেছে। প্রায় ছত্রিশ মাইল পথ হেঁটে লোলোনেজ সান পেড্রো বা সেন্ট পিটার শহরের কাছাকাছি একটা বনের ধারে এসে পড়ল।

তার অত্যাচারে পাগলের মতো হয়ে স্পানিয়ার্ডরা বনের মধ্যে অপেক্ষা করছিল। বোম্বেটেদের দেখেই তারা গুলিবৃষ্টি আরম্ভ করলে। এখানে রীতিমতো একটা লড়াই হয়ে গেল এবং দুই পক্ষেই অনেক লোক হত ও আহত হল। তারপর স্পানিয়ার্ডরা পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে। শত্রুদের যারা জখম হয়েছিল তাদের কারুর উপরেই বোম্বেটেরা দয়া করলে না—একে একে সবাইকে পরলোকের পথে পাঠিয়ে দিলে।

যারা বন্দি হল তাদের ডেকে লোলোনেজ বললে, "এই বনের ভেতর দিয়ে শহরে যাবার আর কোনও ভাল রাস্তা আছে?"

তারা বললে, "না।"

লোলোনেজ আবার গর্জন করে বললে, "ভাল চাস তো এখনও বল!"

তারা বললে, "আর রাস্তা নেই।"

লোলোনেজের মগজে শয়তান জেগে উঠল। সামনেই যে স্পানিয়ার্ড দাঁড়িয়েছিল, ঘাড় ধরে তাকে কাছে টেনে আনলে—যেন সে তারই মতো মানুষ নয়, তুচ্ছ একটা বলির পশু মাত্র! ফস করে খাপ থেকে চকচকে তলোয়ারখানা বার করে ফেললে এবং সেই হতভাগ্য স্পানিয়ার্ডের বুকের ভিতরে তরোয়ালের ডগা ঢুকিয়ে দিয়ে মস্ত একটা ছিদ্রের সৃষ্টি করলে—তার মর্মভেদী আর্তনাদে কিছুমাত্র কান না পেতেই! তারপর সেই তখনও জীবন্ত

---

* মূল গ্রন্থের এই নামটি সম্ভবত ভুল। মধ্য আমেরিকার সমুদ্র উপকূলে পুয়ের্টো কাভাল্যো নামে কোনও বন্দরের সন্ধান পাওয়া যায় না। দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা প্রদেশের সমুদ্র উপকূলে ওই নামের একটা সমৃদ্ধিশালী বন্দর আছে। কিন্তু লোলোনেজ এবার এ অঞ্চলে আসেনি। খুব সম্ভব, সে হণ্ডুরাস উপসাগরের মুখে পুয়ের্টো কর্টেজ বন্দরে বাহিনী রেখে ভিতরে প্রবেশ করেছিল। কর্টেজ বন্দর থেকে প্রায় ৩৬ মাইল ভিতর দিকে সান পেড্রো বা সেন্ট পিটার শহর এখনও বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের পুস্তকের মানচিত্রে অনবধানতা বশত কর্টেজ বন্দর ও সেন্ট পিটার শহর দেখানো হয়নি। Everyman Encyclopaedia-র World Atlas ভলুমের ১৯৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

দেহের ছ্যাঁদা করা বুকের মধ্যে নিজের হাত ঢুকিয়ে দিলে এবং তার নৃত্যশীল, তপ্ত ও রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডটা সজোরে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের মুখে পুরে পরম উপাদেয় খাদ্যের মতো কচমচ করে চিবোতে চিবোতে বললে, "বল কোথায় রাস্তা আছে? নইলে তোদের হৃৎপিণ্ডও আমার খাবার হবে!"—

গল্পের রাক্ষস কি আজ মানুষ মূর্তিতে সমুখে দেখা দিয়েছে? না এ ভূত-প্রেত, পিশাচ? বন্দীদের হৃৎপিণ্ডও যেন মহা আতঙ্কে বুকের ভিতরেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল। শিউরোতে শিউরোতে তারা প্রায় রুদ্ধস্বরে বললে,—"আমরা পথ দেখিয়ে দিচ্ছি, আমরা পথ দেখিয়ে দিচ্ছি!"

রক্তমাখা ওষ্ঠাধর ফাঁক করে হা হা হা হা করে অট্টহাসি হাসতে হাসতে লোলোনেজ বললে, "পথে এসো বাবা, পথে এসো! কোথায় পথ?"

কিন্তু কোথায় পথ? গভীর অরণ্য, গাছের পর গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পায়ের তলায় কাঁটা ঝোপ আর জঙ্গল,—অজগর সাপ ও জাগুয়ার বাঘ ছাড়া সেখান দিয়ে আর কেউ আনাগোনা করে না। বন্দীরা ভয়ে ভেবড়েই পথের নাম মুখে এনেছিল, আসলে সেখানে কোনও পথ ছিল না!

দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে লোলোনেজ বললে, "পথ নেই? আচ্ছা স্পানিয়ার্ড কুত্তারাই এজন্যে শাস্তিভোগ করবে!" লোলোনেজের শাস্তি—না জানি সে কী ভয়ানক!

এদিকে ও অঞ্চলের স্পানিয়ার্ডরা বুঝলে, এই দুর্ধর্ষ ও পাপিষ্ঠ বোম্বেটেদের জব্দ ও কাহিল করবার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে, বনের ভিতরে অতর্কিতে বার বার আক্রমণ করা! এমনই বারংবার আক্রমণের ফলে বোম্বেটেরা সত্যসত্যই মহা জ্বালাতন হয়ে উঠল এবং তাদের সংখ্যাও ক্রমেই কমে আসতে লাগল! কিন্তু বাধা পেয়েও শেষপর্যন্ত তারা সেন্ট পিটার শহরের কাছাকাছি এসে পড়ল।

এবার বিষম যুদ্ধ আরম্ভ হল। এ যুদ্ধে স্পানিয়ার্ডরা বড় বড় কামানও ব্যবহার করতে ছাড়লে না। কিন্তু যেই তারা কামান ছোড়ে, লোলোনেজের আদেশে বোম্বেটেরা অমনি মাটির উপরে শুয়ে পড়ে, তারপর গোলাগুলো তাদের পার হয়ে শূন্য দিয়ে চলে গেলেই, তারা চোখের নিমেষে উঠে পড়ে শহরের দিকে এগিয়ে যায় এবং হই হই রবে বোমার পর বোমা ছুড়তে থাকে! বোমা ছুড়ে বহু শত্রু নিপাত করেও একবার স্পানিয়ার্ডদের প্রবল আক্রমণে চোখে সর্ষেফুল দেখতে দেখতে বোম্বেটেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে এল। কিন্তু লোলোনেজের দৃপ্ত বাক্যে উত্তেজিত হয়ে আবার তারা ফিরে দাঁড়িয়ে তেড়ে গেল!

তখন স্পানিয়ার্ডদের সব সাহস ও শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছে!

সাদা নিশান হাতে করে শত্রুদূত এসে জানালে, "আমরা শহরের ফটক খুলে দিচ্ছি—কিন্তু এই শর্তে যে, দু'ঘণ্টার ভিতরে আমাদের উপরে কেউ কোনও অত্যাচার করতে পারবে না।"

আর বেশি লোকক্ষয় করতে না চেয়ে লোলোনেজ এই শর্তেই রাজি হয়ে গেল। শহরের ফটক খুলল। বোম্বেটেরা সার বেঁধে ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

লোলোনেজ আজ একটু ভদ্রতার পরিচয় দিলে। ঠিক দু'টি ঘণ্টা সে লক্ষ্মীছেলের মতো হাত গুটিয়ে চুপটি করে বসে রইল। শত্রুরা দামী জিনিসপত্তর নিয়ে দলে দলে সরে পড়ছে

দেখেও নিজের শয়তানীকে সে চেপে রাখলে! হঠাৎ তার এ সাধুতা, এ দুর্বলতা কেন? এ অনুতাপ কি অন্তিমকালের হরিনামের মতো?

ঠিক দু'ঘণ্টার জন্যে সৎপ্রবৃত্তির আনন্দ উপভোগ করে কুম্ভকর্ণ আবার ভীম হুঙ্কারে জেগে উঠল—"লুট করো! বন্দি করো! হত্যা করো! দু'ঘণ্টা কাবার!" যারা তখনও পালাতে পারেনি তারা এবং শহরে তখনও যা অবশিষ্ট ছিল সমস্তই বোম্বেটেদের হস্তগত হল। কিন্তু সে এমন বেশিকিছু নয়! স্পানিয়ার্ডরা সন্ধির দু'ঘণ্টার রীতিমতো সদ্ব্যবহার করেছে!

বোম্বেটেরা দিনকয় নগরেই বাস করলে, এবং এ কয়দিন তাদের স্বভাবগত নিষ্ঠুরতার, কদর্যতার ও ভীষণতার পরিচয় দিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করলে না। এখান থেকে যাত্রা করবার দিনে তারা শহরেও আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেল। সেই সাঙ্ঘাতিক দেওয়ালি উৎসব শেষ হলে পর দেখা গেল, আগে যেখানে শহর ছিল এখন সেখানে পড়ে রয়েছে শুধু বিরাট একটা ভস্মের পাহাড়!

সেন্ট পিটার শহর ধ্বংস করে লোলোনেজ খোশমেজাজে সমুদ্রতীরে ফিরে এল। তার দলের যে সব লোক জাহাজ ও নৌকা নিয়ে সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিল, তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সে আবার নতুন শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

দু'একদিন পরে গুয়াটেমালা নদীর মোহানায় এসে বোম্বেটেরা খবর পেলে যে, স্পানিয়ার্ডদের একখানা জাহাজ সেখানে এসে উপস্থিত হবে। তারা সেই জাহাজের অপেক্ষায় দলে দলে সেখানে পাহারা দিতে লাগল। কোনও দল সাগরের বুকে ছোট ছোট দ্বীপে কাছিম ধরতে গেল। কোনও দল গেল সেখানকার রেড ইন্ডিয়ান ধীবরদের উপরে অত্যাচার করতে।

সেখানকার রেড ইন্ডিয়ানরা তখন একশ বছর ধরে স্পানিয়ার্ডদের অধীনে বাস করে আসছে। স্পানিয়ার্ডদের চাকর বাকর দরকার হলে তারাই এসে কাজকর্ম করে দিয়ে যায়। স্পানিয়ার্ডরা তাদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল।

কিছুকাল তারা খ্রিস্টধর্মের নিয়ম পালন করে। কিন্তু স্পানিয়ার্ড প্রভুদের অধার্মিকের মতো ব্যবহার ও হিংস্র আর পশু প্রকৃতি দেখে খ্রিস্টধর্মে বোধহয় তাদের ভক্তি চটে যায়। তখন আবার তারা পিতৃ-পিতামহের ধর্মকে ফিরে ফিরতি গ্রহণ করে।

হিন্দুদের নাকি তেত্রিশ কোটি দেবতা আছে। কিন্তু তাদের দেবতাদের 'সেনসাস' কখনও নেওয়া হয়েছিল কি না জানি না। তবে রেড ইন্ডিয়ান দেবতারাও দলে খুব হালকা হবেন বলে মনে হয় না। কেননা তাদের ঘরে ঘরে নূতন নূতন দেবতার রকম-বেরকম লীলাখেলা দেখা যায়।

তাদের দেবতা নির্বাচনের একটা পদ্ধতির কথা বলি।

পরিবারের মধ্যে যে মুহূর্তে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে, তারা তখনই তাকে নিয়ে বনের ভিতরে মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হয়।

মেঝের উপরে মণ্ডলাকারে খানিকটা জায়গা খুঁড়ে তার মধ্যে পুরু করে ছাই বিছিয়ে দেয়। তারপরে সেই ছাইয়ের উপরে নবজাত শিশুকে শুইয়ে রেখে চলে আসে। মন্দিরের চারিদিকের সব দরজা খোলা থাকে। তার কাছে আর জনপ্রাণীও যায় না। যে কোনও হিংস্র জন্তু মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু কোনও মানুষ আসবার হুকুম নেই। সারারাত এই ভাবে কেটে যায়।

সকালে শিশুর পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা আবার মন্দিরের ভিতরে আসে। অনেক সময়ে দেখা যায়, হিংস্র জন্তুর আক্রমণে বা অন্য কারণে শিশুর মৃত্যু হয়েছে। অনেক সময়ে দেখা যায়, জীবন্ত ও অক্ষত শিশুকে। তখন সকলে ছাইয়ের উপরে কোনও জন্তুর পদচিহ্ন আছে কিনা পরীক্ষা করে। পদচিহ্ন যদি না থাকে, তবে সেই শিশুকে আবার সেখানে একলা রাত্রিবাস করতে হয়। আর পদচিহ্ন যদি থাকে তবে পরখ করে দেখা হয়, সেগুলো কোন জন্তুর পদচিহ্ন।

যে জন্তুর পদচিহ্ন সেখানে থাকবে, সেই জন্তুই হবে শিশুর দেবতা,—তার সারাজীবনের উপাস্য!

এখন আবার বোম্বেটেরা কি করছে দেখা যাক।

প্রায় তিনমাস পরে খবর এসেছে, স্পানিয়ার্ডদের জাহাজ বন্দরে দেখা দিয়েছে। সবাই সেইদিকে ছুটল।

বড় যে সে জাহাজ নয়, প্রকাণ্ড আকার, উপরে অনেক সৈন্যসামন্ত, বিয়াল্লিশটা কামান!

কিন্তু এ সবের দিকে লোলোনেজ একটুও ভ্রূক্ষেপ করলে না, সে ভয়ের ধার ধারে না।

বোম্বেটেরা একজোট হয়ে জাহাজখানাকে আক্রমণ করলে এবং জাহাজের একশ ত্রিশজন সৈন্যও তাদের বাধা দেবার জন্যে কম চেষ্টা করলে না, তবু শেষকালে জিত হল বোম্বেটেদেরই। কিন্তু এত পরিশ্রম ও লোকক্ষয়ের পরে জাহাজ দখল করেও বোম্বেটেরা হতাশ হয়ে পড়ল। তার ভিতরে লুট করবার মতো বিশেষ কিছুই নেই।

লোলোনেজ তখন পরামর্শসভা আহ্বান করলে। সে বললে, "এইবারে আমি গুয়াটেমালার দিকে যেতে চাই। তোমাদের মত কি?"

অনেকেই বললে, "আমরা এইবার এ দেশ ছেড়ে ফিরে যেতে চাই।"

লোলোনেজ বললে, "কিন্তু আমি ফিরব না।"

তারা বললে, "কিন্তু আমরা ফিরব।"

যারা এ কথা বললে তাদের অধিকাংশই হচ্ছে নূতন লোক—লোলোনেজের পূর্ব অভিযানে তারা তার সঙ্গে ছিল না। গত অভিযানের ফল দেখে তারা ভেবেছিল বোম্বেটের জীবন হচ্ছে অত্যন্ত রঙিন, গাছ নাড়া দিলে যেমন ফল ঝরে, রাশি রাশি মোহর ঝরাও বুঝি তেমনই সহজ! কিন্তু তাদের লাখটাকার স্বপ্নঘোর আজ ছুটে গেছে।

তারা দলে রইল না। লোলোনেজের দলকে একেবারে হালকা করে দিয়ে বেশিরভাগ বোম্বেটেই কয়েকখানা জাহাজ নিয়ে সরে পড়ল। বনে বনে কাঁটাঝোপে ঘুরে, অনাহারে অল্পাহারে অনিদ্রায় কষ্ট পেয়ে ও স্পানিয়ার্ডদের গরম গরম গুলি খেয়ে খেয়ে তাদের শখ ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল!

দল খুব ছোট হয়ে গেল, অন্য কেউ হলে এখানে আর থাকত না, কিন্তু একগুঁয়ে লোলোনেজ গ্রাহ্যও করলে না। সিংহের মতন তার মেজাজ—নিষ্ঠুর, গর্বিত, অদম্য! সমুদ্রের কিনারে কিনারে বনের ভিতর দিয়ে বোম্বেটের দল চলেছে। খাদ্যাভাব হওয়াতে তারা বানর মেরে তারই মাংস ভক্ষণ করতে লাগল—তবু অজানার নেশায় পথ চলা তাদের থামল না। কিন্তু তখনও লোলোনেজ আন্দাজ করতে পারেনি, তার পাপের পেয়ালা কানায় কানায় ভরে উঠেছে!

যেখানে দিয়ে তারা যাচ্ছে সেখানকার রেড ইন্ডিয়ানরাও যে শান্ত ছেলে নয়, একদিন তার প্রমাণ পাওয়া গেল। আগেই বলেছি, বোম্বেটেরা রেড ইন্ডিয়ানদেরও ওপরে কম নিষ্ঠুর ব্যবহার করেনি, সুতরাং তারাও তাদের বাগে পেলে ছেড়ে কথা কয় না।

বোম্বেটেদের দলে একজন ফরাসি ও একজন স্পানিয়ার্ড ছিল।

একদিন তারা দলছাড়া হয়ে খাদ্য বা অন্য কিছুর খোঁজে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সময়ে দেখতে পেলে, একদল সশস্ত্র রেড ইন্ডিয়ান তাদের দিকে ছুটে আসছে!

ছুটে কাছে এসে তারা যে আদর করে তাদের কোলে টেনে নেবে না, বোম্বেটেরা এটুকু বেশ বুঝতে পারলে। তারাও তরোয়াল বার করলে, কিন্তু দু'খানা তরবারি দ্বারা এত লোককে ঠেকানো সোজা কথা নয়। তখন তারা পদযুগলের ওপরে নির্ভর করাই উচিত মনে করলে।

ফরাসি বোম্বেটের পদযুগল এমন সুপটু ছিল যে, তীরের মতন সে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু স্পানিয়ার্ড ভায়া পায়ের কাজ ভাল করে শেখেনি, রেড ইন্ডিয়ানরা তাকে ধরে ফেললে।

দু'চারদিন পরে অন্যান্য বোম্বেটেদের সঙ্গে সেই ফরাসি আবার সঙ্গীর খোঁজে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হল।

দেখা গেল, সেখানে একটা অগ্নিকুণ্ড রয়েছে, কিন্তু তার ভেতরে আগুন নেই। খানিক তফাতে পড়ে রয়েছে কতকগুলো হাড়। বোম্বেটেরা আন্দাজ করলে, স্পানিয়ার্ড ভায়ার দেহে 'রোস্ট' বানিয়ে রেড-ইন্ডিয়ানরা উদর পরিতৃপ্ত করেছে! অবশ্য এ অনুমান ভুল হতে পারে। কিন্তু স্পানিয়ার্ডকে আর পাওয়া যায়নি।

এদিকে লোলোনেজের অবস্থা কেমন দাঁড়িয়েছে দেখুন। দলের অনেকে তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ায় সে শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। বিপদের ওপর বিপদ! রেড ইন্ডিয়ানরা স্পানিয়ার্ডদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পিছনে লেগেছে। বোম্বেটেদের তারা বুঝেছে। এই হতচ্ছাড়া বোম্বেটেগুলো হচ্ছে, কলেরা বসন্ত ও প্লেগের মতো সমস্ত মানুষ জাতেরই শত্রু! এদের উচ্ছেদ না করতে পারলে শান্তি নেই!

দিনের পর দিন তাদের সঙ্গে লড়ে লড়ে বোম্বেটেদের অধিকাংশই মারা পড়ল। তবু লোলোনেজ ফেরবার নাম মুখে আনে না!

কিন্তু শেষটা ফিরতে হল। এবার ফিরে লোলোনেজ তার সত্যিকার স্বদেশে গেল—অর্থাৎ নরকে; এবং সেই মহাপ্রস্থানের দৃশ্য লোলোনেজেরই উপযোগী।

ডেরিয়েন প্রদেশের রেড ইন্ডিয়ানরা একদিন বোম্বেটেদের ক্ষুদ্র দলকে আক্রমণ করলে। তাদের বেশির ভাগ মারা পড়ল, কতক পালাল, কতক বন্দি হল। বন্দীদের ভিতরে ছিল লোলোনেজ স্বয়ং! হাজার হাজার বন্দীর রক্তে যার হাত এখনও ভিজে আছে, সেই লোলোনেজ আজ বন্দী!

এমন বন্দীকে যে ভাবে অভ্যর্থনা করতে হয়, রেড ইন্ডিয়ানরা তাই করলে। তারা আগে লোলোনেজকে একটা গাছের গুঁড়িতে বাঁধলে। তারপর তার সমুখে বড় অগ্নিকুণ্ড জ্বাললে।

কেউ হয়তো জীবন্ত লোলোনেজের নাক কেটে নিয়ে আগুনে ফেলে দিলে। কেউ কেটে নিলে কান। কেউ কাটলে জিভ। কেউ কাটলে হাত এবং কেউ বা পা। এইভাবে ক্রমে ক্রমে তার ভয়াবহ মৃত্যু ঘটল। তার দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যখন পুড়ে ছাই হয়ে গেল, রেড

ইন্ডিয়ানরা তখন সেই ছাইগুলো নিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিলে—যাতে এই অমানুষিক মানুষের কোনও ঘৃণিত স্মৃতিই পৃথিবীকে আর কলঙ্কিত না করতে পারে!

তার পাপসঙ্গীদেরও ওই দুর্দশাই হল। কেবল একজন অনেক সাধ্যসাধনার পর কোনগতিকে শেষটা মুক্তি পেয়েছিল; বোম্বেটেদের এই শোচনীয় পরিণামের কথা প্রকাশ পায় তার মুখেই।

লোলোনেজের পরিণামই আভাস দেয় যে, জীবের শিয়রে হয়তো সত্যই কোনও অদৃশ্য মহাবিচারকের দৃষ্টি সর্বদাই সজাগ হয়ে আছে!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এ অঞ্চলের জানোয়ার

যে মুল্লুকের মানুষ-জানোয়ারের কথা নিয়ে এত আলোচনা করছি, সেখানে জলে-স্থলে আসল জানোয়ারও আছে অনেক রকম। মাঝখানে একটুখানি হাঁপ ছাড়বার জন্যে তাদের কারুর কারুর কথা এখানে কিছু বলতে চাই।

এখানে স্থলে থাকে অজগর, জাগুয়ার, পুমা, বানর, টেপির, প্রবাল সাপ, অন্ধ সাপ, আর্মাডিলো, ভ্যাম্পায়ার বাদুড় প্রভৃতি এবং জলে থাকে কুমির, হাঙর, লণ্ঠন মাছ, ব্যাঙ মাছ, কাছিম, শুশুক, অক্টোপাস, খুনে তিমি, স্কুইড, উকো মাছ, ছিপধারী মাছ, পাইপ মাছ, সিল, উড়ন্ত মাছ, ফিতে মাছ, এবং অন্যান্য তিমি জাতীয় মাছ প্রভৃতি,—সব জীবজন্তুর ফর্দও এখানে দেওয়া অসম্ভব। এদের মধ্যে অনেক জন্তুই খোশমেজাজে ও বোম্বেটেদের চেয়ে কম হিংসকুটে নয়, একটু সুবিধা পেলেই মানুষকে ফলার করবার জন্যে তারা হাঁ করে ছুটে আসে!

দু'একটা জন্তুর ভীষণ প্রকৃতির কথা এখানে বলব।

এখানে যে জাতের কুমির পাওয়া যায়, তাদের 'কেম্যান' বলে ডাকা হয়। ভারতীয় কুমিরের সঙ্গে তাদের চেহারা ও প্রকৃতি ঠিক মেলে না। বোম্বেটেরা এইসব কুমিরের ভয়ে সর্বদাই তটস্থ হয়ে থাকত। একজন বোম্বেটে এই 'কেম্যান' সম্বন্ধে যা বলছে তা হচ্ছে এই।

"এই সব কেম্যান ভয়ঙ্কর জীব। সময়ে সময়ে এক একটা সত্তর ফুট লম্বা কেম্যানও দেখা গিয়েছে। নদীর ধার ঘেঁসে এমন নিশ্চেষ্ট হয়ে তারা ভাসতে থাকে যে দেখলেই মনে হয়, যেন একটা পুরনো গাছ পড়ে গিয়ে জলে ভাসছে। সেই সময়ে কোনও গরু কি মানুষ নদীর ধারে এলে আর তার বাঁচোয়া নেই!

এদের দুষ্টুবুদ্ধিও বড় কম নয়। শিকার ধরবার আগে তিন-চারদিন ধরে এরা উপোস করে। সেই সময়ে ডুব মেরে নদীর তলায় গিয়ে কয়েক মণ পাথর বা নুড়ি গিলে ফেলে এরা নিজেদের দেহ আরও বেশি ভারি করে তোলে। ফলে তাদের স্বাভাবিক শক্তি অধিকতর বেড়ে ওঠে।

কেম্যানরা শিকার ধরে টাটকা মাংস খায় না। আধ পচা না হওয়া পর্যন্ত তাদের জলের তলায় ডুবিয়ে রাখে। তাদের আরও অদ্ভুত রুচি আছে। এখানকার লোকেরা নদীর কাছাকাছি জায়গায় যদি মরা জন্তুর চামড়া শুকোবার জন্যে রেখে দেয়, তাহলে কেম্যানরা প্রায়ই ডাঙায় উঠে সেগুলো চুরি করে নিয়ে পালায়। সেই চামড়াগুলো কিছুদিন জলে ভিজলেই তাদের লোমগুলো ঝরে পড়ে যায়। তখন তারা সেগুলো খেয়ে ফেলে।

একদিন একজন লোক নদীর জলে তার তাঁবু কাচছিল। হঠাৎ একটা কেম্যান এসে সেই তাঁবু কামড়ে ধরে জলে ডুব মারবার চেষ্টা করলে। সে ব্যক্তি অত সহজে তাঁবু খোয়াতে নারাজ হল—তাঁবুর একদিক ধরে প্রাণপণে টানাটানি করতে লাগল। বাধা পেয়ে কেম্যানের মেজাজ গেল চটে। সে এক ডিগবাজি খেয়ে জল থেকে ডাঙায় উঠে তাঁবুর অধিকারীকেও নিয়ে নদীর মধ্যে ডুব মারবার ফিকির করলে।

ভাগ্যে লোকটির কাছে একখানা বড় কসাই ছুরি ছিল এবং ভাগ্যে সে কেম্যানের দেহের ঠিক জায়গায় ছুরিখানা দৈবগতিকে বসিয়ে দিতে পারলে, তাই লোকটিকে ছেড়ে দিয়ে সেই জলদানব তখনই খাবি খেতে বাধ্য হল! তার পেট ফেঁড়ে পাওয়া গেল রাশি রাশি বড় বড় নোড়ানুড়ি!

কেবল বড় বড় জীব নয়, কেম্যানরা পুঁচকে মাছি পেলেও টপ করে খেয়ে ফেলতে ছাড়ে না।

কেম্যানরা ডাঙায় উঠে ডিম ছাড়ে এবং ডিমগুলোর উপরে পা দিয়ে বালি ছড়িয়ে দেয়। রোদের আঁচে ডিম ফোটে, এবং বাচ্চাগুলো ডিম ছেড়ে বেরিয়েই জলের ভিতরে চলে যায়। পাখিরা অনেক সময়ে ডিম নষ্ট করে। মা কেম্যান সেদিকেও নজর রাখতে ভোলে না। পাখির ঝাঁক আসবার সম্ভাবনা দেখলে প্রায়ই তারা নিজেদের ডিম আবার কোঁৎ কোঁৎ করে গিলে ফেলে! তারপর বিপদ কেটে গেলে ডিমগুলোকে ফের হড়াৎ করে উগরে বার করে দেয়!

ডিম ফুটলে মা কেম্যান তার বাচ্চাদের নিয়ে জলে খেলা করে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, খেলা করতে করতে বাচ্চা কেম্যানরা তাদের মায়ের মুখের ভিতর দিয়ে পেটের ভিতরে গিয়ে ঢুকছে, আবার বেরিয়ে আসছে!

নদীপ্রধান জায়গায় আড্ডা গাড়তে হলে এই কেম্যানদের ভয়ে সব সময়েই আমরা ব্যস্ত থাকতুম। রাত্রে কারুকে পাহারায় না রেখে ঘুমোতে পারতুম না।

আমাদের দলের একজন লোক একবার তার কাফ্রি চাকরের সঙ্গে বনের ভিতরে ঢুকেছিল। কোথায় কোন ঝোপে একটা পাজি কেম্যান ঘুপটি মেরে ছিল, হঠাৎ সে বেরিয়ে এসে লোকটির একখানা পা কামড়ে ধরে মাটিতে পেড়ে ফেললে। তাই না দেখেই কাফ্রি চাকরটা—সাহায্য করা দূরে থাক—টেনে লম্বা দিলে।

আমাদের বন্ধু ভীরু ছিল না, বিপদে পড়ে ভেবড়ে গেল না। তার গায়ে জোরও ছিল যথেষ্ট, যদিও সে জোর কেম্যানের পাল্লায় পড়ে বেশি কাজে লাগল না। কিন্তু সে তার লম্বা ছুরিখানা নিয়ে কেম্যানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। এ যুদ্ধ ডাঙায় হচ্ছিল বলেই রক্ষা, তাই খানিকক্ষণ যোঝাযুঝির পরে অনেকগুলো ছুরির ঘা খেয়ে কেম্যানটা ছটফট করতে করতে মারা পড়ল। আমাদের বন্ধুর সর্বাঙ্গ তখন ক্ষতবিক্ষত। রক্তপাতে নেহাৎ দুর্বল হয়ে সেইখানেই মড়ার মতো পড়ে রইল।

এতক্ষণ পরে কাফ্রিবীরের মনে হল, তার মনিবের অবস্থাটা কিরকম, একবার উঁকি মেরে দেখে আসা উচিত! তার মনিবের দেহ কেম্যানের উদরে অদৃশ্য হয়ে যায়নি দেখে সে আশ্বস্ত হয়ে তাকে পিঠে তুলে নিয়ে প্রায় তিন মাইল পথ পেরিয়ে আমাদের কাছে এসে হাজির হল। আমরা তখনই তাকে জাহাজে নিয়ে এলুম।

এই বদমাইশ কেম্যানরা প্রায়ই আমাদের জাহাজের কাছে আসত এবং জাহাজের গায়ে আঁচড়াআচড়ি করত। একদিন দড়িতে লোহার হুক লাগিয়ে আমরা একটা মস্ত কেম্যান ধরলুম। ধরা পড়ে সে কিন্তু জলের দিকে গেল না, উল্টে জাহাজের মই বেয়ে উপর দিকেই উঠতে লাগল! তখন আমরা ব্যস্ত হয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তার দফা একেবারে রফা করে দিলুম!"

ও মুল্লুকে খোলা হাওয়ায় রাত্রে কি ঘুমিয়েও নিশ্চিন্ত হবার যো আছে? ওখানে রাত্রে পিশাচবাদুড়রা শিকার খোঁজে! তারা এমন চুপিসাড়ে এসে মানুষের গায়ে ক্ষুরধার দাঁত দিয়ে ছ্যাঁদা করে রক্ত টেনে নেয় যে, মানুষের ঘুম প্রায়ই ভাঙে না। আর না ভাঙাই ভাল! কারণ রক্তপানের পর ওই পিশাচবাদুড়েরা লালা দিয়ে ক্ষতস্থানের মুখ বন্ধ করে দিয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ বাধা পেয়ে তারা যদি উড়ে যেতে বাধ্য হয়, তাহলে ক্ষতের রক্তপড়া আর সহজে বন্ধ হতে চায় না। পিশাচবাদুড়ের লালা কেবল রক্ত বন্ধ করে না, ক্ষতস্থান বিষিয়ে উঠতেও দেয় না।

এ দেশে বাঘ জাতীয় জন্তুদের মধ্যে জাগুয়ার আর পুমাই প্রধান। জাগুয়ার পুমার চেয়ে আকারে বড় হয় এবং তার প্রকৃতিও বেশি হিংস্র। তারা প্রায়ই মানুষকে আক্রমণ করতে ছাড়ে না। তাদের আক্রমণ আরও বিপজ্জনক এইজন্যে যে, তারা গাছের ডালে পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকে এবং তাদের কখন যে কার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার বিদকুটে শখ হবে, আগে থাকতে তা জানতে পারা যায় না।

পুমারাও গাছে চড়তে পারে। ব্রেজিলে তাদের 'কাউগার' বলে ডাকা হয়। উত্তর আমেরিকায় তাদের আর একটা নাম—'পেন্টার'। 'পুমা' হচ্ছে পেরু দেশিয় নাম—যদিও ওই নামই বেশি চলে। তারা ল্যাজসুদ্ধ লম্বা হয় ছয় থেকে নয়ফুট পর্যন্ত।

পুমারা সবচেয়ে খেতে ভালবাসে ঘোড়ার মাংস। অভাবে গরু, মোষ, শূকর, হরিণ, ভেড়া, খরগোশ—এমনকি ইঁদুর ও শামুক পর্যন্ত! বানরও তাদের মনের মতো। বানররা এ গাছ থেকে ও গাছে লাফিয়েও পার পায় না, কারণ গাছে গাছে লাফালাফি করতে বানরদের চেয়ে পুমারাও কম তৎপর নয়। মাটি থেকে বিশ ফুট উঁচুতে লাফিয়ে পুমারা গাছের ডালে চড়তে পারে! দীর্ঘ লম্ফে তারা প্রায় চল্লিশ ফুট জমি পার হয়ে যায়।

কিন্তু মানুষের পক্ষে পুমা মোটেই বিপজ্জনক নয়। কারণ তারা মানুষকে সহজেই কাত করে ফেলতে পারলেও সাধারণত মানুষকে তেড়ে আক্রমণ করে না। এমন কি, অনেক সময়ে মানুষ তাকে আক্রমণ করলেও সে আত্মরক্ষার চেষ্টা পর্যন্ত করে না! অথচ এই পুমা তার চেয়ে বড় ও হিংস্র জীব জাগুয়ারকেও আক্রমণ করে।

মধ্য আমেরিকার এক কাঠুরে একদিন জঙ্গলে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা পুমা ল্যাজ তুলে বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এবং আদুরে বিড়ালের মতো ঘড়র ঘড়র শব্দ করতে করতে সেই কাঠুরের পায়ের ফাঁক দিয়ে খেলাচ্ছলে আনাগোনা করতে লাগল! কিন্তু সেই পুমা বেচারার অদৃষ্ট ছিল নেহাৎ মন্দ। কারণ কাঠুরে এমন ভয় পেলে যে, তার কুড়ুলের বাড়ি পুমাকে দিলে এক ঘা বসিয়ে! পুমা তখন সেই বদরসিকের কাছ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হল।

হাডসন সাহেব বলেন, "আমি একবার একটা পুমাকে বধ করে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলুম। তাকে ধরেছিলুম আমি গলায় ফাঁসকল লাগিয়ে। সে একটা পাথরে ঠেসান দিয়ে চুপ করে বসে

রইল। আমি যখন ছোরা তুললুম সে পালাবার চেষ্টা পর্যন্ত করলে না। তাকে দেখে মনে হল, আমি যে তাকে বধ করব সে যেন তা বুঝতে পেরেছে! সে কাঁপতে লাগল, তার দু'চোখে জল ঝরতে লাগল, সে করুণস্বরে আর্তনাদ করতে লাগল। তাকে বধ করার পর আমার মনে হল আমি যেন হত্যাকারী!"

রেড ইন্ডিয়ানরা কিছুতেই পুমাকে মারতে চায় না। তাদের বিশ্বাস, পুমাকে বধ করলে সেই মুহূর্তেই মানুষের মৃত্যু হয়। রেড ইন্ডিয়ানরাই হচ্ছে আমেরিকার আদিম অধিবাসী। তারা পুমাকে মারে না বলেই বোধহয় পুমাও মানুষকে হিংসা করতে অভ্যস্ত হয়নি।

গরিলার মতো বড় জাতের বানর পৃথিবীতে আর নেই বলে শোনা যায়। কিন্তু হালে দক্ষিণ আমেরিকায় টাররা নদীর ধারে অদ্ভুত ও বৃহৎ এক অজানা জাতের বানরের সন্ধান পাওয়া গেছে।

একদল লোক নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছিল, আচম্বিতে দু'টো প্রকাণ্ড বানর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তাদের আক্রমণ করে। একটাকে তারা গুলি করে মেরে ফেললে এবং অন্যটা আবার জঙ্গলের আড়ালে পালিয়ে গেল। যেটা মারা পড়ল সেটা স্ত্রীজাতীয় বানর হলেও তার মাথার উচ্চতা পাঁচফুটেরও বেশি। এর থেকেই বোঝা যায়; এ জাতের নর-বানররা মাথায় আরও বেশি ঢ্যাঙা। এই অদ্ভুত জীব অনেকটা গরিলার মতো দেখতে হলেও গরিলা নয় মোটেই। পণ্ডিতরা বলছেন, এরা মানুষ ও বানরের মাঝামাঝি জীব! এই নূতন আবিষ্কার জীবতত্ত্ববিদদের মধ্যে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। পণ্ডিতরা বহুদিন ধরে মানুষ ও বানরের মাঝামাঝি জীবের সন্ধান করে আসছেন, হয়তো এরা তাঁদের চিন্তার খোরাক জোগাবে। এদের গায়ের জোর কত, আজও সে পরীক্ষার সুবিধা পাওয়া যায়নি, তবে শক্তিতে হয়তো এরাও গরিলার চেয়ে কম যায় না।

নবম পরিচ্ছেদ

মহাবীর গভর্নর!

এইবার কাপ্তেন মর্গ্যানের পালা শুরু করা যাক। প্রথম পরিচ্ছেদেই মর্গ্যানের মোটামুটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি দিয়েছি। এই চাষার ছেলে মর্গ্যান বোম্বেটের ব্যবসায় অবলম্বন করেও কেমন করে 'স্যার' পদবি পেয়ে লাটের গদিতে বসেছিল তারই বিচিত্র ইতিহাস বলব। এ সত্য ইতিহাস যে কোনও কাল্পনিক উপন্যাসেরও চেয়ে চিত্তাকর্ষক।

মর্গ্যানের আর একটা উপাধি হচ্ছে—"বোম্বেটের রাজা"! লোলোনেজের চেয়ে সে কম শক্তি পরিচয় তো দেয়নি বটেই, বরং সময়ে সময়ে তার কীর্তি লোলোনেজের যশগৌরবকেও ম্লান করে দিয়েছে!

হেনরি মর্গ্যানের জন্ম ইংলণ্ডের ওয়েলস প্রদেশে। তার বাবা ছিলেন এক সাধু ও ধনী চাষী—নিজের সমাজে তিনি ছিলেন এক মাননীয় ব্যক্তি। কিন্তু ছেলেবয়স থেকেই বাপের কাজে মর্গ্যানের একটুও রুচি ছিল না। অতএব পিতার আশ্রয় ছেড়ে সে সাগরগামী জাহাজে একটা নিচু কাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সেই কাজের মেয়াদ ফুরোবার পর মর্গ্যান এল জামাইকা দ্বীপে। এটি ছিল বোম্বেটেদের আর একটি প্রিয় দ্বীপ। বেকার হয়ে বসে না থেকে মর্গ্যান বোম্বেটেদের এক জাহাজে চাকুরি গ্রহণ করলে। সমুদ্রে তিন-চারবার বোম্বেটেধর্ম পালন করে সে এ বিষম ব্যবসায়ের যা কিছু শেখবার সব শিখে ফেললে—এমন ভাল ছাত্র বোম্বেটেরা খুব কমই পেয়েছে!

তারপর কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে পরামর্শের পর মর্গ্যান স্থির করলে, তারাও সকলে মিলে রোজগারের পয়সা দিয়ে একখানা জাহাজ ক্রয় করবে। রত্নাকর বহু রত্নের আকর—একখানা জাহাজ কিনলেই তা আহরণ করা ভারি সহজ।

জাহাজ কেনা হল। দলের ভিতরে মর্গ্যানই ছিল সকলের চেয়ে সাহসী, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। কাজেই দলের বাকি সবাই একবাক্যে তাকেই দলপতি বা কাপ্তেন বলে মেনে নিলে। সেইদিন মর্গ্যানের ছেলেবেলাকার স্বপ্ন সফল হল।

লোলোনেজের পরিণাম দেখে যেমন ধারণা হয় যে, কোনও একজন মহাবিচারক সর্বদা সজাগ হয়ে আছেন, মর্গ্যানের জীবনকাহিনী পড়লে তেমনই সন্দেহ হয় যে, মাঝে মাঝে সেই মহাবিচারকও হয়তো ঘুমিয়ে পড়েন!

প্রথমবারের সমুদ্রযাত্রাতেই নতুন কাপ্তেনের উপরে অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হল। সে একে একে অনেকগুলো জাহাজ দখল করে আবার জামাইকায় ফিরে এল। এবং এই অভাবিত সাফল্যে বোম্বেটেদের ভিতরে তার মানসম্ভ্রম বেড়ে উঠল অত্যন্ত!

জামাইকা দ্বীপে ছিল এক বুড়ো বোম্বেটে, তার নাম ম্যানসভেল্ট। সে এই সময়ে খুব বড় এক নৌ-বাহিনী গঠন করে চারিদিকে লুটপাট করবার আয়োজনে ব্যস্ত ছিল। সে দেখলে, মর্গ্যান হচ্ছে একজন মস্ত কাজের লোক। অতএব তাকে সে নিজের ভাইস আডমিরালের পদে নির্বাচন করে নিলে। ভুল নির্বাচন হয়নি! এই হল মর্গ্যানের বোম্বেটে জীবনের দ্বিতীয় উন্নতি।

পনেরখানা জাহাজ ও পাঁচশ বোম্বেটে নিয়ে ম্যানসভেল্ট ও মর্গ্যান সমুদ্রে পাড়ি দিলে। তারা প্রথমেই স্পানিয়ার্ডদের দ্বারা অধিকৃত সেন্ট কাথারাইন দ্বীপে গিয়ে নামল। তারপর লড়াই করে স্পানিয়ার্ডদের কাছ থেকে সেই দ্বীপটা কেড়ে নিলে।

কিন্তু তার অল্পদিন পরেই বুড়ো বোম্বেটে ম্যানসভেল্ট পৃথিবীর লীলাখেলা সাঙ্গ করে ভগবানের কাছে জবাবদিহি করতে চলে গেল।

তারপর কাপ্তেন মর্গ্যান নিজেই এক নৌ-বাহিনী গঠন করলে। বারখানা ছোট বড় জাহাজ ও সাতশ লোক নিয়ে আবার সে বেরিয়ে পড়ল। দু'একটা ছোটখাট শহর লুট করলে। কিন্তু লুটের মাল ভাগ করবার সময়ে বোম্বেটেদের মধ্যে এমন মন কষাকষি হল যে, কাপ্তেন মর্গ্যানের কাছ ছেড়ে একদল লোক রাগ করে চলে গেল। তাদের সন্দেহ হয়েছিল, মর্গ্যান জুয়াচুরি করে অনেক টাকা সরিয়ে ফেলেছে। খুব সম্ভব, তাদের সে সন্দেহ মিথ্যা নয়। যারা দল ছাড়ল তারা সবাই ফরাসি। মর্গ্যানের সঙ্গে রইল কেবল ইংরেজ বোম্বেটেরা।

কিন্তু দল ছোট হয়ে গেল বলে মর্গ্যান একটুও দমল না। আরও কিছু লোক ও জাহাজ সংগ্রহ করে মর্গ্যান আর একদিকে আবার পাড়ি দিলে। কোথায় যাওয়া হবে সেকথা কারুর কাছে প্রকাশ করলে না। খালি বললে, "আমি তোমাদের সর্দার, তোমাদের ভালমন্দের জন্যে আমিই দায়ী রইলুম। আমাকে বিশ্বাস করো, তাহলেই চটপট তোমরা ধনী হতে পারবে।"

বোম্বেটেরা মর্গ্যানের কথায় বিশ্বাস করলে!

দিন কয় পরে তারা কোস্টারিকা দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হল।

তখন মর্গ্যান বললে, "আমরা পোর্টো বেলো শহর লুট করতে যাচ্ছি। এ কথা আমি আর কারুকে বলিনি, সুতরাং চরের মুখে খবর পেয়ে শত্রুরা সাবধান হবার সময়ও পায়নি।"

দু'একজন প্রধান বোম্বেটে বললে, "পোর্টো বেলো হচ্ছে মস্ত শহর, সেখানে অনেক সৈন্য আছে। আমাদের লোকসংখ্যা মোটে সাড়ে চারশ। কেমন করে আমরা অতবড় শহর দখল করব?"

মর্গ্যান বললে, "আমাদের দল ছোট বটে, কিন্তু আমাদের জান খুব বড়। দল ছোট হলেই একতা আর লাভের সম্ভাবনা বেশি। কুছ পরোয়া নেই;—এগিয়ে চলো!"

অতঃপর পোর্টো বেলো নগরের একটু বর্ণনা দিতে হবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজে স্পেনিয় রাজ্যের মধ্যে পোর্টো বেলো তখন দুর্ভেদ্য নগর হিসাবে হাভানা ও কার্টেজেনার পরেই তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। বন্দরের পিছনেই নগরকে রক্ষা করবার জন্যে দু'টি বড় বড় দুর্গ আছে। এই দুর্গ দু'টির অজ্ঞাতসারে বন্দরের মধ্যে কোনও জাহাজ বা নৌকো প্রবেশ করতে পারে না। দুর্গ দু'টিও এমন সুরক্ষিত যে, সকলে তাদের অজেয় বলে মনে করে। প্রথম দুর্গটির মধ্যে তিনশ সৈন্য থাকে। নগরের এখনকার জনসংখ্যা সাড়ে নয়হাজারের উপরে, তখন কম ছিল।

মর্গ্যান সরাসরি বন্দরে প্রবেশ না করে, সেখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে সমুদ্রকূলে চুপিসাড়ে জাহাজ লাগালে। তারপর স্থলে পদব্রজে ও নদীতে নৌকোয় চড়ে তারা প্রথম দুর্গটির কাছে এসে পড়ল। দুর্গের অধিবাসীদের বলে পাঠালে—হয় আত্মসমর্পণ কর, নয় মরবার জন্যে প্রস্তুত হও।

উত্তরে দুর্গের কামানগুলো ভৈরব হুঙ্কারে অগ্নিবর্ষণ করলে। কামানগর্জন শুনে দূর থেকে নগরের বাসিন্দারা সভয়ে বুঝতে পারলে যে, কাছেই কোনও মস্ত বিপদ এসে আবির্ভূত হয়েছে।

নিকটবর্তী অঞ্চলের স্পানিয়ার্ডরা বোম্বেটেদের বাধা দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলে। কিন্তু কোনও ফল হল না, তারা হেরে গেল, অনেকে বন্দি হল। দুর্গের ভিতরের সৈন্যরাও শেষ পর্যন্ত দুর্গ রক্ষা করতে পারলে না। কোনওরকম পূর্বাভাস না দিয়ে শত্রু এমন অতর্কিত শিয়রে এসে পড়েছিল যে, তার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভবপর হল না। মর্গ্যান দুর্গ দখল করলে।

মর্গ্যান হুকুম দিলে, "প্রত্যেক বন্দীকে কেটে দু'খানা করে ফেল! শহরের লোকরা তাহলে বুঝতে পারবে, আমরা বড় লক্ষ্মীছেলে নই—আমাদের বাধা দিলে তাদেরও নিশ্চিত মরণ!"—বন্দীদের মাথাগুলো উড়ে গেল।

দুর্গের ভিতরের সে সকল সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষরা ধরা পড়েছিল, তাদের একটা ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। এইবার বারুদখানায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল, দুর্গসুদ্ধ সমস্ত প্রাণী শূন্যে উড়ে পঞ্চভূতে মিশিয়ে গেল। কেবল দুর্গের অধ্যক্ষ প্রাণ নিয়ে নগরে প্রস্থান করতে পারলেন।

বোম্বেটেরা নগর আক্রমণ করতে চলল। সেখানকার বাসিন্দারা তখনও আত্মরক্ষার সময় পায়নি—তারা আত্মরক্ষা করতে পারলেও না। পোর্টো বেলোর গভর্নর তাদের কোনওরকমে

উত্তেজিত করতে না পেরে, বাকি যে দুর্গটা তখনও শত্রুহস্তগত হয়নি, তার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

বোম্বেটেরা নগর দখল ও লুট করে অনেক পাদ্রীকে সপরিবারে বন্দি করলে। ওদিকে দুর্গ থেকে তাদের উপরে গোলাগুলি বৃষ্টি হচ্ছিল অজস্রধারে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে বোম্বেটেরাও দুর্গ আক্রমণ করলে। তাদের এ আক্রমণের আর এক উদ্দেশ্য, শহর থেকে অনেক নাগরিক বহু ধনসম্পত্তি নিয়ে কেল্লার ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

সারাদিন যুদ্ধ চলল—কোন পক্ষের জয় হবে তখনও তা অনিশ্চিত। অনেক বোম্বেটে মারা পড়ল—তবু তারা কেল্লার কাছ ঘেঁষতে পারলে না। তারা বোমা ছোড়বার সুযোগ পর্যন্ত পেলে না—কেল্লার পাঁচিলের কাছে গেলেই উপর থেকে হুড়মুড় করে ভারি ভারি পাথর ও জ্বলন্ত বারুদ এসে পড়ে তাদের যমালয়ে পাঠিয়ে দেয়।

মর্গ্যান প্রায় হতাশ হয়ে পড়ে শেষ উপায় অবলম্বন করলে।

সে আগে কেল্লার পাঁচিলে ওঠবার জন্যে খুব উঁচু দশ-বারখানা মই তৈরি করালে। তারপর বন্দি পাদ্রী ও তাঁদের স্ত্রী-কন্যাদের বললে, সেই মইগুলো পাঁচিলের গায়ে লাগিয়ে দিয়ে আসতে।

গভর্নরকে জানানো হল, "এখনও আত্মসমর্পণ কর।"

গভর্নর বললেন, "প্রাণ থাকতে নয়।"

তখন মই নিয়ে যাবার হুকুম হল। মর্গ্যান ভেবেছিল, সপরিবারে ধর্মযাজকেরা মই নিয়ে অগ্রসর হলে গভর্নর তাঁদের উপরে আর গুলিবৃষ্টি করতে পারবেন না।

বোম্বেটের দল পাদ্রীদের পিছনে পিছনে এগিয়ে পিস্তল উঁচিয়ে বললে, "শীঘ্র পাঁচিলে গিয়ে মই লাগাও। নইলে গুলি করে মেরে ফলব।"

কেল্লার পাঁচিলের উপরেও গভর্নর সৈন্য সাজিয়ে রেখেছিলেন, তারাও বন্দুক তুললে।

পাদ্রী ও তাঁদের পরিবারবর্গ করুণ চিৎকারে স্পানিয়ার্ডদের বললেন, "আমরা তোমাদেরই ধর্মযাজক বাবা, আমাদের মেরো না।"

কিন্তু মর্গ্যান এই বীর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গভর্নরকে ভুল বুঝেছিল—সৈনিকধর্ম পালনের জন্যে তিনি আর সব ধর্মকে বর্জন করতে প্রস্তুত।

সপরিবারে ধর্মযাজকেরা কাঁধে মই নিয়ে অগ্রসর হলেন, সঙ্গে সঙ্গে কেল্লার উপর থেকে শিলাবৃষ্টির মতো গোলাগুলি এসে তাঁদের ভূতলশায়ী করতে লাগল। বাইরে থেকে শত্রুই হোক আর মিত্রই হোক, কেল্লার ত্রিসীমানায় কারুকে আসতে দেওয়া হবে না—এই ছিল গভর্নরের প্রতিজ্ঞা।

পাদ্রী ও তাঁদের পরিবারবর্গের দেহ একে একে মাটির উপরে আছড়ে পড়তে লাগল। কিন্তু তবু তাঁরা কোনওরকমে পাঁচিলের গায়ে মই লাগিয়ে পালিয়ে এলেন। তখন বোম্বেটেরা বোমা ও বারুদের পাত্র হাতে করে পাঁচিলের উপরে গিয়ে দাঁড়াল এবং কেল্লার ভিতরে সেইসব নিক্ষেপ করতে লাগল।

স্পানিয়ার্ডরা তখন বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করলে।

কিন্তু সেই বীর গভর্নর! কোনও আশা নেই, তবু তিনি অটল! তখনও নিজের সৈন্যদের ডেকে তিনি বলছেন, "অস্ত্র নাও, অস্ত্র নাও! শত্রুবধ করো!"

কেউ তাঁর কথায় কান পাতলে না, তারা বোম্বেটেদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে জীবনভিক্ষা করতে লাগল।

—"তবে মর কাপুরুষ কুকুরের দল!"—এই বলে তাঁর যেসব সৈন্য কাছাকাছি ছিল, মুক্ত তরবারি নিয়ে তিনি তাদের উপরে গিয়ে পড়লেন এবং নিজের হাতেই নিজের সৈন্যদের বধ করতে লাগলেন।

বোম্বেটেদের নীচহৃদয় পর্যন্ত এই অসাধারণ বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে গেল। তারা সসম্ভ্রমে বললে, "এখন আপনি আত্মসমর্পণ করবেন তো?"

গভর্নর দৃঢ়হস্তে অসিধারণ করে সগর্বে মাথা তুলে বললেন, "নিশ্চয়ই নয়! কাপুরুষের মতো তোদের হাতে আমি ফাঁসিতে মরব না—আমি মরতে চাই লড়াই করতে করতে বীর সৈনিকের মতো।"—বলেই তিনি আবার তাদের আক্রমণ করলেন।

গভর্নরের সহধর্মিণী ও কন্যা কাঁদতে কাঁদতে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন—"ওগো তুমি অস্ত্র ছাড়ো! আত্মহত্যা করে আমাদের পথে বসিও না!"

কিন্তু সেই বীরের পাথর-প্রাণ কোনও অশ্রুই নরম করতে পারলে না—সিংহের মতো একলাই তিনি অগুণতি শত্রুর সঙ্গে যুঝতে লাগলেন।

বোম্বেটেরা তাঁকে জীবন্ত অবস্থায় বন্দি করবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলে—কিন্তু পারলে না। শেষ পর্যন্ত শত্রু মারতে মারতে নিজের শেষ রক্তপাত করে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। যে জাতির মধ্যে এমন বীরের জন্ম হয় সে জাতি ধন্য!

তারপর যা হবার তা হল। অত্যাচার, লুণ্ঠন, হত্যা। পোর্টো বেলোর যত ঐশ্বর্য দুর্গের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছিল, সমস্তই বোম্বেটেরা হস্তগত করলে। অত বড় বীর গভর্নরের হাত থেকে অমন অজেয় দুর্ভেদ্য দুর্গ এত কম সৈন্য নিয়ে মর্গ্যান যে কি করে কেড়ে নিলে, সকলেরই কাছে সেটা প্রহেলিকার মতো বোধ হল।

পানামা নগরের স্পানিয়ার্ড গভর্নর সবিস্ময়ে বোম্বেটেদের কাছে দূত পাঠিয়ে জানতে চাইলেন,—"কোন আশ্চর্য হাতিহার দিয়ে তোমরা দুর্গের অত বড় বড় কামান ব্যর্থ করে দিয়েছ?"

মর্গ্যান সহাস্যে দূতের হাতে একটা ছোট পিস্তল দিয়ে বলে পাঠালে, "কেবল এই আশ্চর্য হাতিয়ার দিয়ে আমি কেল্লা ফতে করেছি! এই অস্ত্র আমি এক বৎসরের জন্যে আপনাকে দান করলুম। তারপর নিজেই পানামায় গিয়ে আমার অস্ত্র আবার আমি ফিরিয়ে আনব।"

পানামার গভর্নর তখনই সেই পিস্তল ফেরৎ পাঠিয়ে বললেন, "এ অস্ত্রে আমার দরকার নেই। তোমাকে আর কষ্ট করে পানামায় আসতে হবে না। কারণ পোর্টো বেলোর মতো এত সহজে পানামা আত্মদান করবে না।"

পোর্টো বেলো* শহরে শরীরী মড়কের মতো এক পক্ষকাল বাস করে চারিদিকে হাহাকার তুলে মর্গ্যান সদলবলে আবার জাহাজে এসে উঠল। বিপুল ঐশ্বর্য নিয়ে তারা কিউবা দ্বীপে ফিরে এল। বোম্বেটেদের সবাই বুঝলে, লোলোনেজের অভাব পূরণ করতে পারে এখন কেবল এই কাপ্তেন মর্গ্যান! তার তারকা আজ উদীয়মান!

* পানামা প্রদেশের একটি নগর।

দশম পরিচ্ছেদ

অমানুষী অত্যাচার ও অগ্নিপোত

মর্গ্যান তারপর এল জামাইকা দ্বীপে—এখানকার গভর্নর হচ্ছেন তারই স্বজাতি, অর্থাৎ ইংরেজ।

মর্গ্যানের শক্তি ও খ্যাতি শুনে ফুলমধুলোভী ভ্রমরের মতো চারিদিক থেকে বোম্বেটের পর বোম্বেটে এসে তার দলে যোগ দিতে লাগল—তাদের বেশির ভাগই ইংরেজ। জামাইকার গভর্নর পর্যন্ত তাকে আর বোম্বেটের মতো অভ্যর্থনা করলেন না,—এমন কি তাকে একখানা মস্তবড় জাহাজও দান করলেন। এমন দান পেয়ে মর্গ্যানের আনন্দ আর ধরে না, কারণ এর উপরে ছিল ছত্রিশটা কামান! এতবড় জাহাজ কোনও বোম্বেটেরই ভাগ্যে জোটে না।

সেই সময়ে ওখানে এসে একখানা বড় ফরাসি জাহাজও নঙ্গর করেছিল, তার উপরে ছিল চব্বিশটা ইস্পাতের ও বারটা পিতলের কামান। এ জাহাজখানাকে পেলে তার শক্তি অত্যন্ত বেড়ে উঠবে বলে মর্গ্যান ফরাসিদের কাপ্তেনকে নিজের দলে যোগ দেবার জন্যে আহ্বান করলে। কিন্তু ফরাসিরা রাজি হল না—ইংরেজ বোম্বেটেদের তারা বিশ্বাস করে না।

মর্গ্যানের ভারি রাগ হল—ফরাসিদের সাজা দেবার জন্যে ছুতো খুঁজতে লাগল। ছুতো পাওয়াও গেল।

কিছুদিন আগে সমুদ্রে খাদ্যাভাব হওয়ার দরুন ফরাসিরা একখানা ইংরেজ জাহাজ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করেছিল এবং তখন জাহাজে টাকা ছিল না বলে ইংরেজদের সঙ্গে এই ব্যবস্থা করেছিল যে, জামাইকায় ফিরে এসে তারা খাবারের দাম কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দেবে।

ব্যাপারটা কিছু অন্যায় নয়। কিন্তু এই ছুতোই বিবেকবুদ্ধিহীন মর্গ্যানের পক্ষে যথেষ্ট হল। সে বাইরে কিছু না ভেঙে ফরাসি জাহাজের কাপ্তেন ও কয়েকজন পদস্থ কর্মচারীকে নিজের জাহাজে নিমন্ত্রণ করলে। তারা কোনওরকম সন্দেহ না করেই নিমন্ত্রণ রাখতে এল। তখন তাদের হাতে পেয়ে দুষ্ট মর্গ্যান বললে, "ইংরেজদের কাছ থেকে তোমরা খাবার কেড়ে নিয়েচ। সেই অপরাধে তোমাদের বন্দি করলুম।"—তারপর সে জামাইকার গভর্নরের দেওয়া বড় জাহাজখানায় বন্দীদের পাঠিয়ে দিলে।

আবার নতুন সমুদ্রযাত্রা করবার দিন স্থির হল। ইংরেজ বোম্বেটেরা আসন্ন লাভের আনন্দে জাহাজে জাহাজে উৎসবে মেতে উঠেছে! নাচ-গান-বাজনা চলছে—সবাই মদের নেশায় বেহুঁশ।

আচম্বিতে একসঙ্গে যেন অনেকগুলো বাজ ডেকে উঠল এবং সমুদ্রের বুকে যেন দপ করে জ্বলে উঠল একসঙ্গে শত শত বিদ্যুৎ!...চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল।

মর্গ্যানের সেই বড় সাধের বিরাট জাহাজ শূন্যে উড়ে গেল ভেঙে গুঁড়ো হয়ে। মাত্র ত্রিশজন লোক কোনওগতিকে রক্ষা পেলে এবং এক মুহূর্তেই মারা পড়ল তিনশ পঞ্চাশ জন ইংরেজ।

বোম্বেটেদের মতে, বন্দি ফরাসি কাপ্তেন ও তাঁর সঙ্গীরাই নিজেদের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও জাহাজের বারুদখানায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

মর্গ্যানের সেই বিশ্বাসঘাতকতার ফল তাকে হাতে হাতেই পেতে হল।

অতবড় জাহাজ ও এত লোক হারিয়ে মর্গ্যান একেবারে ভেঙে পড়ল। কিন্তু সে বেশিক্ষণের জন্যে নয়। রাগে অজ্ঞান হয়ে বাকি বোম্বেটেদের নিয়ে আবার ফরাসিদের সেই বড় জাহাজখানা আক্রমণ ও অধিকার করলে।

তারপর তারা সমুদ্রের জলে নিজেদের দলের বোম্বেটেদের লাশ খুঁজতে লাগল—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে নয়, লুণ্ঠন করবার জন্যে। যাদের আঙুলে আংটি ছিল তাদের আংটিসুদ্ধ আঙুল কেটে নেওয়া হল, যাদের পকেটে টাকাকড়ি ছিল তাদের পকেট থেকে টাকাকড়ি চুরি করা হল। তারপর মৃতদেহগুলোকে সামুদ্রিক জীবদের মুখে সমর্পণ করে তারা অম্লানবদনে আবার জাহাজে উঠে অগাধ সাগরে পাড়ি দিল।

দলের সাড়ে তিনশ লোক মারা পড়ল, তবু মর্গ্যানের নামের জোরে সঙ্গীর সংখ্যা হল যথেষ্ট! পনেরখানা জাহাজে প্রায় হাজারখানেক বোম্বেটে তার সঙ্গে চলল। দুরাত্মার পাপসঙ্গীর অভাব হয় না। সবচেয়ে বড় জাহাজে রইল মর্গ্যান নিজে—কিন্তু তাতে কামান ছিল মোটে চোদ্দটা, তাও ছোট ছোট।

এবারে মর্গ্যান কিছু মুশকিলে পড়ল। কারণ যাত্রারম্ভের সময়ে তার মাথায় অনেক বড় বড় ফন্দি ছিল; কিন্তু কিছুদিন পরে তার দলের প্রায় পাঁচশ লোকসুদ্ধ সাতখানা জাহাজ অকূল সাগরে কোথায় হারিয়ে গেল। মর্গ্যান কিছুকাল অপেক্ষা করেও তাদের দেখা পেলে না। কাজেই এখানে ওখানে ছোটখাট ডাকাতি করেই সে সময় কাটাতে লাগল।

মর্গ্যানের দলে এক ফরাসি কাপ্তেন আছে, সে আগে ছিল বিখ্যাত লোলোনেজের সঙ্গে। সে পরামর্শ দিলে : "আপনিও মারাকেবো শহর লুট করবেন চলুন। আমি সেখানকার পথঘাট চিনি, আমাদের কোনও কষ্ট হবে না।"—এ প্রস্তাবে মর্গ্যানের নারাজ হবার কারণ ছিল না।

তারা মারাকেবোর সমুদ্রে এসে হাজির হল। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে যখন শহরের খুব কাছে এসে পড়ল, স্পানিয়ার্ডরা তখন তাদের দেখতে পেলে। লোলোনেজের নগরলুণ্ঠনের পর তারা এখন আর একটা নূতন কেল্লা তৈরি করেছিল—সেইখানে বোম্বেটেদের সঙ্গে তাদের বিষম যুদ্ধ হল। কিন্তু এবারেও স্পানিয়ার্ডরা জিততে পারলে না, মারাকেবো শহরের হতভাগ্য বাসিন্দারা আবার নরকযন্ত্রণা ভোগ করলে। সেই একই বিয়োগান্ত নাটকের পুনরাভিনয়। সবিস্তারে আর বর্ণনা করবার দরকার নেই।

তারপর জিব্রালটার নগরের পালা। কিন্তু লোলোনেজ তাদের যে সর্বনাশ করে গিয়েছিল, জিব্রালটারের বাসিন্দারা এখনও তা ভুলতে পারেনি। কাজেই বোম্বেটেদের সাড়া পেয়ে তারা পঙ্গপালের মতো দলে দলে শহর ছেড়ে পলায়ন করতে লাগল—সমস্ত মূল্যবান জিনিস সঙ্গে নিয়ে।

বোম্বেটেরা শহরে ঢুকে দেখলে—সে এক নিঝুম পুরী। না আছে রসদ, না আছে ধনরত্ন, না আছে জনমনুষ্য! চারিদিক সমাধির মতো খাঁ খাঁ করছে!

কেবল একটি লোক পালায়নি। তার পোষাক ময়লা, তালিমারা, ছেঁড়াখোড়া। বোম্বেটেরা জানত না যে, সে জন্মজড়ভরত—পাগল বললেও চলে।

তারা তাকে যত কথা শুধোয়, সে খালি বলে, "আমি কিছু জানি না, আমি কিছু জানি না।"

বোম্বেটেরা তখন তাকে নিজেদের প্রথামত বিষম যন্ত্রণা দিতে শুরু করলে।

পাগলা বললে, "ওগো, আর যাতনা দিওনা! আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমাদের আমার সমস্ত ঐশ্বর্য দান করচি!"

বোম্বেটেরা ভাবলে, এ লোকটা নিশ্চয়ই কোনও ধনী ব্যক্তি, কেবল তাদের চোখে ধুলো দেবার ফিকিরেই গরিবের সাজ পরেছে।

অতএব তারা তার সঙ্গে সঙ্গে চলল। পাগলা তাদের নিয়ে একখানা ভাঙা কুঁড়েঘরে গিয়ে বললে, "দেখো, আমার কত ঐশ্বর্য!"

ঘরের ভিতরে ছিল কেবল কতকগুলো মাটির বাসন ও গুটিতিনেক টাকা।

বোম্বেটেরা খাপ্পা হয়ে বললে, "কী! আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা? দেখ তবে মজাটা।"

পাগলা বললে, "জানো আমি কে? আমার নাম হচ্ছে শ্রীযুক্ত সিবাস্টিয়ান স্যানসেজ, আমি হচ্ছি মারাকেবোর লাটসাহেবের ভাই।"

বোম্বেটেরা তার কথা সত্য ভেবে নিয়ে অধিকতর লুব্ধ হয়ে তাকে আবার যন্ত্রণা দিতে লাগল। তাকে দড়িতে বেঁধে শূন্যে টেনে তুললে এবং তার গলায় ও দুই পায়ে বিষম ভারি ভারি বোঝা ঝুলিয়ে দিলে। তারপর সেই অভাগাকে পাপিষ্ঠরা জ্যান্ত অবস্থায় আগুনে পুড়িয়ে মারলে।

বোম্বেটেরা তারপর সে দেশের বনে বনে চারিদিকে খুঁজে বেড়াতে লাগল এবং অনেক চেষ্টার পর একে একে প্রায় আড়াইশ স্পানিয়ার্ডকে গ্রেপ্তার করলে।

স্পানিয়ার্ডদের সঙ্গে ছিল এক কাফ্রি গোলাম।

মর্গ্যান তাকে হুকুম দিলে, "ওরা কিছুতেই যখন টাকার কথা বলবে না, তখন ওদের দল খানিকটা হালকা করে দে!"

কাফ্রি গোলাম একে একে কয়েকজনকে হত্যা করলে—অন্যান্য বন্দীদের চোখের সামনেই। তারপর বোম্বেটেদের খুশি করবার জন্যে সেই দুষ্ট কাফ্রি একজন বৃদ্ধ স্পানিয়ার্ডকে দেখিয়ে বললে, "ওই লোকটা অনেক টাকার মালিক।"

বুড়োর কপাল পুড়ল। বোম্বেটেরা টাকা চাইলে, বুড়ো বললে, "এ পৃথিবীতে আমার যথাসর্বস্ব হচ্ছে চারশ টাকা।"

বোম্বেটেরা বিশ্বাস করলে না। দড়ি দিয়ে বেঁধে তারা সেই বুড়োর দু'খানা হাতই মড়মড় করে ভেঙে দিলে। তারপর তার হাত ও পায়ের বুড়ো আঙুলে দড়ি বেঁধে তাকে শূন্যে টেনে তুললে। সেই অবস্থায় তারা লাঠি দিয়ে দড়ির উপরে এমন ঝাঁকানি মারতে লাগল যে, প্রত্যেক ঝাঁকানির সঙ্গেই বৃদ্ধের ক্ষীণ প্রাণ বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা হল। এই বর্বরোচিত নিষ্ঠুরতাতেও খুশি না হয়ে বোম্বেটেরা বুড়োর পেটের উপরে সেই অবস্থাতেই আড়াই মণ বোঝা চাপিয়ে দিলে। এবং সেই সঙ্গে আগুন জ্বেলে হতভাগ্যের দাড়ি-গোঁফ, চুল ও মুখের চামড়া—সব পুড়িয়ে দিলে। তারপর তাকে নামিয়ে একটা থামে বেঁধে রাখা হল এবং চারদিন তাকে প্রায় অনাহারে রাখা হল বললেই চলে।

বুড়ো বেচারি খুব ছোট একটা সরাইখানা চালিয়ে কোনও রকমে দিন গুজরান করত। অনেক কষ্ট ও অনেক চেষ্টার পর কিছু টাকা ধার করে এনে বোম্বেটেদের দিয়ে সে যাত্রা সে মুক্তি পেল বটে, কিন্তু তার দেহ এমন ভয়ানক ভাবে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল যে, খুব সম্ভব তাকে আর বেশিদিন এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে হয়নি।

এরাই হচ্ছে প্রেমের অবতার খ্রিস্টদেবের শিষ্য—যাঁর ধর্মের বড় মন্ত্র হচ্ছে প্রেমের মন্ত্র। এবং এরাই ভারতবাসীদের ও আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের ঘৃণা করে বর্বর বলে। উপরন্তু এদের মতে এশিয়ার বাসিন্দারা নাকি নিষ্ঠুরতায় পৃথিবীতে অতুলনীয়। কিন্তু যেসব অকথ্য নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়ে ইংরেজ রাজের কাছ থেকে মর্গ্যান সম্মান, উপাধি ও উচ্চপদ লাভ করেছে, সেগুলোকে আমরা কি পরম করুণার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বলে মাথায় তুলে রাখব? মর্গ্যান ওখানে পূর্বকথিত ব্যাপারটিরও চেয়ে ভয়ানক এমন সব পৈশাচিক কাণ্ডের অনুষ্ঠান করেছিল, পাঠকরা সহ্য করতে পারবেন না বলে এখানে সেগুলোর কথা আর বললুম না। তাদের তুলনায় ঢের বেশি ভদ্র ও শান্ত দু'টো দৃষ্টান্ত এখানে দিচ্ছি।

অনেক স্পানিয়ার্ডকে ধরে মর্গ্যান পায়ে ও হাতে পেরেক মেরে ক্রুশে বিদ্ধ করে রেখেছিল—সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতের ও পায়ের আঙুলগুলোর ফাঁকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল তৈলাক্ত সলিতা। এবং আরও অনেককে ধরে বেঁধে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে তাদের পাগুলোকে এমন কৌশলে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল যে, যাতে তারা 'রোস্টে'র মতো ধীরে ধীরে সিদ্ধ হয়। এত জঘন্য অত্যাচার কেবল সামান্য টাকার জন্যেই—যে টাকা পরে বোম্বেটেরা মদ খেয়ে জুয়া খেলে দু'দিনেই উড়িয়ে দেবে!

জিব্রালটার শহরে ঐশ্বর্যলাভের দিক থেকে কিছুই সুবিধা করে উঠতে না পেরে মর্গ্যান বুঝলে, এ যাত্রা কপাল তার ভাল নয়। কিন্তু সেই সময়েই খবর পাওয়া গেল, জিব্রালটারের গভর্নর অনেক ধনরত্ন ও শহরের স্ত্রীলোকদের নিয়ে নদীর মাঝখানে একটা দ্বীপে গিয়ে লুকিয়ে আছেন। মর্গ্যান অমনি নৌকো ভাসিয়ে সদলবলে তাদের ধরতে ছুটল।

খবর পেয়ে গভর্নর দ্বীপ থেকে পালিয়ে সকলকে নিয়ে একটা পাহাড়ের শিখরে উঠে বসে রইলেন। বোম্বেটেরাও নাছোড়বান্দা—তারাও পিছনে পিছনে ছুটল। তখন বর্ষাকাল। ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। পাহাড়ে যাবার পথে নদীর জল ফুলে উঠেছে। স্রোতের তোড়ই বা কী! নদী সেদিন পৃথিবীকে অনেকগুলো বোম্বেটের পাপভার সইবার দায় থেকে নিষ্কৃতি দিলে—স্রোতের টানে তারা একেবারে সটান পাতালে চলে গেল।

পাহাড়ের তলায় গিয়ে মর্গ্যানের সব আশা ফুরিয়ে গেল। খাড়া পাহাড়ের গা—পাঁচ সাত হাত উপরেও উঠবার উপায় নেই। একটিমাত্র সরু লিকলিকে পথ টঙে গিয়ে উঠেছে—সে পথে সার বেঁধে পাশাপাশি দু'জন যেতে পারে না। টঙ থেকে যদি একজনমাত্র স্পানিয়ার্ড গুলি চালায়, তাহলে একে একে শত শত বোম্বেটের দেহ হবে প্রপাতধরণীতলে। তার উপরে বৃষ্টির জলে বোম্বেটেদের সমস্ত বারুদ ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছে।

এই সময়ে যদি মাত্র পঞ্চাশজন স্পানিয়ার্ড বুক বেঁধে আক্রমণ করত, তাহলে সেই চার-পাঁচশ বোম্বেটে মনুষ্যসমাজকে আর যন্ত্রণা দেবার সুযোগ পেত না। কিন্তু ঘা খেয়ে খেয়ে স্পানিয়ার্ডরা তখন নেতিয়ে পড়ে সব সাহস থেকেই বঞ্চিত হয়েছে। তারা আক্রমণ করবে কি, গাছের পাতাটি নড়লেও 'ওই বোম্বেটে আসছে' ভেবে আঁতকে পালিয়ে যায়।

কিন্তু মর্গ্যান তা বুঝতে পারেনি। সেই সরু পথে যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর ছায়া দেখে সে আর অগ্রসর হতে সাহস করলে না, সমস্ত লোকজন নিয়ে মানেপ্রাণে সেখান থেকে সরে পড়ল।

জিব্রালটার নগরে ফিরে এসে পাঁচ হপ্তা ধরে নারকীয় কাণ্ড করবার পর বোম্বেটেরা বিষম এক দুঃসংবাদ পেলে। স্পানিয়ার্ডদের তিনখানা বড় বড় যুদ্ধজাহাজ মারাকেবো বন্দরে এসে

হাজির হয়েছে। সবচেয়ে বড় জাহাজখানায় কামান আছে চল্লিশটা, তার চেয়ে কিছু ছোট জাহাজে ত্রিশটা, সব ছোট জাহাজে চব্বিশটা। মর্গ্যানের সবচেয়ে বড় জাহাজেও চোদ্দটার বেশি কামান নেই।

বোম্বেটেদের ফেরবার পথ হচ্ছে মারাকেবো বন্দরের ভিতর দিয়েই। তাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল! আর বুঝি রক্ষা নেই—পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবার সময় এসেছে!

কিন্তু সত্যিকার নেতার আসল গুণ হচ্ছে, দারুণ বিপদেও হাল না ছাড়া। এ গুণ মর্গ্যানেরও ছিল। সে বুক ফুলিয়ে বললে, "কুছ পরোয়া নেই! আসুক ওরা,—আমরাও লড়াই করব!"

স্পানিয়ার্ড নৌ-বাহিনীর অ্যাডমিরালের এক চিঠি এল :

"বোম্বেটে সর্দার মর্গ্যান, আমাদের মহারাজের রাজত্বে এসে তুমি যেসব ভীষণ উৎপাত করছ, তা আমি শুনেছি। অতঃপর তুমি যদি আমার কাছে বিনাবাক্যব্যয়ে আত্মসমর্পণ কর আর লুটের সমস্ত মাল ও বন্দীদের ফিরিয়ে দাও, তাহলে আমি স্বীকার করছি, তোমাদের সকলকেই ছেড়ে দেব। আর আমাদের কথা যদি না শোনো, তাহলে এও প্রতিজ্ঞা করছি যে, তোমাদের প্রত্যেককেই আমি বধ না করে ছাড়ব না।"

বোম্বেটেদের পরামর্শসভা বসল। মর্গ্যানের কথার উত্তরে সকলেই একবাক্যে বললে, "সর্দার, জান কবুল! এত বিপদ সয়ে আমরা যে লুটের মাল পেয়েছি আর তা ফিরিয়ে দেব না! যতক্ষণ আমাদের শেষ রক্তবিন্দু থাকবে ততক্ষণ আমরা আত্মসমর্পণ করব না!"

তবু যদি ভালয় ভালয় এই বিপদ চুকে যায়, সেই আশায় মর্গ্যান অ্যাডমিরালের কাছে তিনটি প্রস্তাব করে পাঠালে : প্রথমত, আমরা আর মারাকেবো শহরের কোনও অনিষ্ট করব না বা বাসিন্দাদের কাছ থেকে কোনও অর্থ দাবি করব না। দ্বিতীয়ত, বন্দীদের আমরা স্বাধীনতা দেব। তৃতীয়ত, কেবল জিব্রালটারের বাসিন্দারা আমাদের যে অর্থ দেবে বলে স্বীকার করেছে, তা না পাওয়া পর্যন্ত এখানকার চারজন প্রধান ব্যক্তি জামিনদার রূপে আমাদের সঙ্গে থাকবে।

অ্যাডমিরাল জবাবে বলে পাঠালেন : "তোমাদের আর দু'দিন সময় দিলুম। এর মধ্যে যদি আত্মসমর্পণ না কর, তাহলে তোমাদের কারুকে আমি ক্ষমা করব না।"

মর্গ্যান খাপ্পা হয়ে বললে, "সাজো তবে সবাই রণসাজে! নিজের জোরে আমরা এই ফাঁদ ছিঁড়ে বেরিয়ে যাব। দেখি, আমাদের কে রুখতে পারে!"

তখনই তারা সর্বাগ্রে একখানা অগ্নিপোত নির্মাণে নিযুক্ত হল। অগ্নিপোত কাকে বলে এদেশের অনেকেই বোধহয় তা জানেন না। সেকালে জলযুদ্ধে প্রায়ই এই অগ্নিপোত ব্যবহৃত হত। এই অগ্নিপোতের ভিতরে সহজে জ্বলে ওঠে এমন সব জিনিস ভাল করে ঠেসে দেওয়া হত। তার বাইরেটা হত সাধারণ জাহাজের মতোই—কাজেই শত্রুপক্ষ তাকে সন্দেহ করতে পারত না। তারপর সেই অগ্নিপোতখানার ভিতরে আগুন লাগিয়ে শত্রুদের নৌবাহিনীর মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হত। শত্রুদের জাহাজগুলোর কাছে সে যখন যেত, তার সর্বাঙ্গ অগ্নিময় এবং সেই আগুন শত্রুদের জাহাজও অগ্নিময় করে তুলত। আজকালকার যুদ্ধযাহাজ হয় শীঘ্রগামী ও লৌহময়, তাই অগ্নিপোতের ব্যবহার এখন উঠে গেছে।

বোম্বেটেরা সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে বড় বড় নৌকোয় চড়ে বসল, অগ্নিপোতখানাকে সঙ্গে নিলে, তারপর মারাকেবো বন্দরের দিকে তারা অগ্রসর হল, অগ্নিপোতখানা যেতে লাগল আগে আগে।

তারা সন্ধ্যার সময়ে বন্দরে গিয়ে স্পানিয়ার্ড নৌ-বাহিনীকে দেখতে পেলে। এগুলো প্রকাণ্ড জাহাজই বটে, এদের সঙ্গে সাধারণভাবে লড়াই করবার সাধ্য তাদের ছিল না।

দুই পক্ষই পরস্পরকে দেখতে পেয়ে পরস্পরের দিকে অগ্রসর হল।

বোম্বেটেদের অগ্নিপোত দেখে স্পানিয়ার্ডরা তার সাংঘাতিক স্বরূপ আন্দাজ করতে পারলে না। তারা ভাবলে, একখানা অতিসাহসী বোম্বেটে জাহাজ একলাই তাদের আক্রমণ করতে আসছে। অতিসাহসের মজাটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে তারা বিপুল উৎসাহে তাকে আক্রমণ করবার জন্যে বেগে তেড়ে এল।

কিন্তু তার কাছে এসেই তাদের চক্ষুস্থির! এ যে অগ্নিপোত, এর ভিতরে যে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে এবং সে আগুন হুহু করে বেড়ে উঠছে মুহূর্তে মুহূর্তে!

স্পানিয়ার্ডদের জাহাজ তিনখানা পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করল—কিন্তু তখন পালাবারও সময় নেই। অগ্নিপোত একেবারে সব চেয়ে বড় শত্রুজাহাজের পাশে গিয়ে লাগল—তখন তার ভিতরকার অগ্নি ঠিক যেন অসংখ্য জ্বলন্ত রক্তদানবের মতো মহাশূন্যে বাহু তুলে তাথৈ তাথৈ তাণ্ডবনৃত্য করছে! মাঝে মাঝে তার গর্ভস্থ বারুদ বিস্ফোরণের ভৈরবধ্বনি,—কান কালা হয়ে যায়!

দেখতে দেখতে স্পানিয়ার্ডদের অতিকায় জাহাজখানাও অগ্নিপোতের মতোই অগ্নিময় হয়ে উঠল! এবং দেখতে দেখতে তার একাংশ আগুনে পুড়ে জীর্ণ হয়ে সমুদ্রগর্ভে অদৃশ্য হয়ে গেল!

স্পানিয়ার্ডদের দ্বিতীয় জাহাজখানা ভয়ে আর সেখানে দাঁড়াল না, তাড়াতাড়ি বন্দরের নিরাপদ অংশে ঢুকে পড়ে একেবারে কেল্লার তলায় গিয়ে উপস্থিত হল। পাছে সেখানা বোম্বেটেদের হাতে গিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে স্পানিয়ার্ডরা নিজেরাই তাকে জলের ভিতরে ডুবিয়ে দিলে।

বোম্বেটেরা তৃতীয় জাহাজখানাকে পালাতেও দিলে না। তারা চারিদিক থেকে প্রবল বেগে তাকে আক্রমণ করলে। এমন দুর্জয় নৌ-বাহিনীর এই কল্পনাতীত পরিণাম দেখে স্পানিয়ার্ডরা তখন ভয়ে ও বিস্ময়ে এত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে যে, বোম্বেটেদের সঙ্গে তারা মাথা ঠিক রেখে লড়তেও পারলে না। অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরেই তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল।

কাপ্তেন মর্গ্যানের এই বিচিত্র ও অপূর্ব জয়কাহিনী যখন ইংলণ্ডে গিয়ে পৌঁছল, তখন সেখানেও তার নামে ধন্য ধন্য রব উঠল। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজে বোম্বেটেমহলে তার নাম হল যেন উপাস্য দেবতার নাম! কথায় বলে, ঢাল নেই—খাঁড়া নেই, নিধিরাম সর্দার! কিন্তু ঢাল-খাঁড়া না থাকলেও কেবল উপস্থিত বুদ্ধিবলে যে কি অসাধ্য সাধন করা যায়, নিধিরাম তা জানলে আজ তাকে ঠাট্টার পাত্র হতে হত না। কেবল বুদ্ধিবলেই কাপ্তেন মর্গ্যান আজ বিনা জাহাজে জলযুদ্ধ-বিজয়ী নাম কিনলে!

একাদশ পরিচ্ছেদ

একটিমাত্র তীরে কেল্লা ফতে!

যেমন হয়, এবারেও তেমনই হল! জুয়াখেলা, মাতলামি, বদমাইশি! নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে, শত শত সাধুর জীবনদীপ নিবিয়ে দিয়ে, দুনিয়ার অভিশাপ কুড়িয়ে বোম্বেটেরা যে

টাকা রোজগার করলে, জামাইকা দ্বীপে ফিরে এসে তা দু'হাতে বদখেয়ালিতে উড়িয়ে দিতে তারা কিছুমাত্র বিলম্ব করলে না!

অল্পদিন পরেই দেখা গেল, বোম্বেটেদের পকেট আর বাজে না, তা একেবারেই ফোক্কা!

কাপ্তেন মর্গ্যান ছিল চালাক মানুষ। উড়নচণ্ডীর পুজো সে করেনি কোনওদিন, খরচ করত বুঝেসুঝে। কাজেই এর মধ্যেই সে এমন দু'পয়সা জমিয়ে ফেলেছিল যে ইচ্ছে করলেই বাকি জীবনটা পায়ের উপরে পা দিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে বসে খেতে পারত।

কিন্তু তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সামান্য ছিল না। সে চায় এমন যশের শিখরে উঠে দাঁড়াতে, যার নাগাল কেউ পাবে না! দুনিয়ায় অনেক ছোট ডাকাত পরে রাজা মহারাজা হয়েছে, সাগরবাসী বোম্বেটেই বা কেন দেশমান্য মহাপুরুষ হতে পারবে না? হয়তো এমনই সব কথাই ভেবে মনটা তার উসখুস করছিল আবার সাগরে আর সাগরের তীরে তীরে কালবৈশাখীর মতো ছুটে যেতে!

এমন সময়ে এসে ধর্না দিলে তার লক্ষ্মীছাড়া চ্যালা-চামুণ্ডার দল!

—"কিহে, খবর কি? মুখ অত শুকনো কেন?"

—"সর্দার! আমরা খেতে পাচ্ছি না!"

—"বেশ তো, সেজন্য ভাবনা কি? টাকা রোজগার করো!"

—"আমরা তো সেইজন্যেই তোমার কাছে এসেছি সর্দার! আমরা খেতে পাচ্ছি না। আমরা টাকা রোজগার করতে চাই। আমরা আবার সমুদ্রে ভাসতে চাই!"

মর্গ্যান হাসিমুখে বললে, "আচ্ছা, তাই হবে। তোমরা প্রস্তুত হও।"

—"আমরা প্রস্তুত! পাওনাদার হতভাগারা ভারি ছোটলোক, তারা এখানে আমাদের আর তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না!"

মর্গ্যান যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। এবার সে যে আয়োজনে নিযুক্ত হল, তার আগে পৃথিবীতে আর কোনও পেশাদার বোম্বেটে স্বপ্নেও তা করেছে কিনা সন্দেহ! তার আয়োজনের বিপুলতা দেখলে তাকে আর বোম্বেটে বলেও মনে হবে না। ছোটখাট লুটপাট বা রাহাজানি যারা করে, পৃথিবী তাদের ডাকাত বলে ডাকে। কিন্তু চেঙ্গিজ খাঁ, তৈমুর লং, আলেকজান্দার, সিজার, নাদির শা বা নেপোলিয়নকে ডাকাত বলতে সাহস করে না কেউ। এই হিসাবে, মর্গ্যানও আজ বেঁচে থাকলে, তাকে বোম্বেটে বলে ডাকলে হয়তো মানহানির মামলা আনতে পারত!

মর্গ্যানের এবারকার নৌ-বাহিনীতে জাহাজের সংখ্যা হল সাঁইত্রিশখানা! অ্যাডমিরালের—অর্থাৎ মর্গ্যানের—জাহাজে ছিল বাইশটা প্রকাণ্ড কামান ও ছয়টা ছোট পিতলের কামান। বাকি কোনওখানাতে বিশটা, কোনওখানাতে আঠারটা, কোনওখানাতে ষোলটা, এবং সবচেয়ে ছোট জাহাজেও কামানের সংখ্যা ছিল অন্তত চারটে। লোকও গেল অনেক। তাদের নাবিক ও চাকরবাকর ছিল ঢের, কিন্তু তাদের বাদ দিলেও সৈনিক বা বোম্বেটেরা গুণতিতে দাঁড়াল পুরোপুরি দুই হাজার! এবারে মর্গ্যান নিজের দলকে আর বোম্বেটের দল বলতেও রাজি হল না, তার মতে তারা হচ্ছে ইংলণ্ডপতির কর্মচারী! যারা ইংলণ্ডের রাজার মিত্র নয়, তাদের সঙ্গেই সে নাকি লড়াই করতে যাচ্ছে! ইংলণ্ডের রাজার বিনা হুকুমের ও বিনা মাহিনার ভৃত্য হয়ে তারা নিজেদের পাপকার্য অর্থাৎ নরহত্যা, দস্যুতা ও লুণ্ঠনকেও বৈধ বলে প্রমাণিত করতে চলল।

তারপর আরম্ভ হল আগেকার দৃশ্যেরই পুনরাভিনয়—জলে স্পানিয়ার্ড জাহাজ দেখলেই তারা দখল করে, স্থলে স্পানিয়ার্ডদের শহর বা গ্রাম পেলেই লুণ্ঠন করে, বন্দীদের মেরে ফেলে বা মারাত্মক শাস্তি দেয়। সেন্ট কাথারাইন দ্বীপও তারা অধিকার করলে। কিন্তু এসব কথা আর খুঁটিয়ে না বললেও চলবে।

আমরা এখানে বোম্বেটে মর্গ্যানের জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল ঘটনার কথাই বলব—অর্থাৎ পানামা অধিকার।

পানামার নাম জানে না, সভ্য পৃথিবীতে এখন এমন লোক বোধহয় নেই। সকলেই জানেন, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সংযোগস্থলে আছে এই নগরটি। পানামায় তখন ছিল স্পানিয়ার্ডদের প্রভুত্ব, এখন তা স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। পানামা নগরের বর্তমান লোকসংখ্যা ৫৯,৪৫৮।

কিন্তু পানামার পথঘাট বোম্বেটেদের ভাল করে জানা ছিল না। কাপ্তেন মর্গ্যান তখন পানামা অঞ্চলের কোনও ডাকাতকে খুঁজতে লাগল। পৃথিবীতে সাধু খুঁজে পাওয়াই প্রায়ই অসম্ভব ব্যাপার, অসাধুর সন্ধান পাওয়া তো অত্যন্ত সহজ! অবিলম্বেই পানামার তিন ডাকাতকে পাওয়া গেল—নৃশংস ও নিম্নশ্রেণীর ডাকাত। লুটের লোভে তারা এক কথাতেই মর্গ্যানের পথপ্রদর্শক হবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলে।

পানামায় যেতে হলে চাগ্রে নদীর ধারে একটা দুর্ভেদ্য কেল্লা পার হয়ে যেতে হয়। মর্গ্যান আগে সেই কেল্লাটা দখল করবার জন্যে সৈন্য ও সেনাপতি পাঠিয়ে দিলে। যেমন নেতা, তেমনই সেনাপতি! তার নাম কাপ্তেন ব্রোডলি, এ অঞ্চলে অগুণতি ডাকাতি করে সে দুর্নাম কিনতে পেরেছে যথেষ্ট। তিনদিন পরে সে চাগ্রে দুর্গের কাছে গিয়ে হাজির হল—স্পানিয়ার্ডরা তাকে সেন্ট লরেন্স দুর্গ বলে ডাকত। এই দুর্গটি উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত—তার চারিদিকে শক্ত পাথরের মতো পাঁচিল। পাহাড়ের শিখরদেশ দুই ভাগে বিভক্ত, মাঝখানে ত্রিশফুট গভীর এক খাল। সেই খালের উপরকার টানা সাঁকোর সাহায্যে দুর্গের একমাত্র প্রবেশপথের ভিতরে ঢোকা যায়। বড় দুর্গের তলায় আছে আবার একটা ছোট—কিন্তু রীতিমতো মজবুত কেল্লা, —আগে সে কেল্লা ফতে না করে নদীর মুখে প্রবেশ করাই অসম্ভব।

গুণধর বোম্বেটেদের সঙ্গে চোখের দেখা হতেই স্পানিয়ার্ডরা মুষলধারে গোলাগুলি বৃষ্টি শুরু করলে। কেল্লা তখনও মাইল তিনেক তফাতে। পথঘাট ধুলোকাদায় ভরা, চলতে বড় কষ্ট। তবু বোম্বেটেরা দাঁড়াল না, তারা যত এগোয় স্পানিয়ার্ডরা ততই পিছিয়ে যায়। এইভাবে অগ্রসর হয়ে বোম্বেটের দল দুর্গের কাছে খোলা জমিতে এসে পড়ল।

ইতিমধ্যেই তাদের লোকক্ষয় হয়নি বড় কম। কিন্তু এখন তাদের বিপদ আরও বেড়ে উঠল। খোলা জমি, শত্রুপক্ষের গুলির ধারা সিধে তাদের দিকে ছুটে আসছে, কোথাও এমন ঠাঁই নেই যে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করা যায়। সামনেই কামানের সারের পর সার সাজিয়ে খাড়া হয়ে আছে বিরাট ওই দুর্গ, দেখলেই মনে হয় ওকে দখল করা অসম্ভব। এবং এই মুক্ত স্থানে আর অপেক্ষা করাও সম্ভবপর বা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এখন হয় পালানো, নয় আক্রমণ করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই! পালালে অপমান, এগুলেও পরাজয় বা মৃত্যু!

হতাশভাবে গোলোকধাঁধায় পড়ে বোম্বেটেরা অনেকক্ষণ পরামর্শের পর স্থির করল—দুর্গ আক্রমণ করতেই হবে—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন!...এক হাতে তরবারি ও আর এক হাতে বোমা নিয়ে তারা অগ্রসর হতে লাগল অকুতোভয়ে!

স্পানিয়ার্ডরা দুর্গপ্রাকার থেকে কামান ছুড়ছে, ছুড়ছে আর ছুড়ছেই! বোম্বেটেরা হতাহতের ভিতর দিয়ে পথ করে যখন আরও কাছে এগিয়ে এল, স্পানিয়ার্ডরা তখন চিৎকার করে বললে, "ওরে ইংরেজ কুত্তার দল! তোরা হচ্ছিস ভগবান আর আমাদের রাজার শত্রু! আয়, এগিয়ে আয়, তোদের পিছনে যারা আছে তারাও এগিয়ে আসুক! তোদের আর এ যাত্রা পানামায় যেতে হচ্ছে না।"

বোম্বেটেরা কেল্লার পাঁচিলের উপরে ওঠবার চেষ্টা করলে—কিন্তু বৃথা! গরম গরম গোলার ঝড়ে ও গুলির বৃষ্টিতে জীবন্ত সব দেহ মুহূর্তে মৃতদেহে পরিণত হল! তখন সে রাত্রের মতো তারা যুদ্ধে ক্ষান্তি দিয়ে পালিয়ে এল।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার যুদ্ধ আরম্ভ! বোম্বেটেরা বোমা ছুড়ে যখন কেল্লার পাঁচিলকে কাবু করবার চেষ্টা করছে, তখন আশ্চর্য এক কাণ্ড হল! তখন বন্দুকের ব্যবহার আরম্ভ হলেও ধনুকের ব্যবহার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। স্পানিয়ার্ডরা বন্দুকের সঙ্গে ধনুকও ছুড়ছিল। হঠাৎ একটা তীর এসে একজন বোম্বেটের দেহকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলে। কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করেই সে সেই তীরটা নিজের বুকের উপর থেকে একটানে আবার উপড়ে ফেললে। তারপর তার কি খেয়াল হল খানিকটা তুলো নিয়ে তীরের গায়ে জড়িয়ে সেটা নিজের বন্দুকের নলচের ভিতরে পুরে দুর্গ লক্ষ্য করে সে গুলি ছুড়লে! গুলির সঙ্গে তীরটাও বন্দুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে দুর্গের ভিতরে গিয়ে পড়ল। দুর্গের ভিতরে যেসব বাড়ি ছিল সেগুলোর ছাদ হচ্ছে তালপাতায় ছাওয়া। তীরসংলগ্ন জ্বলন্ত তুলোর গুণে দুই তিনখানা বাড়ির ছাদে আগুনের শিখা দেখা দিলে। যুদ্ধে ব্যস্ত স্পানিয়ার্ডরা সেদিকে নজর দেবার সময় পেলে না। সকলের অজ্ঞাতসারেই সেই অদ্ভুত উপায়ে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি একরাশ বারুদের স্তূপকে স্পর্শ করলে,—সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত, বিষম বারুদ-গর্জন, বহুকণ্ঠের সচকিত চিৎকার ও স্পানিয়ার্ডদের সভয়ে ছুটোছুটি! যুদ্ধ ভুলে সকলেই তাড়াতাড়ি আগুন নেবাবার চেষ্টা করতে লাগল।

বোম্বেটেরা এমন মহা সুযোগ ত্যাগ করলে না, দৈবের অনুগ্রহে আবিষ্কৃত পূর্বকথিত উপায়ে তারা দুর্গের আরও নানা জায়গায় অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করলে। স্পানিয়ার্ডদের ভয়, কাতরতা ও ব্যস্ততা বেড়ে উঠল—একটা আগুন নেবায় তো আরও দু'জায়গায় দপদপ করে নূতন আগুন জ্বলে উঠে!

সেই আগুনে অবশেষে অনেক জায়গায় দুর্গের বেড়া উড়েপুড়ে গেল এবং প্রাচীরের বিরাট মৃত্তিকাস্তূপ ধসে নিচেকার খাল ভরাট করে ফেললে! বোম্বেটেরা তার সাহায্যে অনায়াসে খাল পার হয়ে দুর্গের প্রথম প্রাচীরের ভিতরে গিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল।

তবু যুদ্ধ থামল না—গভীর রাত্রে মানুষেরা স্বজাতিকে ধ্বংস করবার জন্য বন্যপশুর মতো যুঝতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোম্বেটেদের কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারলে না। সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল দেখে বীর স্পানিয়ার্ডরা আত্মসমর্পণের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয় ভেবে দলে দলে জলে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিলে। দুর্গের গভর্নরও জীবন থাকতে আত্মদান করলেন না, বোম্বেটেরা যখন তাঁর দেহ স্পর্শ করতে পারলে, তখন তাঁর আত্মা পরলোকে। দুর্গের তিনশ চোদ্দজন লোকের মধ্যে জ্যান্ত অবস্থায় পাওয়া গেল মাত্র ত্রিশজন লোক—তাদের মধ্যেও কুড়িজন আহত। কেবল

নয়জন লোক পানামার গভর্নরের কাছে খবর দিতে গেছে—বাকি সবাই মৃত! বোম্বেটেদেরও ক্ষতি বড় সামান্য নয়। তাদের একশজন হত ও সত্তরজন আহত হয়েছে।

জীবিত স্পানিয়ার্ডরা শারীরিক যন্ত্রণার চোটে স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, পানামার গভর্নর বোম্বেটেদের আগমনের সব খবরই আগে থাকতেই পেয়েছেন এবং আগে থাকতেই তাদের ভাল করে অভ্যর্থনা করবার জন্যে দস্তুরমতো প্রস্তুত হয়ে আছেন। চাগ্রে নদীর ধারে সর্বত্রই তাঁর সৈন্যরা অপেক্ষা করছে এবং সর্বশেষে তিনিও অপেক্ষা করছেন তিন হাজার ছয়শ সৈন্য নিয়ে।

অতঃপর বোম্বেটেদের উচ্চ জয়ধ্বনির মধ্যে কাপ্তেন মর্গ্যান তার বাকি বারশত সৈন্য নিয়ে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলে। পানামা বিজয়ের পথের কাঁটা দূর হয়েছে, সকলের মুখেই হাসি আর ধরে না।

যে একশ বোম্বেটে অর্থলোভে সেখানে প্রাণ দিলে, জীবিত সঙ্গীদের মুখের হাসি দেখবার সুযোগ তাদের দেহহীন আত্মারা সেদিন পেয়েছিল কিনা কে জানে!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পানামার যুদ্ধ

১৬৭০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই আগস্ট তারিখে কাপ্তেন মর্গ্যান চাগ্রে দুর্গ ছেড়ে পানামা নগরের দিকে অগ্রসর হল সদলবলে।

যাত্রা শুরু হল জলপথে, নদীতে নৌকোয় চড়ে। যতই অগ্রসর হয়, দেখে নদীর দুই নির্জন তীর মরু-শ্মশানের মতো হা হা করছে, শস্যক্ষেতে কৃষক নেই, গ্রামে বাসিন্দা নেই, পথে কুকুর-বিড়াল নেই, কোথাও জীবনের এতটুকু চিহ্ন পর্যন্ত নেই! স্পানিয়ার্ডরা সবাই পালিয়েছে তাদের ভয়ে এবং সঙ্গে করে নিয়ে গেছে জীবনের যত কিছু আনন্দ!

প্রথম থেকেই ঘটল খাদ্যাভাব। মর্গ্যান সঙ্গে বেশি খাবার নিয়ে ভারগ্রস্ত হতে চায়নি, ভেবেছিল পথে লোকালয়ে নেমে তরোয়াল উঁচিয়ে বিনামূল্যে প্রচুর খাদ্য আদায় করবে। তার সে আশায় ছাই পড়ল। মানুষ নেই, খাবারও নেই। শূন্য উদরের অভাব ভোলবার জন্যে বোম্বেটেরা তামাকের পাইপ মুখে দিয়ে অন্যমনস্ক হবার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

তারপর জলপথে নৌকোও হল অচল। বৃষ্টির অভাবে নদী ক্রমেই শুকিয়ে আসছে। নৌকো ছেড়ে বোম্বেটেরা ডাঙায় নামল। চলতে চলতে তারা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে লাগল, শত্রুরা তাদের আক্রমণ করতে আসুক! কারণ শত্রুরা এলে খাবারও তাদের সঙ্গে আসবে এবং শত্রু মেরে তারা সেই খাবারে ভাগ বসাতে পারবে!

আজ যাত্রার চতুর্থ দিবস। আজ শত্রুদের বদলে তাদের পরিত্যক্ত একটা ছাউনি পাওয়া গেল, তার ভিতরে পড়ে ছিল অনেকগুলো চামড়ার ব্যাগ, হয়তো ভুলে ফেলে গেছে! ক্ষুধার্ত বোম্বেটেরা পরম আনন্দে সেই শুকনো চামড়ার ব্যাগগুলো নিয়েই কাড়াকাড়ি করতে লাগল—গরম জলে সিদ্ধ ও নরম করে সেই ব্যাগের চামড়াই খেয়ে আজ তারা পেটের জ্বালা নিবারণ করবে!

পঞ্চম দিনে তারা আর এক জায়গায় এসে স্পানিয়ার্ডদের আর একটা পরিত্যক্ত ছাউনি আবিষ্কার করলে। কিন্তু হায় রে, একটা চামড়ার ব্যাগ পর্যন্ত এখানে পাওয়া গেল না! কী দুর্ভাগ্য! এ হতচ্ছাড়া দেশে কি একটা জ্যান্ত কুকুর বা বিড়াল পর্যন্ত ল্যাজ নাড়ে না? নিদেন দু'চারটে ইঁদুর?

লোকে গালাগালিতে জুতো খেতে বলে। তারাও হয়তো জুতো খেতে রাজি ছিল—ব্যাগ আর জুতোর চামড়ায় তফাৎটা কি? কিন্তু জুতোগুলোও খেয়ে ফেললে খালি পায়ে এইসব কাঁটাভরা জঙ্গল আর কাঁকরভরা উঁচুনিচু পথ দিয়ে ক্রোশের পর ক্রোশ পার হয়ে ধনরত্ন লুটতে যাবে কেমন করে?

তারা বাংলাদেশের সেপাই হলে জুতোগুলো এত সহজে রেহাই পেত না। বাংলায় খালিপায়ে কাঁকর বেঁধে না, কাঁটা ফোটে না!

অনেকে বোধ করি অবাক হচ্ছেন? কিন্তু এতে অবাক হবার কী আছে? পেটের জ্বালা কেমন, দুর্ভিক্ষের দেশ তা জানে। পেটের জ্বালায় মানুষ মানুষের মাংসও বাদ দেয় না। ইতালির এক কারারুদ্ধ কাউণ্ট নাকি ক্ষিধের চোটে নিজের ছেলের মাংসও খেতে ছাড়েননি।

...এই নির্জন মরু-শ্মশানে দেবতার হঠাৎ এ কী আশীর্বাদ! কলির দেবতারাও হয়তো ভীতু, কারণ প্রায়ই তাঁরা অসাধুর দিকেই মুখ তুলে চান। বোম্বেটেরা পথের মাঝে এক পাহাড়ের গুহা আবিষ্কার করলে, তার ভিতরে পাওয়া গেল খাবারের ভাণ্ডার—এমন কি ফল আর মদ পর্যন্ত! সম্ভবত স্পানিয়ার্ডরা পালাবার সময়ে এগুলো এখানে লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল!

সবাই উপোসী শকুনির মতো সেই ভাণ্ডার লুণ্ঠন করলে। ভাল করে না হোক, পেট তবু কতকটা ঠাণ্ডা হল।

ষষ্ঠ দিনেও পথের শেষ নেই। কখনও জলপথ, কখনও স্থলপথ,—যখন যেমন সুবিধা। আবার অশ্রান্ত ক্ষুধার আবির্ভাব। চারিদিক তেমনই নিরালা আর নিঝুম, যারা পালিয়েছে তারা খাবারের গন্ধটুকু পর্যন্ত চেঁচেমুছে নিয়ে পালিয়েছে! বোম্বেটেরা মনে মনে কেবল শত্রুকে ডাকতে লাগল। শত্রু! সেও আজ মিত্রের মতো! কেউ গাছের পাতা ছিঁড়ে ও কেউ মাঠের ঘাস উপড়ে মুখে পুরে উদরের শূন্যতাকে ভরাবার চেষ্টা করতে লাগল। স্পানিয়ার্ডরা লড়ে তাদের এমন জব্দ করতে পারত না! গা ঢাকা দিয়ে তারা তাদের কী মারাত্মক শাস্তিই দিচ্ছে! প্রায় দেড়শ বৎসর পরে নেপোলিয়ন এবং খ্রিস্ট জন্মাবারও আগে পারস্যের এক সম্রাট রুশদেশ আক্রমণ করতে গিয়ে এমনই শাস্তিই পেয়েছিলেন।

শয়তানদের উপরে আবার দেবতার দয়া হল! এবারে এক চাষার বাড়িতে তারা পেলে ভুট্টার ভাণ্ডার। ভাঁড়ার লুটে তারা যত পারলে খেলে, বাকি মাল সঙ্গে করে নিয়ে চলল। কিন্তু বারশ ক্ষুধার্ত ডাকাতের কাছে সে ভুট্টার অস্তিত্ব আর কতক্ষণ! ক্ষুধা মিটল না, তবে আপাতত প্রাণ রক্ষা হল বটে!

সপ্তম দিনে দেখা গেল—দূরে একটা ছোট শহর, তার উপরে উড়ছে ধোঁয়া। বোম্বেটেরা আনন্দে নেচে উঠল। কারণ বিনা কার্য হয় না, আগুন বিনা ধোঁয়া হয় না। আর আগুন মানুষ ছাড়া আর কেউ জ্বালে না। বাসিন্দারা নিশ্চয়ই রাঁধছে—ও ধোঁয়া উনুনের ধোঁয়া।

পাগলের মতো তারা শহরের দিকে ছুটল—শূন্যে আকাশকুসুম চয়ন করতে করতে! এই তো, শহর তাদের সামনেই!

কারণ বিনা কার্য হয় না, আগুন বিনা ধোঁয়া হয় না। আর, আগুন মানুষ ছাড়া আর কেউ জ্বালে না।...হ্যাঁ, এ আগুনও মানুষই জ্বেলেছে বটে, স্পানিয়ার্ডরা শহর ছেড়ে অদৃশ্য হয়েছে এবং যাবার সময়ে শহরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেছে। বোম্বেটেরা এখানে ক্ষুদকুড়োটি পর্যন্ত পেলে না। একটা জ্যান্ত বা মরা কুকুর বিড়ালও শত্রুরা রেখে যায়নি।

একটা আস্তাবলে পাওয়া গেল কেবল প্রচুর মদ আর পাঁউরুটি। অমনি তারা সারি সারি বসে গেল ফলারে! কিন্তু পানাহার শুরু করতেই তাদের শরীর যাতনায় দুমড়ে পড়ল। চারিদিকে রব উঠল—'শত্রুরা খাবারে বিষ মিশিয়ে রেখে গেছে!' ভয়ে আঁতকে উঠে থু থু করে তারা তখনই মুখের খাবার ধুলোয় ফেলে দিলে।

অষ্টম দিনে বোম্বেটেরা পানামা নগরের খুব কাছে এসে পড়ল। ঘণ্টাদশেক পথ চলার পর তারা বনের ভিতরে একটা পাহাড়ের কাছে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই তাদের উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বৃষ্টি হতে লাগল। তীর দেখেই বোঝা গেল, রেড ইন্ডিয়ানরাও স্পানিয়ার্ডদের পক্ষ অবলম্বন করেছে। বোম্বেটেরা বেজায় ভয় পেয়ে গেল, কারণ এ সব তীর যারা ছুড়ছে তাদের টিকিটি পর্যন্ত কারুর নজরে পড়ল না।

বোম্বেটেরা বনপথে এগুবার চেষ্টা করলে, অমনি রেড ইন্ডিয়ানরা বিকট চিৎকার করতে করতে তাদের দিকে ছুটে এল। কিন্তু একে তাদের দল বোম্বেটেদের মতো পুরু নয়, তার উপরে তাদের আগ্নেয় অস্ত্রেরও অভাব, সুতরাং বেশিক্ষণ তারা যুঝতে পারলে না। রেড ইন্ডিয়ান সর্দার আহত হয়ে পড়ে গিয়েও আত্মসমর্পণ করলে না, কোনওরকমে একটু উঠে বসে একটা বোম্বেটের দিকে বর্শা নিক্ষেপ করলে, কিন্তু পর মুহূর্তেই পিস্তলের গুলিতে তার যুদ্ধের শখ এ জীবনের মতন মিটে গেল!

খানিক পরেই একটা বনের ভিতরে পাওয়া গেল দুটো পাহাড়। একটা পাহাড়ের উপরে উঠে বোম্বেটেরা দেখলে, অন্য পাহাড়টার উপরে চড়ে বসে আছে স্পানিয়ার্ড ও রেড ইন্ডিয়ানরা। তারা তখন নিচে এল। তাই দেখে শত্রুরাও নিচে নামতে লাগল। বোম্বেটেরা ভাবলে, এইবারে বুঝি আবার যুদ্ধ বাধে! কিন্তু শত্রুরা এখানে লড়াই না করেই কোথায় সরে পড়ল!

সে রাত্রে বোম্বেটেদের বিষের পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ করবার জন্যে আকাশে দেখা দিলে ঘনঘটা এবং তারপরেই নামল অশ্রান্ত বৃষ্টিধারা। নিরাশ্রয়ের মতো সেই ঝড়বাদলকে তাদের মাথা পেতেই গ্রহণ করতে হল। পরদিন সকালে—অর্থাৎ যাত্রার নবম দিনে প্রায় অনাহারে জলে ভিজে অত্যন্ত দুঃখিতভাবে তারা কাদা ভাঙতে ভাঙতে আবার অগ্রসর হল।

আচম্বিতে পথ সমুদ্রতীরে এসে পড়ল এবং দেখা গেল খানিক তফাতে কতকগুলো ছোট ছোট দ্বীপ রয়েছে। বোম্বেটেরা তখনই নৌকোয় চেপে দেখতে গেল, সে সব দ্বীপের ভিতরে কি আছে!

সে দ্বীপে পাওয়া গেল গরু, মোষ, ঘোড়া এবং সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় গাধা। বোম্বেটেরা মনের খুশিতে তাদের দলে দলে বধ করতে আরম্ভ করলে। তখনই তাদের ছাল ছাড়িয়ে আগুনের ভিতরে ফেলে দেওয়া হল। মাংস সিদ্ধ হওয়া পর্যন্তও তারা অপেক্ষা করতে পারলে না, ক্ষুধার চোটে প্রায় কাঁচা মাংসই চিবিয়ে খেতে লাগল। আজ এতদিন পরে এই প্রথম তারা মনের সাধে পেট ভরে খাবার সুযোগ পেলে!

খাবার খেয়ে নূতন শক্তি পেয়ে মর্গ্যানের হুকুমে আবার তারা পথে নামল। সন্ধ্যা যখন হয় হয় তখন দেখা গেল, দূরে প্রায় দুইশত স্পানিয়ার্ড তাঁদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে এবং তাদের পিছন থেকে দেখা যাচ্ছে, পানামা শহরের একটা উঁচু গির্জার চুড়ো।

বোম্বেটেরা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বিপুল উল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠল—চারিদিকে পড়ে গেল আনন্দের সাড়া। এইবারে তাদের পথশ্রম, রোদে পোড়া, জলে ভেজা ও পেটের জ্বালা শেষ হল। আসল যুদ্ধ এখনও হয়নি বটে, নগর এখনও নাগালের বাইরে বটে, কিন্তু সে অসুবিধা বেশিক্ষণ আর ভোগ করতে হবে না! আর তাদের বাধা দেয় কে?... সে রাতের মতো তাঁবু গেড়ে তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল হল। শত্রুদের পঞ্চাশজন অশ্বারোহী এসে দূরে থেকেই চেঁচিয়ে শাসিয়ে গেল—"ওরে পথের কুকুরের দল! এইবারে আমরা তোদের বধ করব!"—তারপরেই পানামা নগর থেকে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ হল—কিন্তু মিথ্যা সে গোলাগুলোর গোলমাল, কারণ গোলাগুলোর একটাও তাদের কাছ পর্যন্ত এসে পৌঁছল না।

দশম দিনের সকালে বোম্বেটেরা বসে বসে নিশ্চিন্তপ্রাণে খানা খেয়ে নিলে—অনেকেরই এই শেষ খানা!

তারপরেই জেগে উঠল তাদের জয়ঢাক আর রণভেরীগুলো। বোম্বেটেরা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সমতালে পা ফেলতে ফেলতে অগ্রসর হল।

দেখা গেল, দূরে কামানের সারের পর সার সাজিয়ে স্পানিয়ার্ডরা যুদ্ধক্ষেত্রে অপেক্ষা করছে। তারা জানে, বোম্বেটেরা এই পথেই আসবে।

এমন সময়ে সেই পথপ্রদর্শক ডাকাতরা মর্গ্যানকে ডেকে বললে, "হুজুর , এ পথে অনেক কামান, অনেক বাধা! বনের ভিতর দিয়ে আর একটা পথ আছে, সেটা ভাল নয় বটে কিন্তু সেখান দিয়ে খুব সহজেই শহরে পৌঁছানো যাবে।"

মর্গ্যান তাদের কথামতোই কাজ করলে—বোম্বেটেরা অন্য পথ ধরলে।

স্পানিয়ার্ডদের প্রথম চাল ব্যর্থ হল। বোম্বেটেরা যে হঠাৎ পথ বদলাবে, এটা তারা আশা করেনি। তাদের সমস্ত আয়োজন হয়েছিল এইখানেই। বাধ্য হয়ে তারাও অন্য পথে বোম্বেটেদের বাধা দেবার জন্যে ছুটল,—তাড়াতাড়িতে ভারি ভারি কামানগুলোকে এখান থেকে টেনে নিয়ে যাবারও সময় পেলে না। এই ভুল হল তাদের সর্বনাশের কারণ।

বোম্বেটেরা সভয়ে দেখলে, শত্রুর যেন শেষ নেই! কাতারে কাতারে লোক তাদের আক্রমণ করবার জন্যে বিকট চিৎকারে ধেয়ে আসছে—তাদের পিছনে আবার কাতারে কাতারে সৈন্য। এত শত্রুসৈন্য এক জায়গায় তারা আর কখনও দেখেনি! অশ্বারোহী, পদাতিক, কামানবাহী —কিছুরই অভাব নেই!

তার উপরে আছে আবার হাজার হাজার বুনো মোষের পাল—রেড ইন্ডিয়ান ও কাফ্রিরা মোষগুলোকে তাদের দিকেই তাড়িয়ে আনছে! সেকালে ভারতের রাজারা যুদ্ধক্ষেত্রে যে ভাবে হাতির পাল ব্যবহার করতেন, এরা এই বুনো মোষগুলোকে ব্যবহার করবে সেই ভাবেই!

একটা ছোট পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোম্বেটেরা শত্রুদের এই বিপুল আয়োজন লক্ষ্য করতে লাগল। এখন তাদের পালাবারও পথ বন্ধ। পিছনে জেগে আছে জনহীন, আশ্রয়হীন ও খাদ্যহীন সেই নির্দয় শ্মশানভূমি! নিজেদের বিপদসঙ্কুল অবস্থার কথা ভেবে বোম্বেটেরা

একেবারে মরিয়া হয়ে উঠল। তারা স্থির করলে—হয় মরবে, নয় মারবে! তারা পালাবেও না, আত্মসমর্পণও করবে না!

রণভেরী বেজে উঠল। মর্গ্যান সর্বাগ্রে দুইশত বাছা বাছা সুদক্ষ ফরাসি বন্দুকধারীকে দলের আগে আগে পাঠিয়ে দিলে।

স্পানিয়ার্ডরাও অগ্রসর হতে হতে চিৎকার করে উঠল—"ভগবান আমাদের রাজার মঙ্গল করুন!"

প্রথমেই আসছে শত্রুদের অশ্বারোহী সৈন্যদল। কিন্তু খানিক এগিয়েই তারা এক জলাভূমির উপরে এসে পড়ল—সেখানে ঘোড়া নিয়ে ঘোরাফেরাই দায়!

বোম্বেটে বন্দুকধারীরা এ সুযোগ অবহেলা করলে না, তারা মাটির উপরে এক হাঁটু রেখে বসে, টিপ ঠিক করে বন্দুক ছুড়লে এবং অনেকেরই লক্ষ্য হল অব্যর্থ! ঘোড়সওয়াররা জলাভূমির ভিতরে হাঁকপাক করে বেড়াতে লাগল এবং গুলির পর গুলির চোটে হয় ঘোড়া নয় সওয়ার হত বা আহত হয়ে নিচে পড়ে যেতে লাগল।

অশ্বারোহীদের আক্রমণে ফল হল না দেখে, বোম্বেটেদের ছত্রভঙ্গ করবার জন্যে বুনো মোষগুলো লেলিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু মোষেদের বেশির ভাগই গোলাগুলির আওয়াজে চমকে ও ভড়কে অন্যদিকে ছুটে পালাল, যারা এগিয়ে গেল তাদের বেশি রাগ হল মানুষের বদলে রঙিন নিশানগুলোরই উপরে। তারা পতাকা লক্ষ্য করে তেড়ে এল এবং সেই ফাঁকে বোম্বেটেরা তাদের গুলি করে নিশ্চিন্তপুরে পাঠিয়ে দিলে।

তারপর আরম্ভ হল বোম্বেটেদের সঙ্গে স্পানিয়ার্ড পদাতিকদের লড়াই। বোম্বেটেরা জানত, হারলে তারা কেউ আর প্রাণে বাঁচবে না। তাই তারা এমন মরিয়া হয়ে লড়তে লাগল যে, এক-একজন বোম্বেটেকে তিন-চারজন স্পানিয়ার্ড মিলেও কায়দায় আনতে পারলে না। বোম্বেটেদের এক হাতে পিস্তল, আর এক হাতে তরোয়াল,—দূরের শত্রুকে গুলি ছুড়ে মারে, কাছে পেলে বসিয়ে দেয় তরোয়ালের কোপ! তারা অসম্ভব শত্রু! ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ। স্পানিয়ার্ডরা যে যেদিকে পারলে সরে পড়ল—ছয়শজন মৃত সঙ্গীর দেহ যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রেখে।

এত আয়োজনের পর এত শীঘ্র লড়াই শেষ হয়ে যাবে, এটা কেউ কল্পনা করতে পারেনি।

পানামার পতন হল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পলাতক বিজয়ী নেতা

খুব সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যেই চেঙ্গিজ খাঁ, আলেকজান্দার, সিজার ও নেপোলিয়ন শত্রুসৈন্য ধ্বংস করতে পারতেন বলেই তাদের আজ এত নাম।

তাঁদের সঙ্গে বোম্বেটে মর্গ্যানের তুলনাই চলে না। কিন্তু মর্গ্যানের পানামা বিজয় যে বিশেষ বিস্ময়জনক ব্যাপার, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই।

পূর্বকথিত দিগ্বিজয়ীরা এক বা একাধিক সমগ্র জাতির সাহায্য পেয়েই বড় হয়েছিলেন।

কিন্তু মর্গ্যান হচ্ছে কতকগুলো জাতিচ্যুত, সমাজ থেকে বিতাড়িত, নীতিজ্ঞানশূন্য, হীন বোম্বেটের সর্দার। এবং তাদের শত্রুরা হচ্ছে অসংখ্য স্পানিয়ার্ড সৈনিক, প্রবল পরাক্রান্ত স্পেন

সাম্রাজ্যের অতুলনীয় শক্তি তাদের পিছনে, অস্ত্রশস্ত্রে ও সংখ্যাধিক্যে বোম্বেটেদের চেয়ে তারা ঢের বেশি বলিষ্ঠ। তবু যে তারা এত অনায়াসে হার মানতে বাধ্য হল, এটা একটা মস্ত স্মরণীয় ব্যাপার বলে স্বীকার করতেই হবে।

পানামার পতন হল। তারপর যেসব কাণ্ড আরম্ভ হল পাঠকরা তা কল্পনাই করতে পারছেন। বোম্বেটেরা প্রথমে দু'চোখো হত্যা করতে লাগল—সৈনিক, সাধারণ নাগরিক, কাফ্রি, বালক, নারী ও শিশু—খাঁড়া পড়ল নির্বিচারে সকলেরই উপরে। বোম্বেটেরা দলে দলে ধর্মযাজক বা পাদ্রী বন্দি করলে, প্রথমে তাদেরও পাদ্রী হত্যা করতে বিবেকে বাধল, তাই তাদের ধরে মর্গ্যানের কাছে নিয়ে গেল।

মর্গ্যান পাদ্রীদের কান্নায় কর্ণপাত না করে বললে, "মারো, মারো, সবাইকে মারো!"

লুণ্ঠন চলতে লাগল। পলাতকরা অনেক ধনরত্ন নিয়ে পালিয়েছিল, কিন্তু তখনও শহরে ছিল প্রচুর ঐশ্বর্য। সব পড়ল বোম্বেটেদের হাতে—হীরা, চুনি, পান্না, মুক্তো, সোনারুপোর আসবাব ও তাল এবং টাকাকড়ি আর যা কিছু।

তারপর মর্গ্যান জনকয়েক বোম্বেটেকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, "তোমরা চুপি চুপি শহরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে এসো।"

কেউ কিছু টের পাবার আগেই একদিন অকস্মাৎ সেই বৃহৎ নগরের উপরে অগ্নির রাঙা টকটকে জিভ লকলক করে জ্বলে উঠল। স্পানিয়ার্ডরা সবাই সেই আগুন নেবাতে ছুটল, এর মধ্যে তাদের সর্দারের হাত আছে না জেনে অনেক বোম্বেটেও তাদের সাহায্য করতে গেল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না— দেখতে দেখতে বিরাট অগ্নির বেড়াজালের মধ্যে গোটা শহরটাই ধরা পড়ল! বড় বড় প্রাসাদ, অট্টালিকা, কারুকার্য করা গির্জা, মঠ, গৃহস্থ ও গরিবের বাড়ি সমস্তই গেল আগুনের গর্ভে! সেই অগ্নিকাণ্ডে ছোট-বড় আট হাজার বাড়ি পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেল!

মর্গ্যান রটিয়ে বেড়াল—"স্পানিয়ার্ডরাই এই কাণ্ড করেছে!"

লুণ্ঠনের পর নির্যাতন। গুপ্তধনের সন্ধান। নির্যাতনের শত শত দৃষ্টান্তের মধ্যে একটা এখানে দেখাচ্ছি: জনৈক ধনী ভদ্রলোক বোম্বেটেদের ভয়ে ধনরত্ন নিয়ে পালিয়ে যান। তাঁর গরিব চাকরটা মনিবের একটা দামী পোষাক পেয়ে বুদ্ধির দোষে সেটা নিজে পরে ফেললে। কাঙালের ঘোড়ারোগ বরাবরই সাংঘাতিক। বোম্বেটেরা তাকে দেখেই ধরে নিলে, সে কোনও মস্তবড় লোক।

তার কাছ থেকে তারা টাকা দাবি করলে। সে কোত্থেকে টাকা দেবে? সে বললে, "আমি চাকর ছাড়া আর কিছু নই। এ পোষাক আমার মনিবের।"

বোম্বেটেরা বিশ্বাস করলে না। তখন প্রথমেই তারা সে বেচারার হাত দু'খানা দুমড়ে একেবারে ভেঙে দিলে। তাতেও মনের মতো জবাব না পেয়ে তারা সেই চাকরের কপালের উপর দড়ির ফাঁস লাগিয়ে এমন জোরে পাকাতে লাগল যে, চামড়ায় টান পড়ে তার চোখদুটো ডিমের মতো বড় হয়ে ঠিকরে পড়বার মতো হয়ে উঠল। তখনও গুপ্তধনের সন্ধান মিলল না। তারপর তাকে শূন্যে দড়িতে ঝুলিয়ে রেখে ঘুষি ও চাবুক মারা হতে লাগল। তার নাক ও কান কেটে নেওয়া হল—জ্বলন্ত খড় নিয়ে মুখে ছ্যাঁকা দেওয়া হতে লাগল। শেষকালে সে এই পৈশাচিক যাতনা থেকে মুক্তি পেলে বর্শার আঘাতে। অভাগা মরে বাঁচল।

তিন হপ্তা পরে দুরাত্মা মর্গ্যান পানামার ভস্মস্তূপ ছেড়ে বিদায় গ্রহণ করলে।

সঙ্গে করে নিয়ে চলল ছয়শ বন্দীকে—প্রচুর টাকা না পেলে সে তাদের ছাড়তে রাজি নয়। সেই ছয়শত স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, বালক, যুবা ও বৃদ্ধ বন্দীর মিলিত ক্রন্দনে আকাশ যেন ফেটে যাবার মতো হয়ে উঠল।

ভেড়ার পালের মত বন্দীদের আগে আগে তাড়িয়ে নিয়ে বোম্বেটেরা অগ্রসর হল। মর্গ্যানের হুকুমে বন্দীদের পানাহারও প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হল।

অনেক নারী আর সইতে না পেরে মর্গ্যানের পায়ের তলায় হাঁটু গেড়ে বসে কাতর মিনতির স্বরে বললে, "ওগো, আর আমরা পারি না। আপনার পায়ে পড়ি, আমাদের ছেড়ে দিন—আমরা স্বামী-পুত্রের কাছে ফিরে যাই! আমাদের যথাসর্বস্ব গেছে, তবু পাতার কুঁড়ে তৈরি করে স্বামী-পুত্রের সঙ্গে বাস করব!"

নিরেট লোহার মতো সুকঠিন মর্গ্যান বললে, "আমি এখানে কান্না শুনতে আসিনি—এসেছি টাকা রোজগার করতে। টাকা দিলেই ছাড়ান পাবে, নইলে সারাজীবন বাঁদী হয়ে থাকবে!"

সমুদ্রের ধারে গিয়ে মর্গ্যান বোম্বেটেদের সঙ্গে লুটের মাল ভাগ করতে বসল। নিজের মনের মতো হিসাব করে সকলকে সে অংশ দিলে।

কিন্তু সে অংশ সন্দেহজনক। এতবড় শহর লুটে এত পরিশ্রমের পর এই হল পাওনা, এত কম টাকা!

প্রত্যেক বোম্বেটে বিষম রাগে গরগর করতে লাগল। তাদের দৃঢ়বিশ্বাস হল, মর্গ্যান তাদের ফাঁকি দেবার জন্যে বেশিরভাগ দামী মালই সরিয়ে ফেলেছে! মর্গ্যানকে তারা মুখের উপরে কিছু খুলে বলতে সাহস করল না বটে, কিন্তু প্রত্যেকেই মারমুখো হয়ে রইল।

মর্গ্যান বুঝলে, গতিক সুবিধার নয়। এরা প্রত্যেকেই মরিয়া লোক, যেকোনও মুহূর্তে সে বিপদে পড়তে পারে।

আচম্বিতে একদিন দেখা গেল, চারখানা জাহাজ ও জনকয়েক খুব বিশ্বাসী লোক নিয়ে চোর মর্গ্যান একেবারে অদৃশ্য হয়েছে! একরাত্রেই সে সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে চলে গেল—বোম্বেটেরা তাকে ধরতে পারলে না। ধরতে পারলে কি হত বলা যায় না।

তারপর? তারপর মর্গ্যান আর কখনও বোম্বেটেদের সর্দার হয়নি। হবার উপায়ও ছিল না, হবার দরকারও ছিল না।

মর্গ্যানের চূড়ান্ত সৌভাগ্যের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তার নামডাক শুনে ইংলন্ডের রাজা তাকে দেখতে চাইলেন। তার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করলেন। তাকে স্যার উপাধি দিলেন। তাকে জামাইকা দ্বীপের গভর্নর করে পাঠালেন। চোর, জোচ্চোর, খুনী, চরিত্রহীন, ডাকাত ও বোম্বেটে মর্গ্যান হল হাজার হাজার সাধুর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—স্যার হেনরি মর্গ্যান!

*বিশ্বের শিয়রে মহাবিচারক মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়েন!

কিন্তু স্পানিয়ার্ডদেরও শাস্তির দরকার হয়েছিল। তাদের ভীষণ অত্যাচারে আমেরিকা নিদারুণ যন্ত্রণায় হাহাকার করছিল। ভগবানের মূর্তিমান অভিশাপেরই মতো হয়তো তাই মর্গ্যান লোলোনেজ, পর্তুগীজ ও ব্রেজিলিয়ানোর দল এসে আবির্ভূত হয়েছিল স্পানিয়ার্ডদের মাঝখানে।

বজ্রভৈরবের মন্ত্র

বজ্রভৈরব এবং শিলালিপি

সন্ধ্যা উতরে গেছে।

সুন্দরবাবু টেবিলের ধারে বসে একখানা চিঠি লিখছিলেন, হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে পিছন দিকে ফিরে তাকালেন।

জয়ন্ত ঘরের ভিতরে ঢুকে বললে, "কি বলেন সুন্দরবাবু, আমাকে দেখে আপনি নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য হয়েছেন?"

সুন্দরবাবু তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, মুখে তাঁর চরম বিস্ময়ের চিহ্ন। তিনি বললেন, "জয়ন্ত? তুমি? তুমি কলকাতায় ফিরে এসেছ। আমি তো জানতুম তুমি এখনও শ্যামদেশেই আছ।"

জয়ন্ত কোনও জবাব না দিয়ে আগে সুইচ টিপে ঘরের আলোটা দিলে নিবিয়ে। তারপর রাস্তার দিকের জানলার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে কি দেখতে লাগল। মিনিট চারেক সেইভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সে আবার ফিরে এসে আলো জ্বেলে দিয়ে বললে, "যাক, চুয়াং-এর চরকে তাহলে ফাঁকি দিতে পেরেছি!"

সুন্দরবাবু অধিকতর বিস্ময়ে বললেন, "হুম! কেই বা চুয়াং আর কেই বা তার চর? ব্যাপার কি জয়ন্ত?"

জয়ন্ত ফিরে এসে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললে, "চুয়াং হচ্ছে এক চীনেম্যানের নাম। একাধারে যে হচ্ছে যাদুকর আর দস্যুদলের সর্দার। বিচিত্র তার ক্ষমতা, সারা পৃথিবী পড়ে আছে যেন তার নখদর্পণে। ইউরোপ-আমেরিকাতেও মাঝে মাঝে গিয়ে রসাতল কাণ্ড বাধিয়ে সে কিনেছে ভয়াবহ নাম। চুপি চুপি আপনাদের কারুকে কোনও কথা না জানিয়ে তারই সন্ধানে আমি গিয়েছিলুম শ্যামদেশে—কারণ, আমি জানতুম সে শ্যামদেশেই আছে। হ্যাঁ, সে শ্যামদেশেই ছিল বটে, কিন্তু আপাতত তার আবির্ভাব হয়েছে কলকাতা শহরে। সেই খবর পেয়েই আমিও ফিরে এসেছি কলকাতায়। কিন্তু চুয়াংও আমার গতিবিধির সব খবরই রাখে। কলকাতায় পদার্পণ করেই আমি বুঝতে পারলুম চুয়াং-এর এক চর লেগেছে আমার পিছনে। হয়তো সর্দারের কাছ থেকে সে হুকুম পেয়েছিল আমাকে যে কোনও উপায়ে হত্যা করবার জন্যে!"

সুন্দরবাবু বললেন, "কী যে বল জয়ন্ত, এটা তো আর আফ্রিকার বনজঙ্গল নয়, এ হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী কলকাতা। এখানে প্রকাশ্য রাজপথের উপরে মানুষ খুন করা বড় চারটিখানেক কথা নাকি?"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "আপনি চুয়াংকে চেনেন না সুন্দরবাবু, তাই এই কথা বলছেন! চুয়াং ইংরেজ রাজত্বের সর্বপ্রধান নগর লণ্ডনেও গিয়ে একজন 'লর্ড', আর একজন 'স্যর' উপাধিধারী বিখ্যাত লোককে প্রায় সকলের চোখের সামনেই খুন করে এসেছে। তাঁদের তুলনায় আমি তো ক্ষুদ্র জীব মাত্র, চুয়াং আমাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই বা আনবে কেন?"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে সুন্দরবাবু বললেন, "জয়ন্ত, তুমি এ কি কথা শোনালে হে? এমন এক সাংঘাতিক অপরাধী সারা পৃথিবীর বুকে ছুটোছুটি আর খুনোখুনি করে বেড়াচ্ছে, অথচ কেউ তাকে ধরতে পারছে না!"

—"কেউ তাকে ধরতে পারছে না সুন্দরবাবু, কেউ তাকে ধরতে পারছে না! আজ এ দেশে, কাল ও দেশে সে বিদ্যুতের মতন দেখা দিয়েই আবার কোথায় অদৃশ্য হয়, আজ পর্যন্ত তার নাগাল পায়নি পৃথিবীর বড় বড় গোয়েন্দাও।

সেই চুয়াং এসেছে কলকাতায় এটা কি দুশ্চিন্তার কথা নয়?"

—"দুশ্চিন্তার কথা নয় আবার, ভয়ঙ্কর দুর্ভাবনার কথা!

কিন্তু চুয়াং কেনই বা কলকাতায় এসেছে, আর কেনই বা তুমি তার পিছনে পিছনে এতটা দৌড়াদৌড়ি করছ?"

জয়ন্ত চেয়ারের উপরে ভাল করে বসে ধীরে ধীরে বললে, "তাহলে শুনুন। যদিও চুয়াং-এর জীবনচরিত হচ্ছে যে কোনও রোমাঞ্চকর উপন্যাসেরও চেয়ে চিত্তাকর্ষক, তবু সে সব কথা আজ আমি আপনার কাছে বর্ণনা করতে চাই না। আমি কেবল বলতে চাই চুয়াং-এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোনখানে। কয়মাস আগে, এই কলকাতা শহরেই রহস্যজনক উপায়ে উপরউপরি তিনজন প্রত্নতাত্ত্বিকের মৃত্যু হয়েছিল, সে কথা বোধহয় আপনি ভোলেন নি?"

—"হুম, নিশ্চয়ই ভুলিনি! একদল প্রত্নতাত্ত্বিক ব্রহ্মদেশের কোন এক নিবিড় জঙ্গলে গিয়েছিলেন পুরাকালের কি একটা ভগ্নস্তূপ না মন্দির আবিষ্কার করতে। সেখানে গিয়ে তাঁরা কি দেখেছিলেন আর কি পেয়েছিলেন, তা আমি অবশ্য জানি না, কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসার পরই তাঁদের উপর দিয়ে বয়ে যায় নানান দৈব-দুর্ঘটনার ঝড়। সে দুর্ঘটনাগুলো দৈবের না দুষ্ট মানুষের কীর্তি এখন পর্যন্ত তা প্রকাশ পায়নি। তারপর একে একে তিনজন প্রত্নতাত্ত্বিকের অদ্ভুত আর আকস্মিক মৃত্যু হল, সন্দেহজনক হলেও তারও কারণ এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। তুমি তো সেই কথাই বলছ?"

—"হ্যাঁ। সেই প্রত্নতাত্ত্বিকদলের নেতা ছিলেন মনোমোহনবাবু। শেষটা ভয় পেয়ে এই মামলায় তিনিই আমাকে নিযুক্ত করেছেন।"

—"মানে? মামলাটা কিসের?"

—"মনোমোহনবাবু আমার কাছে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, ব্রহ্মদেশে তাঁর সহযাত্রী ওই তিন প্রত্নতাত্ত্বিকের মৃত্যুর মূলে আছে যাদুকর আর ডাকাত দলের সর্দার এই চুয়াং।"

—"তাঁর এমন সন্দেহের কারণ কি? সেই তিনজন প্রত্নতাত্ত্বিককে কেউ বা কারা যে খুন করেছে, পুলিস অনেক অনুসন্ধান করেও এমন কোনও প্রমাণ আবিষ্কার করতে পারেনি।"

—"কিন্তু সেই তিনজন প্রত্নতাত্ত্বিকের মৃত্যুর কারণ যে সন্দেহজনক, পুলিস একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।"

—"হ্যাঁ, আমিও একথা স্বীকার করতে বাধ্য।"

—"এখানে বাধ্যতা আর অবাধ্যতার কথা তুলে কোনও লাভ নেই, কিন্তু মনোমোহনবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস যে চুয়াংই কোনও গুপ্ত উপায়ে তাঁর তিনজন বন্ধুকে ইহলোক থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে পরলোকে।"

—"বেশ, তাও স্বীকার করতে পারি। কিন্তু তার আগে তোমাকে দেখাতে হবে, চুয়াং কোন বিশেষ কারণে ওই তিনজন প্রত্নতাত্ত্বিককে হত্যা করেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা হচ্ছেন অতি নিরীহ জীব। তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে জীবন্ত বর্তমান নয়, মৃত অতীতকে নিয়ে। চুয়াং-এর মতন একজন আধুনিক অপরাধী হঠাৎ মৃত অতীতের ভক্তদের শত্রু হয়ে দাঁড়াল কেন?"

—"মনোমোহনবাবুর মুখ থেকে তারও কিছু কিছু আভাস পেয়েছি।"

—"আভাস! আভাস নিয়ে কখনও গোয়েন্দাগিরি চলে?"

—"ব্যাপারটা এতই জটিল যে, মনোমোহনবাবু আভাস দেওয়া ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করতে পারেননি!"

—"কেন?"

—"আসল ব্যাপারটা মনোমোহনবাবু নিজেই এখনও ধরতে পারেননি—যদিও তাঁর মুখের কথা শুনে আমার মনে জেগে উঠেছে একটা সন্দেহ!"

—"সন্দেহটা কিসের?"

—"শুনুন। মনোমোহনবাবুর মুখে আমি শুনেছি, ব্রহ্মদেশের গভীর অরণ্যে গিয়ে তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন প্রাচীনকালের এক অজানা ভগ্নস্তূপ। মনোমোহনবাবু হচ্ছেন নিজেও ধনী, তাঁর সঙ্গী বন্ধুরাও কেউ দরিদ্র ছিলেন না। তাঁরা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন অনেক কুলি। সেই কুলিদের সাহায্যে স্তূপের নিচেকার মাটি খুঁড়ে তাঁরা অনেকগুলি সেকালকার দুর্লভ জিনিস সংগ্রহ করেছিলেন। সেই সংগ্রহের মধ্যে ছিল প্রাচীন যুগের নিত্যব্যবহার্য নানান দ্রব্য, কয়েকখানি শিলালিপি আর কয়েকটি ছোট-বড় প্রস্তরমূর্তি! এক জায়গায় একটি পাথরের ছোট সিন্দুকের ভিতরে ছিল একখানি শিলালিপি, আর সেকালকার বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের উপাস্য বজ্রভৈরবের মূর্তি! মনোমোহনবাবু এখনও সেই শিলালিপির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করতে পারেননি, কারণ সেই শিলালিপিখানি নাকি সেকালের প্রচলিত আর অপ্রচলিত নানা ভাষায় লেখা। তবে এইটুকু তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, সেই শিলালিপির কথাগুলি হচ্ছে এমন কোনও উপাসনার মন্ত্র যা উচ্চারণ করলে মানুষ এই পৃথিবীতে হতে পারে সর্বশক্তিমান। বজ্রভৈরবের মূর্তিকে সামনে স্থাপন করে সেই মন্ত্রগুলি সম্পূর্ণভাবে উচ্চারণ করতে হবে। আগেই বলেছি চুয়াং হচ্ছে যাদুকর। সে কেমন করে ওই মূর্তি আর শিলালিপির সন্ধান পেয়ে ওই দুটি দুর্লভ জিনিসকে হস্তগত করবার জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠে। মনোমোহনবাবুরা যখন ব্রহ্মদেশের সেই জঙ্গল থেকে ফিরে আসছিলেন, তখনই চুয়াং-এর সঙ্গে তাঁর একবার দেখা হয়েছিল। সেই সময়েই মনোমোহনবাবুর কাছে সে বলেছিল, ওই শিলালিপিখানি আর মূর্তিটি তার হাতে সমর্পণ করলে বিনিময়ে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা পেতে পারেন। কিন্তু মনোমোহনবাবু আর তাঁর সঙ্গীরা কেউ দরিদ্র ছিলেন না। প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে আলোচনাই ছিল তাঁদের জীবনের একমাত্র সাধনা। কাজেই সেই প্রস্তাবে তাঁদের কেহই রাজি হননি। চুয়াং এতটা আশা করেনি, কাজেই সে বেশি লোক নিয়ে মনোমোহনবাবুদের কাছে গিয়ে এই প্রস্তাব করতে যেতে পারেনি। মনোমোহনবাবুরা সেদিন ছিলেন রীতিমতো দলে ভারি। সুতরাং সেদিন চুয়াংকে বাধ্য হয়েই ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফিরে আসতে হয়। মনোমোহনবাবু বলেন, তাঁরা যখন জাহাজে চড়ে সমুদ্রপথে যাত্রা করেছেন,

তখনও নাকি ক'খানা অজানা বোম্বেটে জাহাজ তাঁদের আক্রমণ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে চেষ্টাও সফল হয়নি। তারপর কলকাতায় ফিরে এসেও তাঁরা নাকি নানান রকম বিপদের উপরে বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন। তারপর একে একে মনোমোহনবাবুর সঙ্গী তিনজন প্রত্নতাত্ত্বিকের অজানা উপায়ে মৃত্যু হল—আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেকের ঘর থেকে চুরি গেল ব্রহ্মদেশ থেকে আনা সেই সব পুরাকীর্তির এক বা একাধিক নমুনা। কিন্তু সেই বজ্রভৈরবের মূর্তি আর শিলালিপি আছে মনোমোহনবাবুরই কাছে। চুয়াং তখনও সেটা জানত না, তাই সে প্রথমেই মনোমোহনবাবুকে আক্রমণ করেনি। ওদিকে তিন তিনজন প্রত্নতাত্ত্বিকের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে কলকাতার পুলিস অত্যন্ত জাগ্রত হয়ে উঠেছে দেখে চুয়াং এখান থেকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে সরে পড়েছিল শ্যামদেশে। ইতিমধ্যে মনোমোহনবাবু এসে আমার আশ্রয় নিলেন, আর তাঁর মুখে সব কথা শুনে মামলাটার নূতনত্ব দেখে উৎসাহিত হয়ে আমিও ছুটে গেলুম শ্যামদেশে, চুয়াং -এর খোঁজে। সেখানে গিয়ে চুয়াং সম্বন্ধে অনেক তথ্যই সংগ্রহ করেছি। আর এও জেনেছি যে, মূর্তি আর শিলালিপি মনোমোহনবাবুর কাছে আছে জেনে চুয়াং আবার এসে হাজির হয়েছে কলকাতা শহরে। তিনজন প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রাণ গিয়েছে, এইবার হচ্ছে মনোমোহনবাবুর পালা। এখন আমাদের কি করা উচিত সুন্দরবাবু?"

সুন্দরবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "অদ্ভুত মামলা! আমি কিছুই আন্দাজ করতে পারছি না! তবে এইটুকু কেবল বুঝতে পারছি যে, অতঃপর মনোমোহনবাবুর উপরে পুলিসের কড়া পাহারা রাখা দরকার!"

জয়ন্ত বললে, "পুলিসের পাহারা বসিয়েও চুয়াংকে কোন দেশেই কেউ বাধা দিতে পারেনি। সে তার কর্তব্যপালন করতে কিছুমাত্র বিলম্ব করে না। সে—"

ঠিক এই সময়ে সিঁড়ির উপরে দ্রুত পদশব্দ জাগিয়ে ঘরের ভিতরে এসে প্রবেশ করলে মানিক। উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "জয়, মনোমোহনবাবু এখনই আমাদের ফোন করেছিলেন—"

জয়ন্ত বিদ্যুতাহতের মতন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "কেন, কেন, কেন?"

—"মনোমোহনবাবুর বাড়ির সুমুখের রাস্তার উপর দিয়ে আজ সন্ধ্যার পর থেকে খালি নাকি চীনেম্যানের পর চীনেম্যান আনাগোনা করছে! ও পাড়ায় সারা বছরেও তিন চার জনের বেশি চীনেম্যান দেখা যায় না! তিনি অত্যন্ত ভয় পেয়ে আমাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, তুমি কলকাতায় ফিরে এসেছ কিনা?"

জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বললে, "শুনলেন তো সুন্দরবাবু? আর কোনও প্রশ্ন করবেন না, এখনই একদল সশস্ত্র সেপাই নিয়ে মনোমোহনবাবুর বাড়িতে যাবার ব্যবস্থা করুন! চলো মানিক, আমরা আর এখানে অপেক্ষা করতে পারি না! সুন্দরবাবুর দলবল আসুক আর না আসুক আমাদের এখনই গিয়ে হাজির হতে হবে ঘটনাস্থলে!" বলতে বলতে সে মানিকের হাত ধরে টেনে ঘরের ভিতর থেকে ছুটতে ছুটতে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সুন্দরবাবু ভ্যাবাচ্যাকার মতন এদিক ওদিকে তাকিয়ে কেবলমাত্র বললেন, "হুম! অবাক কাণ্ড বাবা!"

"মোটেই নয়, মোটেই নয়"

মনোমোহনবাবুর বাড়িখানা দেখতে দস্তুরমতো অদ্ভুত। তাকে চওড়া স্তম্ভ বললেও ভুল হয় না। কিন্তু উচ্চতায় বাড়িখানা পাঁচতলা। প্রত্যেক তলায় মাত্র দু'খানি করে ঘর। বাড়ির ভিতর দিকে প্রতি ঘরের সামনে দালান এবং দুই দিকের দালানের মাঝখান দিয়ে পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে গেছে সিঁড়ির সার। বাড়ির বাইরের দিকে বারান্দা নেই।

মনোমোহনবাবু চিরকুমার। প্রাচীন পুঁথি, শিলালিপি, মুদ্রা এবং সেকেলে নানান জিনিস নিয়ে অল্প বয়স থেকেই এত বেশি ব্যস্ত হয়ে আছেন বলেই বোধ করি তিনি বিবাহের কথা ভাববার সময় পর্যন্ত পাননি। পাচক, বেয়ারা, দাসী ও দারোয়ানদের নিয়ে তিনি এই বাড়ির ভিতরে বসে যাপন করেন একান্ত শান্তিপূর্ণ জীবন।

বাড়ির কাছে গিয়ে জয়ন্ত ও মানিক এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখলে, কিন্তু সন্দেহজনক কোনও চেহারা নজরে পড়ল না।

বাড়ির সদর দরজায় পাহারা দিচ্ছিল এক শিখ দারোয়ান, জয়ন্তদের দেখেই সে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম ঠুকে জানালে যে, মনোমোহনবাবু একতলার বৈঠকখানাতেই বসে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

বৈঠকখানার ভিতরে একালকার জিনিসের মধ্যে আছে কেবল একটি টেবিল, খানকয় চেয়ার ও একখানি কার্পেট, তা ছাড়া বাকি সমস্তরই সঙ্গে জড়িত আছে সুদূর অতীতের স্মৃতি। ঘরখানাকে দেখলে বৈঠকখানা বলে কোনও সন্দেহই হয় না, মনে হয় যেন কোনও মিউজিয়ামের মধ্যে প্রবেশ করলুম!

ঘরের সর্বত্রই বিরাজ করছে রীতিমতো একটা লণ্ডভণ্ড ভাব—যেন দুটো পাগলা ষাঁড় সেখানে ঢুকে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করতে করতে সমস্ত জিনিসপত্তর চতুর্দিকে ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছে! ঘরের দুই দিকের দেওয়াল জুড়ে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেবল মোটা মোটা বই ভরা আলমারির পর আলমারি।

তা ছাড়া সবখানেই বিষম বিশৃঙ্খলা—যেখানে যা থাকবার কথা নয় ঠিক সেই খানেই আছে সেই জিনিসটি! কার্পেটের অধিকাংশ জুড়ে এলোমেলো ভাবে দাঁড়িয়ে আছে ছোট বড় মাঝারি এবং ভাঙা বা আভাঙা পুরাতন পাথরের মূর্তির পর মূর্তি! দেখলেই বোঝা যায় মনোমোহনবাবু মূর্তিগুলোকে ঘরের ভিতরে এনে যেখানে যেভাবে রেখে পরীক্ষা করেছিলেন তারা সেইখানে ঠিক সেই অবস্থাতেই পড়ে আছে আজ পর্যন্ত এবং গৃহকর্তা এমন অবসর আর পাননি যে, তাদের যথাস্থানে সরিয়ে বা সাজিয়ে রাখেন!

টেবিলের উপরে, চেয়ারের উপরে, মেঝের উপরে বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে অসংখ্য পুঁথিপত্র, প্রাচীন শিলালিপি বা তাম্রলিপি, সেকেলে বেরঙা ধাতুর থালা, বাটি বা অন্যান্য পাত্র এবং ভাঙাচোরা পাথরের টুকরো-টাকরা প্রভৃতি। তার উপরে যে দিকে চোখ ফেরানো যায় সেইদিকেই নজরে পড়ে খালি ধুলো ধুলো আর ধুলো! কোথাও কোথাও সেই ধুলো আবার এক ইঞ্চি পুরু হয়ে জমে ওঠবার সুযোগ পেয়েছে।

টেবিলের সামনে একখানি মাত্র চেয়ারের উপরে পুঁথিপত্র বা অন্য কোনও জিনিসের বদলে বিরাজ করছে একটি মনুষ্য-মূর্তি তিনিই হচ্ছেন পৃথিবীপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক মনোমোহনবাবু।

বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। তাঁর মাথার মাঝখান জুড়ে আছে মস্ত একটি গোলাকার টাক, কিন্তু টাক যেখানে শেষ হয়েছে সেইখান থেকে আরম্ভ হয়েছে কাঁচায় পাকায় মেশানো প্রায় দুই স্কন্ধদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত লম্বা লম্বা চুল এবং সেই চুলগুলোর এলোমেলো অবস্থা দেখে বুঝতে দেরি লাগে না যে, তাদের উপর দিয়ে কখনও যাতায়াত করবার স্পর্ধা রাখে না চিরুনি বা বুরুশ! মনোমোহনবাবুর মুখমণ্ডলের তলদেশটাও সমাচ্ছন্ন করে আছে আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রু ও গুম্ফ! ভদ্রলোক বোধহয় খালি চোখে ভাল করে দেখতে পান না, কারণ তাঁর নাকের উপরে রয়েছে দু'খানা বিষম পুরু কাচওয়ালা চশমা। সেই চশমার কাচের পিছনে এবং অত্যন্ত রোমশ দুই ভুরুর ছায়ায় দেখা যাচ্ছে কেমন যেন অন্যমনস্ক ও তন্দ্রাতুর, অথচ বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা মাখা দু'টি আশ্চর্য চক্ষু! মনোমোহনবাবুর পরনে একটি খাকি রংয়ের শার্ট ও সেটি বোতামবিহীন বলে তার তলা থেকে উঁকি মারছে বেশ একটি মলিন গেঞ্জি। তিনি যে আধময়লা কাপড়খানি পরেছেন সেখানি হাঁটুর নিচে পর্যন্ত এসে পায়ের দিকে আর এগুতে চেষ্টা করছে না। জয়ন্তের মুখেই আমরা শুনেছি মনোমোহনবাবু নাকি অতিশয় ধনবান ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হয়, তিনি যেন একজন আধপাগলা, স্বল্প মাহিনার ইস্কুলমাষ্টার ছাড়া আর কিছুই নন।

জয়ন্ত ও মানিককে ঘরের ভিতরে আসতে দেখেই মনোমোহনবাবু তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং অত্যন্ত ব্যস্তভাবে দু'খানা চেয়ারের উপর থেকে কতকগুলো পুঁথিপত্র ঠেলে ঘরের মেঝেয় দুমদাম শব্দে ফেলে দিলেন। তারপর অত্যন্ত খুশিকণ্ঠে বললেন, "আসুন জয়ন্তবাবু, আসুন মানিকবাবু, আপনাদের দেখে আমার ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল!"

জয়ন্ত ও মানিক এই অদ্ভুত ঘরের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত ছিল, কাজেই তারা গিয়ে আসন গ্রহণ করলে বেশ সহজ ভাবেই।

জয়ন্ত বললে, "কি ব্যাপার মনোমোহনবাবু, হঠাৎ আপনি এতটা ভয় পেয়েছেন কেন?"

মনোমোহনবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে তাঁর দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, "বলেন কি মশাই, ভয় পাব না? যে পাড়ায় ন'মাসে ছ'মাসে মঙ্গোলীয় চেহারা দেখা যায় এক-আধজন, সেখানে কিনা আজ রাস্তার উপরে দেখছি দলে দলে চীনেম্যানের শোভাযাত্রা! জানেন তো, আমার তিন প্রত্নতাত্ত্বিক শিষ্য সতীশ, যতীশ আর মৃগাঙ্ক হঠাৎ মারা পড়েছে রহস্যজনক উপায়ে! আপনি নিজেই সন্দেহপ্রকাশ করে গিয়েছেন যে, সে বেচারিরা ইহলোক থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে সেই ভয়ানক চীনেম্যান চুয়াং এর ষড়যন্ত্রেই! বর্মায় একদিন মাত্র চুয়াংকে চোখে দেখেছিলুম, কিন্তু আজও মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নে সেই ভয়াবহ মুর্তিকে দেখে শিউরে আর চমকে না জেগে থাকতে পারি না! এই পাড়ায় হঠাৎ চীনে পল্টনের শোভাযাত্রা! বলেন কি মশাই, ভয় পাব না আবার !"

জয়ন্ত বললে, "আমরা যখন এসে পড়েছি তখন আপনার আর কোনও ভয়ের কারণই নেই।"

মনোমোহনবাবু বললেন, "ভয়ের কারণ আছে কিনা জানিনা, তবে আপনাদের দেখে আমি কতকটা আশ্বস্ত হয়েছি বটে।"

—"কিন্তু আমরা এখানে এসে পথের উপরে একটা চীনেম্যানকেও আবিষ্কার করতে পারলুম না।"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও সেটা লক্ষ্য করেছি। পাঁচতলার ঘরে জানলার ধারে আমি দূরবীন নিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, আমিও দেখেছি পথের উপর থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে চীনেম্যানদের শোভাযাত্রা! তাইতো আমি কতকটা ভরসা পেয়ে নেমে এসে বৈঠকখানায় আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলুম। কিন্তু চীনেম্যানগুলো কেনই বা দৃশ্যমান হল আর কেনই বা হঠাৎ আবার অদৃশ্য হল তারও কারণ কিছু বুঝলুম না! এও যেন একটা মস্ত রহস্য বলেই মনে হচ্ছে!"

—"আচ্ছা মনোমোহনবাবু, আপনার দূরবীনের ভিতরে রাস্তায় চুয়াং-এর মতো কোনও চেহারা ধরা পড়েছে কি?"

—"বলেন কি মশাই, চুয়াং-এর দেখা পেলে এতক্ষণে আমি আপনাকে সেকথা জানাতুম না? মোটেই নয়, মোটেই নয়, চুয়াং-ফুয়াং কারুকেই আমি দেখিনি, দেখেছি কেবল দলে দলে অচেনা চীনেম্যান!"

জয়ন্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর সে খুব মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বললে, "মনোমোহনবাবু, যতটা পারেন চুপিচুপি কথা কইবেন। শ্যামদেশে গিয়ে চুয়াং-এর যে ইতিহাস আমি সংগ্রহ করেছি তা হচ্ছে ভয়ঙ্কর! চুয়াং যার উপরে দৃষ্টি দেয় তার ঘরের দেওয়ালগুলো পর্যন্ত যেন মানুষের কথা শুনতে পায়! কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। সেই বজ্রভৈরবের মূর্তি আর শিলালিপিখানা কি এই বাড়ির ভিতরেই আছে?"

মনোমোহনবাবু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে জয়ন্তের কানে কানে বললেন, "মোটেই নয়, মোটেই নয়! আপনার কথামতো সেই দু'টো বিপজ্জনক জিনিসকে আমি ব্যাঙ্কের 'সেফ ডিপোজিট ভল্ট'-এ রেখে এসেছি।"

এমন সময় বাইরের রাস্তায় শোনা গেল সুন্দরবাবুর উচ্চ কণ্ঠস্বর—"জয়ন্ত, ও জয়ন্ত! এইটেই কি মনোমোহনবাবুর বাড়ি? তুমি কি এখানে আছ?"—তারপরই সজোরে শোনা গেল কয়েকটা সদর্প এবং সবুট পায়ের খট খট আওয়াজ!

জয়ন্তের ইঙ্গিতে মানিক তাড়াতাড়ি উঠে দ্রুতপদে বাইরে গিয়ে বললে, "চুপ সুন্দরবাবু, চুপ! অপরাধী গ্রেপ্তার করতে এসেছেন, চেঁচিয়ে এখানে আকাশ ফাটাবেন না!"

সুন্দরবাবু ভড়কে গিয়ে বললেন, "হুম! বেশ, তাহলে আমি এই মুখ বন্ধ করলুম!"

—"আপনাদের সঙ্গে ছ'জন সেপাই এসেছে দেখছি। ওদের নিয়ে চটপট ভিতরে ঢুকে পড়ুন।...দারোয়ান, তুমি সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দাও। সেপাইদের নিয়ে তুমি এই দরজার ঠিক পিছনেই বসে থাকো। আসুন সুন্দরবাবু, আপনার সঙ্গে মনোমোহনবাবুর পরিচয় করিয়ে দিই।"

বৈঠকখানায় ঢুকে চারিদিকে সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, "হুম, হুম! এমন অসম্ভব ঘর তো জীবনে আমি কখনও দেখিনি! এ ঘরের ভিতরে কি ভূমিকম্প হয়েছে?"

মনোমোহনবাবু আবার উঠে দাঁড়িয়ে আর একখানা চেয়ারের উপর থেকে মাঝারি আকারের একটি বুদ্ধমূর্তিকে নামাতে নামাতে বললেন, "বলেন কি মশাই? এ ঘরের ভিতরে ভূমিকম্প হলে আমি কি আর বাঁচব? মোটেই নয়, মোটেই নয়! এ ঘরে সঞ্চিত হয়ে আছে আমার সারা জীবনের সাধনার ধন! বসতে আজ্ঞা হোক মশাই, এই চেয়ারে বসতে আজ্ঞা হোক!"

সুন্দরবাবু যেন মনোমোহবাবুর কথা শুনতেই পেলেন না। মহা বিস্ময়ে ঘরের নানা দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করতে করতে বললেন, "ওরে বাবা, এ আবার কোথায় এসে পড়লুম?"

মানিক বললে, "আপনি ধাপধাড়া গোবিন্দপুরের কোনও বাড়িতে আসেননি, আপনি এসেছেন প্রত্নতাত্ত্বিক মনোমোহনবাবুর বাড়িতে। ইনিই হচ্ছেন মনোমোহনবাবু!"

মনোমোহনবাবু সবিনয়ে সুন্দরবাবুকে নমস্কার করলেন। কিন্তু সুন্দরবাবু তাঁকে প্রতিনমস্কার করতে ভুলে গেলেন, কারণ সেই মুহূর্তেই তাঁর দৃষ্টি পড়ল মনোমোহনবাবুর পায়ের দিকে। দুই ভুরু কপালের দিকে ঠেলে তুলে তিনি বললেন, "আমি কি আজ উল্টো রাজার দেশে এসে পড়েছি? হ্যাঁ মশাই, আপনার দু'পায়ে দু'রংয়ের চটিজুতো কেন? এখানকার সব নিয়মই কি সৃষ্টিছাড়া? হুম!"

মনোমোহনবাবু হেঁট হয়ে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, "বলেন কি মশাই? তাই তো, ঠিকই বলেছেন তো! আমার এক পায়ে দেখছি 'ব্রাউন' আর একপায়ে দেখছি কালো রংয়ের চটি! নাঃ, চাকর-বাকরদের নিয়ে আর পারা গেল না!"

জয়ন্ত হেসে ফেলে বললে, "পায়ে জুতো পরেছেন আপনি নিজে, চাকর বেচারিদের দোষ কি বলুন? তারাই কি আপনার পায়ে জুতো পরিয়ে দেয়?"

—"মোটেই নয়, মোটেই নয়! জুতো পরি আমি নিজেই! কিন্তু আজ আমি জুতো পরেছি ঠিক একটি আস্ত গাধার মতো! নিকুচি করেছে দু'পায়ের দু'রকম জুতোর! চুলোয় যাক, চুলোয় যাক"—বলতে বলতে তিনি দুই হাতে দুই পায়ের জুতো সজোরে খুলে ফেলে চিৎকার করে উঠলেন, "এই ভুতো! এই মোনা! হতভাগারা এতদিন ধরে আমার বাড়িতে চাকরি করছিস, তবু এতক্ষণেও দেখতে পাসনি যে, আমি দু'পায়ে পরেছি দু'রঙের জুতো? না, দশজনের সামনে তোরাই আমার মাথা হেঁট করবি দেখছি! শিগগির নিয়ে আয় এক রঙের একজোড়া চটি জুতো! দেরি করলে আর বাঁচবি নে, গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেব কিন্তু!"

ভুতোই হোক আর মোনাই হোক কে একজন অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ঘরের ভিতরে এসে মনোমোহনবাবুর দুই পায়ে পরিয়ে দিয়ে গেল একজোড়া বার্নিশ করা কালো জুতো!

মনোমোহনবাবু তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে বললেন, "ওরে, তুই আজ আমার মান বাঁচালি! ভদ্রলোকদের সামনে আর একটু হলেই আমার মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল আর কি! এই নে বখশিশ! যাঃ, বিদেয় হ এখান থেকে!" বলেই তিনি পকেট থেকে একখানা দুই টাকার নোট বার করে ভৃত্যের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যও গালভরা হাসি হাসতে হাসতে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল!

মানিক বললে, "আপনার বাড়িতে আমাকে একটা চাকরি দেবেন মনোমোহনবাবু?"

—"মোটেই নয়, মোটেই নয়! আমার বাড়িতে আপনি চাকরি করবেন! বলেন কি মশাই?"

—"আমি বেশ বুঝতে পারছি মনোমোহনবাবু, আপনার বাড়ির চাকর-বাকররা মাস মাইনের উপরেও রোজই বোধহয় পাঁচ দশ টাকা বখশিশ পায়! এমন আশ্চর্য বাড়িতে চাকরি করাও সৌভাগ্য! আমাকে এখানে একটি চাকরি দেবেন মনোমোহনবাবু?"

মনোমোহনবাবু নিজের চেয়ারের উপরে ধপাস করে বসে পড়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "মোটেই নয়, মোটেই নয়! আপনি আমাকে পাগল ভেবে ঠাট্টা করছেন মানিকবাবু!

আপনাকে চাকরি দেবার স্পর্ধা কোনদিনই আমার হবে না। জয়ন্তবাবু, আপনি চুপ করে আছেন কেন? বোধহয় আমি ভারি ছেলেমানুষি করে ফেলেছি, নয়?"

জয়ন্ত বললে, " ও সব কথা এখন রাখুন মনোমোহনবাবু। মাথার উপরে ঝুলছে যখন মহা বিপদের খাঁড়া তখন বাজে কথায় সময় নষ্ট করে কোনও লাভ নেই। সুন্দরবাবু, আপনি কি খেয়ে-দেয়ে এখানে এসেছেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "খেয়ে-দেয়ে এখানে আসব মানে? আমি কি রাত বারটার আগে কোনওদিন খাই? আর খেয়ে-দেয়েই বা এখানে আসব কেন বলো দেখি?"

জয়ন্ত বললে, "কারণ হয়তো আজ সারারাতই আমাদের এখানে অত্যন্ত সচেতন হয়ে বাস করতে হবে।"

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, "হুম! শূন্য উদরে বাইরে কোথাও রাত্রিবাস করবার অভ্যাস আমার একেবারেই নেই। এখানে যদি রাত্রিবাস করতে হয়, তাহলে বাড়িতে গিয়ে এখনই আমার খেয়ে আসা উচিত।"

মনোমোহনবাবু অতিশয় অপরাধীর মতন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "বলেন কি মশাই? আমাকে রক্ষা করতে এসে আপনাদের কি উপোস করতে হবে? মোটেই নয়, মোটেই নয়। আমি এখনই আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আজ আপনারা আমার অতিথি।"

জয়ন্ত বললে," সে কথাই ভাল। খাওয়া-দাওয়ার পরে আমরা এই ঘরেই বসে বিশ্রাম করব।"

কোহিনুরেরও চেয়ে দামী মুদ্রা

রাত প্রায় বারটার পরে খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ করে সকলে আবার এসে বসল বৈঠকখানায়।

অতিরিক্ত আহার্য গ্রহণ করায় সুন্দরবাবুর অতি বৃহৎ ভুঁড়িটি আজ আবার স্ফীত এবং ভারি হয়ে উঠেছে অধিকতর—যেন সে 'ইউনিফর্মে'র বন্ধন ঠেলে বাইরে আত্মপ্রকাশ করবার চেষ্টা করছিল ক্রমাগত। ভুঁড়িকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে তার উপরে হাত বুলোতে বুলোতে সুন্দরবাবু কৃত্রিম বিরক্তির স্বরে বললেন, "এ আপনার ভারি অন্যায় কিন্তু মনোমোহনবাবু!"

মনোমোহনবাবু ব্যস্তভাবে বললেন, "বলেন কি মশাই, না জেনেশুনে আমি কি কোনও খারাপ কাজ করে ফেলেছি?"

—"না জেনেশুনে কেন, যে অপরাধ করেছেন জেনেশুনেই করেছেন!"

—"আমি জেনেশুনে অপরাধ করেছি? মোটেই নয়, মোটেই নয়।"

—"হুম, অতিথিদের প্রাণ বধ করবার জন্যে জোর করে এত বেশি খাবার খাইয়ে দেওয়া কি আপনার উচিত হয়েছে?"

—"রক্ষে পাই, এই কথা?" বলেই মনোমোহনবাবু হো হো রবে উচ্চহাস্য করতে লাগলেন।

—"আমি এখন কি করি বলুন দেখি? আমার যে এখনই লম্বা হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়বার ইচ্ছে হচ্ছে! তা এমনি আপনার ঘরের দশা, একখানা পা রাখবার জায়গা নেই, এখানে লম্বা হয়ে শোবার চেষ্টা করা দুশ্চেষ্টা মাত্র!"

মানিক বললে, "সুন্দরবাবু, আমরা এখানে লম্বা হয়ে শুতে আসিনি, সোজা হয়ে বসে রাত জেগে পাহারা দিতে এসেছি।"

—"কিসের পাহারা বাপু? শত্রু কোথায়? রাস্তায় জনকয় চীনেম্যান দেখলেই কি বুঝে নিতে হবে যে, আজ রাত্রে তারা দল বেঁধে এই বাড়িখানাকে আক্রমণ করবে? নিতান্তই আজ মনোমোহনবাবুর নুন খেয়ে ফেলেছি, তাই অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরেও এখানে হাজির আছি, নইলে অকারণে এখানে আমি রাত কাটাতে রাজি হতুম না। উঃ, কী ঘুমটাই পেয়েছে রে বাবা!" বলতে বলতে অর্ধনিমীলিত নেত্রে সুন্দরবাবু মস্ত একটা হাই তুলে ফেললেন।

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, চুয়াং আর তার দলকে আপনি চেনেন না! পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই পুলিস চুয়াংকে জানে, কিন্তু তবু আজ পর্যন্ত কেউ তাকে ধরতে পারেনি। চুয়াং কাজ হাসিল করে প্রায় প্রকাশ্যেই, কিন্তু তাকে ধরতে গেলেই সে মিলিয়ে যায় হাওয়ার মতো। মনোমোহনবাবু যথাসময়ে আমাদের খবর দিয়ে বড় বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। সে আজ এখানে নিজে আসবে কিনা জানি না, কিন্তু যদি আসে, আর যদি আমরা তাকে গ্রেপ্তার করতে পারি তাহলে নাম আর পদোন্নতি হবে আপনারই—কারণ বরাবরের মতো এবারেও আমি থাকব যবনিকার অন্তরালে। গোয়েন্দাগিরি হচ্ছে আমার শখ—আমার পেশা নয়। অতএব আর বাক্যব্যয় না করে আপনি দয়া করে ওই বড় চেয়ারখানার উপরে গিয়ে বসে পড়ুন। বসে বসে ঘুমোতে পারেন, ঘুমোন! দরকার হলেই যথাসময়ে আপনাকে জাগিয়ে দেব।"

সুন্দরবাবু আর কিছু না বলে বড় চেয়ারখানাকে টেবিলের সামনে টেনে আনলেন। তারপর চেয়ারের উপরে বসে টেবিলের উপরে মাথা রাখতে গিয়ে তন্দ্রাতুর চক্ষে দেখলেন, সেখানে পাঁচ-সাত টুকরো বিবর্ণ ধাতুর গোল গোল চাকতি পড়ে রয়েছে। তিনি অবহেলা ভরে সেগুলোকে হাত দিয়ে ঠেলে টেবিলের উপর থেকে ফেলে দিতে গেলেন।

মনোমোহনবাবু হাঁ হাঁ করে উঠে সবেগে টেবিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন, "করেন কি, করেন কি মশাই? আপনি তো সর্বনেশে লোক দেখছি!"

—"কেন, হল কি?"

মনোমোহনবাবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "হল কি? বলেন কি মশাই? এগুলি কি জানেন? প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা! সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের, সম্রাট হর্ষবর্ধনের স্বর্ণমুদ্রাও আছে এর মধ্যে! আজ এর এক একটির দাম লক্ষ লক্ষ টাকার চেয়েও বেশি! এর প্রত্যেকটি হচ্ছে অমূল্য—এক একটি রাজ্যের বিনিময়েও এমন এক একটি স্বর্ণমুদ্রা আপনি কিনতে পারবেন না!"

সুন্দরবাবুর তন্দ্রা গেল ছুটে—তাঁর দুই চক্ষু হয়ে উঠল ছানাবড়ার মতো! কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো বসে থেকে তিনি বললেন, "এই রাবিশগুলো হচ্ছে সোনার টাকা? হুম!"

জয়ন্ত বললে, "সোনার টাকা নয় সুন্দরবাবু, এর এক একটির দাম কোহিনূরেরও চেয়ে বেশি।"

—"হুম! মনোমোহনবাবু এমন সব অমূল্য জিনিসকে এই ভাবে অযত্নে এখানে ফেলে রেখেছেন?"

মনোমোহনবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "মোটেই নয়, মোটেই নয়! এ ঘরের কোনও কিছুকেই আমি অযত্নে ফেলে রাখিনি! এ ঘরের মধ্যে যা কিছু দেখছেন, তার প্রত্যেকটিকেই

আমি আমার প্রাণেরও চেয়ে মূল্যবান বলে মনে করি! অবশ্য এদের উপরে আজ ধুলো পড়েছে। বহু শতাব্দীর অবহেলায় এদের রং গেছে জ্বলে—কিন্তু তাতে কি হয়েছে মশাই? মানুষ খালি বাইরের রূপ দেখতে চায়, ভিতরের মূল্য বোঝে না, তাই পদে পদে সে করে অবিচার!"

সুন্দরবাবু লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, "মাপ করবেন মনোমোহনবাবু, আপনার এই আশ্চর্য ঘরে এসে আমি প্রায় উদভ্রান্তের মতো হয়ে গিয়েছি! এইবার বুঝতে পারছি, হয়তো এখানকার প্রত্যেক ধূলিকণা হচ্ছে হীরার কণার মতো! এমন বাড়িতে ডাকাত এসে হানা দেবে না? হুম, দেবেই তো, দেবেই তো! ওগুলিকে আপনি দয়া করে সরিয়ে রাখুন মনোমোহনবাবু, আমি এইবার ওখানে মাথা রেখে একটুখানি ঘুমোবার চেষ্টা করব। উরে বাবা, কী ঘুমই যে পেয়েছে! সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের প্রেতাত্মা এখন যদি এসে বলেন—'তুমি ঘুমিও না, আমি তোমাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিচ্ছি,' তাহলেও আমি এক মিনিট জেগে থাকতে রাজি হব না। হুম, হুম, হুম!" বলতে বলতে তাঁর মাথা টেবিলের উপরে অবশ হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে বললে, "ব্যস, আর কোনও কথা নয়! হয়তো আজ আমাদের খালি কাদা ঘেঁটে মরাই সার হবে, তবু আমাদের সহ্য করতে হবে আজকের রাত্রি জাগরণের সমস্ত কষ্টই! উপায় নেই, উপায় নেই—চুয়াং হচ্ছে একটা বিভীষণ অপদেবতার মতো!"

সরীসৃপ

জাগ্রত হয়ে বসেছিল কেবল জয়ন্ত আর মানিক। প্রায় শেষ রাত্রির স্তব্ধতাকে তখন বিদীর্ণ করছিল সুন্দরবাবুর এবং মনোমোহনবাবুর উচ্চ নাসিকা গর্জন। তাঁদের কার নাসিকা যে বেশি হুঙ্কার দিতে পারে, সে কথা হিসাব করে বলা সহজ নয়!

জয়ন্তের শ্রবণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তার মনে হল, উপরতলা থেকে যেন কি রকম একটা সন্দেহজনক শব্দ শোনা যাচ্ছে! সে কান পেতে আরও ভাল করে শুনতে লাগল...তারপরেই হঠাৎ তার সমস্ত সন্দেহকে বিলুপ্ত করে দিয়ে উপরতলায় জেগে উঠল যেন কোনও একটা গুরুভার জিনিসের পতনশব্দ!

জয়ন্ত একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে ডাকলে, "মানিক, মানিক!"

মানিক বললে, "আমাকে ডাকতে হবে না—আমি প্রস্তুত!... সুন্দরবাবু, সুন্দরবাবু!"

—"হুম! কে ডাকে বাবা?"

—"জেগে উঠুন! সেপাইদের ডেকে নিয়ে শিগগির উপরতলায় চলুন!

—"কেন, হল কি?"

—"আপনার কথার জবাব দেবার আর সময় নেই! আমি আর জয়ন্ত উপরে চললুম! আপনিও এলে ভাল হয়!"

দোতলা ও তেতলায় কারুর সাড়া বা দেখা পাওয়া গেল না। কিন্তু চারতলায় উঠে জয়ন্ত আবিষ্কার করলে, সিঁড়ির বাম পাশের ঘরের দরজা খোলা রয়েছে। অথচ মনোমোহনবাবুর

মুখে সে আগেই শুনেছিল যে, তিনি তাঁর বাড়ির সব ঘরের প্রত্যেক দরজাতেই আজ কুলুপ লাগিয়ে রেখেছেন।

ঘরের ভিতরে ঢুকে আলো জ্বেলে চারিদিকে তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিয়ে জয়ন্ত বললে, "চেয়ে দেখো মানিক, কারা এখানে এসে আসবাবপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করে গিয়েছে। ওই দেখো, একটা ট্রাঙ্ক ওখানে উল্টে পড়ে রয়েছে, খুব সম্ভব নিচে থেকে আমরা ওইটে পড়ে যাওয়ারই শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম। এ ঘরে কেউ নেই, শিগগির পাঁচতলায় চলো!"

ইতিমধ্যে সুন্দরবাবু ও মনোমোহনবাবুর সঙ্গে সঙ্গে সেপাইরাও উপরে এসে হাজির হল। সকলে মিলে পাঁচতলায় গিয়ে দেখলে দু'দিকের দু'টো ঘরেরই দরজা খোলা এবং দু'টো ঘরেরই জিনিসপত্তর নিয়ে যে টানাটানি করা হয়েছে তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল।

জয়ন্ত দ্রুতপদে একবার পাঁচতলার উপরকার ছাদে উঠেও ঘুরে এসে বললে, "ছাদের উপরেও জনপ্রাণী নেই।"

মনোমোহনবাবু বললেন, "কি আশ্চর্য, তবে তিন তিনটে ঘরের কুলুপ খুলে জিনিসপত্তর তচনচ করলে কে?"

সুন্দরবাবু বললেন, "চোর এল আর পালালই বা কেমন করে?"

জয়ন্ত রাস্তার ধারের একটা জানলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "অত উঁচু জানলার লোহার গরাদে কেটে ঘরের ভিতরে চোর ঢুকেছে! এও কি সম্ভব?"

মনোমোহনবাবু বললেন, "বলেন কি মশাই, এ জানলাটা মাটি থেকে বোধহয় ষাট ফুটের কম উঁচু হবে না, আর বাইরে থেকে জানলার কাছে আসবার কোনও উপায়ই নেই! আমার বাড়ির বাইরেটা একেবারে ন্যাড়া—কোথাও বারান্দা পর্যন্ত নেই!"

জয়ন্তও খানিকক্ষণ অবাক হয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে, "মনোমোহনবাবু, বাইরের রাস্তার দিকের দেওয়ালের গায়ে নিচে থেকে উপর পর্যন্ত কোনও জলের পাইপ-টাইপ কিছু আছে কি?"

—"মোটেই নয়, মোটেই নয়! সরীসৃপ ছাড়া আর কোনও জীব আমার বাড়ির দেওয়াল বেয়ে পাঁচতলার উপরে উঠতে পারবে না!"

জয়ন্ত সচকিত কণ্ঠে বললে, "কি বললেন? সরীসৃপ!"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। রাস্তা থেকে এত উঁচুতে দেয়াল বেয়ে উঠতে পারে কেবল সরীসৃপরাই—অর্থাৎ টিকটিকি, গিরগিটি আর সাপটাপের মতন প্রাণী!"

জয়ন্ত অস্ফুট কণ্ঠে যেন নিজের মনে মনেই বললে, "হুঁ, সরীসৃপ, সরীসৃপ!"

মনোমোহনবাবু বললেন, "শুনেছি চুয়াং নাকি একজন নামজাদা যাদুকর। হয়তো এ কথা মিথ্যা নয়। আমার বাড়িতে আজ যদি সে সত্যিই এসে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই এসেছে ভোজবাজির সাহায্যে!"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, একবার এখানে এসে দেখে যান।"

—"কী আর দেখব ভাই, আমি তো হতভম্ব হয়ে গেছি, হুম!" বলতে বলতে তিনি এগিয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

জয়ন্ত জানলার বাইরের দিকে হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, "ঐ কার্নিশটা দেখছেন কি? দেখুন, ওর দু'জায়গায় দু'টো দাগ বালির ভিতরে গভীরভাবে বসে গিয়েছে।"

—"তাইতো জয়ন্ত, তাইতো! মনে হচ্ছে যেন দু'গাছা মোটা দড়ির দাগ! দাগ দু'টো নতুন।"

—"হ্যাঁ। তার মানে হচ্ছে নিচে থেকে দড়ি বেয়ে কেউ বা কারা এই জানলা পর্যন্ত এসে উঠেছে। তারপর জানলার গরাদে কেটে প্রবেশ করেছে ঘরের ভিতরে।"

—"হুম! আগে নিশ্চয়ই এই জানলার গরাদেতে ওই দড়ি বাঁধতে হয়েছে। কিন্তু সেটা বাঁধলে কে? ডানা না থাকলে কেউ তো আর ষাট ফুট উপরে এসে জানলায় দড়ি বেঁধে যেতে পারে না!"

—"হ্যাঁ সুন্দরবাবু, সেইটেই হচ্ছে আসল সমস্যা। জানলায় দড়ি বাঁধলে কে? এক, সন্দেহ করতে পারি, মনোমোহনবাবুর বাড়ির ভিতরে কোনও বিশ্বাসঘাতক লোক আছে। সেই-ই উপর থেকে দড়ি নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এ সন্দেহ সত্য হতে পারে না। কারণ, মনোমোহনবাবু নিজেই এ দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে গিয়েছিলেন, আর আমরাও এসে দেখেছি দরজা বাইরে থেকে বন্ধই রয়েছে। ঘরের ভিতর দিকের একটা জানলার কাটা গরাদেও আমরা দেখেছি—তার মানে, চোর বাইরে থেকে ঘরের ভিতরে ঢুকে বাড়ির অন্দরের দিকে একটা জানলা কেটে তবেই ওদিকে গিয়ে পাঁচতলার আর চারতলার ঘরের কুলুপ খুলতে পেরেছে। বাড়ির ভিতরে কোনও বিশ্বাসঘাতক থাকলে চোর বা চোরদের এতটা কষ্ট স্বীকার করতে হত না। সুতরাং আমাদের ধরে নিতেই হবে যে, বাইরের চোর অদ্ভুত কোনও উপায়ে এই জানলায় দড়ি সংলগ্ন করে ঘরের ভিতর প্রবেশ করেছে। কিন্তু দড়ি সংলগ্ন করলে কেমন করে? একতলা, দোতলা কিংবা না হয় তেতলার ছাদ পর্যন্ত ধরলুম, কোনও রকমে হুক লাগানো দড়ি উপরদিকে ছুড়ে বাড়ির জানলায় বা কোনও পাঁচিলে সংলগ্ন করা যায়। কিন্তু ষাট ফুট উঁচু জানলায় কোনও মানুষ কি হুক লাগানো দড়ি ছুড়ে সংলগ্ন করতে পারে? এটা হচ্ছে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার! আমিও আপনার মতনই হতভম্ব হয়ে গেছি সুন্দরবাবু! তবে কি জানেন, মনোমোহনবাবু নিজেই একটি সুন্দর ইঙ্গিত দিয়েছেন।"

—"হুম! ইঙ্গিত আবার কি?"

—"সরীসৃপ!"

—"জয়ন্ত, তুমি দেখছি এইবারে আবার পাগলামি শুরু করলে। এই জানলার কাছ পর্যন্ত এসে কোনও মানুষ একগাছা দড়ি বেঁধেছে—তার সঙ্গে সরীসৃপের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?"

মানিকও বললে, "জয়, ওই 'সরীসৃপ' কথাটা নিয়ে তুমি এত বেশি মাথা ঘামাচ্ছ কেন বলো দেখি? এর মধ্যে কি রহস্য আছে?"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "কিছু না, কিছু না! আমি বলছিলুম কথার কথা মাত্র। তবে 'সরীসৃপ' শব্দটা আমার যে খুব ভাল লেগেছে এ কথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য।"

মনোমোহনবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, " মোটেই নয়, মোটেই নয়! সরীসৃপ শব্দ কি মশাই, সরীসৃপ জাতটাই হচ্ছে আমার চোখের বালি! তাদের দেখলেই আমার সারা গা কিলবিল করে ওঠে!"

জয়ন্ত বললে, "সরীসৃপ নিয়ে আপনারা আর মাথা ঘামাবার চেষ্টা করবেন না মনোমোহনবাবু! আপাতত আজকের ঘটনাটা তলিয়ে বুঝুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস চুয়াং তার দলবল নিয়ে আজ আপনার বাড়ির ভিতরে এসেছিল কোনওরকম অদ্ভুত উপায়ে। আর সে যে কিসের সন্ধানে এসেছিল, সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন? সে এসেছিল সেই বজ্রভৈরবের মূর্তি আর শিলালিপিখানা চুরি করতে। পাঁচতলা আর চারতলার ঘরের পর ঘরে ঢুকে সদলবলে সে খুঁজছিল সেই শিলালিপি আর বজ্রভৈরবকে। হয়তো সে আজ সমস্ত বাড়িখানাই খানাতল্লাস করত, কিন্তু আমরা এখানে হাজির ছিলুম বলেই আজ তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তবে আমরা তো প্রতিদিন আপনার সঙ্গে থাকতে পারব না! চুয়াং হচ্ছে সাক্ষাৎ শয়তান, সে সব করতে পারে! এখন আপনার কি উচিত জানেন?"

মনোমোহনবাবু সভয়ে বললেন, "বলুন জয়ন্তবাবু! আমি তো আপনারই আশ্রয় নিয়েছি।"

—"যদি প্রাণে বাঁচতে চান, তাহলে কিছুদিন আমার আতিথ্য স্বীকার করুন।"

—"বলেন কি মশাই, আপনার কথার অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!"

—"আমার কথার অর্থ হচ্ছে এই যে, আপনি কিছুদিন আমার বাড়িতে গিয়ে বাস করুন। আপনিও বিবাহ করেননি, আমারও বাড়িতে বাসন-মাজা দাসী ছাড়া আর কোনও নারী নেই। সুতরাং আপনার কোনই অসুবিধা হবে না, বরং আমাদের কাছে আপনি সুরক্ষিতই হয়ে থাকবেন।"

মনোমোহনবাবু কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "আমি বিশ রকম ভাষা জানি বটে, কিন্তু এসব ব্যাপার বোঝবার মতন বিদ্যে আমার পেটে নেই। লেখাপড়া করি, আর পুরনো জিনিসপত্তর ঘাঁটি—এর বাইরে পড়ে আছে সারা পৃথিবীর অনেক কিছুই, কিন্তু তার কোনও খবরই আমি রাখি না। আপনি যা আদেশ করবেন আমি তাই-ই পালন করব! বলেন কি মশাই, ব্যাপার দেখে আমার যে নাড়ি করছে ছাড়ি ছাড়ি!"

পরের দিন রাত্রিবেলায়

মানিক সারাদিন জয়ন্তের সঙ্গে কাটিয়ে রাত্রে নিজের বাড়িতেই ফিরে যেত। কিন্তু জয়ন্ত হঠাৎ তাকে অনুরোধ করলে, দিনকয় তার বাড়িতে এসে তার সঙ্গে রাত্রিবাস করবার জন্যে।

মানিক বললে, "কেন বলো দেখি? এ আবার তোমার কি অদ্ভুত খেয়াল?"

জয়ন্ত একটু বিরক্ত ভাবে বললে, "খেয়াল নয় মানিক, খেয়াল নয়! আমি চাই তুমি কয়েকটি রাত্রি আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকো। মনোমোহনবাবুও আমার সঙ্গেই থাকবেন বটে, কিন্তু তাঁকে আমি সঙ্গে রাখতে চাই বিশেষ কোনও কারণে। আমার তিনতলার ঘরে আমরা তিনজনেই একসঙ্গে প্রতি রাত্রিতেই শয়ন করব। গোয়েন্দাগিরির কাজে মনোমোহনবাবু হচ্ছেন একটি 'হাইফেনে'র মতন—তাঁর থাকা আর না থাকা দুই-ই সমান! অমন ভাবেভোলা প্রাণখোলা লোক আমাদের উপকারের চেয়ে অপকারই করতে পারেন বেশি। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে থাকলে আমি খানিকটা ধাতস্থ হতে পারব।"

মানিক বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "তুমি কি কোনও বিপদের আশঙ্কা করছ?"

জয়ন্ত বললে, "এখন কোনও কথা জিজ্ঞাসা কোরো না মানিক, হয়তো আমার সমস্ত অনুমানই ভুল হতে পারে। পরে আমি তোমাকে সমস্ত কথাই খুলে বলব। আপাতত খালি এইটুকুই শুনে রাখো যে, কয়েক রাত্রি আমরা—অর্থাৎ আমার সঙ্গে তুমি আর মনোমোহনবাবু—এক ঘরেই রাত্রিযাপন করব। তারপর কি হবে আর না হবে তা নিয়ে আমি এখনই ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি না।"

মানিক বললে, "তোমার কোন কথাতেই বা আমি নারাজ হয়েছি ভাই! বেশ, তুমি যা বলছ তাইই আমি করব।"

সেদিন রাত্রে জয়ন্তের তেতলার ঘরে প্রস্তুত হল তিনটি বিছানা।

খাওয়া-দাওয়ার পর জয়ন্ত ও মানিকের সঙ্গে মনোমোহনবাবুও সেই ঘরে ঢুকে বললেন, "জয়ন্তবাবু, একটা কথা বলে রাখছি কিন্তু! লোকের মুখে শুনেছি, আমার নাকি ভয়ঙ্কর নাক ডাকে! আমি এও শুনেছি, আমার নাক ডাকা শুনলে আশপাশের লোকেরা নাকি ঘুমোতে পারে না! তাই আপনাদের সঙ্গে শুতে আমার বড়ই সঙ্কোচ হচ্ছে!"

মানিক দুষ্টুমির হাসি হেসে উঠে মনোমোহনবাবুর কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে বললে, "মোটেই নয়, মোটেই নয়! তুচ্ছ নাক ডাকা কি বলছেন মশাই? বাঘ ডাকলেও আমরা থোড়াই কেয়ার করি! আপনার নাক যত খুশি ডাকুক, তাতে আমাদের কি?"

মনোমোহনবাবু তন্দ্রাতুর চক্ষে তাঁর বিছানার উপর দেহভার স্থাপন করে বললেন, "বেশ, তাহলে আর কিছু ভয় বা লজ্জার কারণ আমার নেই, এই আমি 'দুর্গা' বলে শুয়ে পড়লুম।"

মানিককে কাছে ডেকে জয়ন্ত তার কানে কানে বললে, "ভাই, বালিশের তলায় একটা রিভলবার আর একটা টর্চ নিয়ে তুমি শুয়ো। আমিও তাই রেখেছি। আজ, কি কাল, কি পরশু—যে কোনও রাত্রে এই ঘরে যে কোনও অঘটন ঘটতে পারে।"

মানিকও চুপি চুপি বললে, "জয়, তোমার সঙ্গে যখন থাকি তখন আমিও নিতান্ত নির্বোধ নই। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি!"

জয়ন্ত বললে, "চুপ! তুমি যে বুঝতে পারবে তা আমি জানি। এই ঘরে রাস্তার দিকে দু'টো জানলা আছে। আজ হোক, কাল হোক, পরশু হোক, ওই দু'টো জানলার যে কোনওটার ভিতর দিয়েই ভীষণ কোনও বিপদ আমাদের বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। তোমাকে বলে রাখলুম কেবল এইটুকুই। শুয়ে পড়ো।"

সত্য! মনোমোহনবাবু ভুল বলেননি। তাঁর নাসিকার গর্জনের মধ্যে বিশেষত্ব আছে বটে! সেই নাসিকাধ্বনি সঙ্গীতশাস্ত্রের সপ্তস্বরকেই অধিকার করে পৃথিবীর সবাইকে যেন জোর ধমক দিতে চায়! একে সে রাত্রে ছিল অত্যন্ত গুমোট, ঘরের ভিতরে এতটুকু বাতাসেরও অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যাচ্ছিল না; তার উপরে মনোমোহনবাবুর নাসিকার সেই ভয়াবহ উৎপাত!

মানিক সেদিন ঘুমোবার আশা একেবারেই ছেড়ে দিলে। বিছানায় শুয়ে সে খালি এপাশ আর ওপাশ করতে লাগল। জয়ন্তের শয্যার দিক থেকে কোনও শব্দই পাওয়া গেল না।

নিস্তব্ধ রাত্রি—কেটে যাচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। খানিক দূর থেকে এ পাড়ার রাজার এক বড় ঘড়ি ঢং ঢং ঢং বেজে জানিয়ে দিলে রাত এখন তিনটে।

হঠাৎ মানিক শুনলে, ঘরের একটা জানলার কাছে কি রকম যেন সন্দেহজনক শব্দ হচ্ছে। সে রাত্রির আকাশ ছিল নিশ্চন্দ্র। কিন্তু তবু জানলার দিকে তাকিয়ে মানিকের মনে হল, সেখানে যেন কোনও একটা জীবন্ত ছায়ার আবির্ভাব ঘটেছে!

হঠাৎ জয়ন্ত নিজের বিছানার উপর থেকে চেঁচিয়ে বলে উঠল "মানিক, মানিক! রিভলবার নাও, জানলার ওপরে টর্চের আলো ফ্যালো! যাকে দেখবে, তাকেই গুলি করবে!"—সঙ্গে সঙ্গেই জয়ন্তের টর্চের শিখা গিয়ে পড়ল জানলার উপরে।

মানিকও জ্বাললে টর্চ!

জানলার উপরে দেখা গেল একটা বৃহৎ ময়াল সাপকে—সে একটা জানলার গরাদের চারিদিক বেষ্টন করে ছিল!

একসঙ্গে জয়ন্ত ও মানিকের রিভলবার দু'টো তিন-চারবার গর্জনের পর গর্জন করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরী দুঃস্বপ্নের মতন সেই ময়াল সাপটা তার সর্বাঙ্গ আন্দোলিত করে তীব্র আলোকরেখার ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপরেই শোনা গেল নিচে রাস্তার উপরে তার গুরুভার দেহ পতনের শব্দ!

হঠাৎ জয়ন্ত নিজের বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে ঘরের সেই জানলার দিকে ছুটে গেল এবং তার রিভলবারের বাকি তিনটে গুলি রাস্তার দিকে প্রেরণ করে বললে, "মানিক, মানিক! ছোড়ো তোমারও রিভলবার! অন্ধকার রাস্তায় কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু চেষ্টা করে দেখো যদি হতভাগাদের একজনকেও গুলি করে জখম করা যায়, তাহলে আমাদের কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে!"

মানিকও জানলার ধারে গিয়ে রাস্তার দিকে প্রেরণ করলে তার রিভলবারের বাকি গুলিগুলো।

রাস্তার উপর থেকে জেগে উঠল একটা বিশ্রী আর্তনাদ!

জয়ন্ত সানন্দে বলে উঠল "লেগেছে লেগেছে, একজনের গায়ে গুলি লেগেছে! এসো, আমরা আবার রিভলবারে গুলি ভরে নিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই! যদি একটা শয়তানকেও ধরতে পারি, বাকি সবাইকেই হাতকড়ি পরাতে বেশি দেরি লাগবে না!"

তখন মনোমোহনবাবু তাঁর নাসিকাগর্জন থামিয়ে বিছানার উপরে বসে আছেন স্তম্ভিতের মতন! জয়ন্ত এবং মানিক যখন ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, মনোমোহনবাবু তখন অভাবিত তৎপরতার সঙ্গে শয্যা ত্যাগ করে নিচে নেমে পড়ে বললেন, "বলেন কি মশাই! চারিদিকে শুনছি বন্দুকের গোলমাল, আর আপনারা কিনা আমাকে এইখানে একলা ফেলে লম্বা দিতে চান? মোটেই নয়, মোটেই নয়! আমিও যাব আপনাদেরই সঙ্গে।"

'সরীসৃপ' শব্দের রহস্য

জয়ন্ত ও মানিক রাস্তায় বেরিয়েই শুনলে, একখানা মোটরের গর্জন হঠাৎ জেগে উঠে বেগে দূরে চলে গেল।

জয়ন্ত বললে, "হয়তো চুয়াংই তার দলবল নিয়ে সরে পড়ল, আজ আর ওর পাত্তা পাওয়া অসম্ভব! এইবার টর্চ জ্বেলে দেখা যেতে পারে, রাস্তার এখানে এত ঝটাপটির শব্দ হচ্ছে কেন?"

জয়ন্ত ও মানিক দু'জনই টর্চ জ্বালালে একসঙ্গে। ত্রস্ত চক্ষে দেখলে, ঠিক তাদের বাড়ির নিচেই চারিদিকে রাস্তার ধুলো উড়িয়ে একটা আট দশ হাত লম্বা ময়াল জাতীয় সর্প চক্রাকারে পাক খেতে খেতে এবং মাটির উপড়ে ল্যাজ আছড়াতে আছড়াতে ভীষণভাবে ছটফট ছটফট করছে!

জয়ন্ত বললে, "সাপটার মাথা গুঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু ওর দেহটা এখনও ছটফট করবে অনেক ঘণ্টা ধরে।"

মনোমোহনবাবু বিপুল বিস্ময়ে বললেন, "বলেন কি মশাই!"

মানিক বললে, "যে লোকটা জখম হয়েছিল সেও পালিয়েছে দেখছি। কিন্তু জয়ন্ত, আমার সন্দেহ হচ্ছে চুয়াংই সাপটাকে এখানে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।"

—"তোমার সন্দেহ মিথ্যে নয়।"

—"কেন, তা বুঝতে পেরেছ?"

মানিক মাথা নেড়ে জানালে, "না।"

মনোমোহনবাবু বললেন, "কেন আর সাপটাকে লেলিয়ে দিয়ে চুয়াং চেয়েছিল আমাদের ঘাড় মটকাতে।"

—"উঁহু!"

—"উঁহু কেন মশাই? ও সাপটা তবে আমরা যেখানে আছি সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল কেন?"

—"মানিক, তুমি কি এখনও সাপটার ল্যাজের দিকে লক্ষ্য করনি?"

মানিক সামনের দিকে ঝুঁকে সাপের লাঙ্গুলের দিকে ভাল করে তাকিয়ে বললে, "তাইতো জয়ন্ত, তাইতো! সাপের ল্যাজের দিকে খানিকটা দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে দেখছি যে!"

—"হ্যাঁ। এখন খানিকটা রয়েছে বটে, কিন্তু একটু আগে দড়িগাছা ছিল অনেকটা লম্বা। চুয়াং পালাবার সময়ে বাকি দড়ি কেটে নিয়ে গিয়েছে—পাছে সাপের ল্যাজের মারাত্মক আঘাত খেতে হয় সেই ভয়ে সব দড়ি কাটতে পারেনি। কিন্তু যেটুকু সে রেখে গিয়েছে আমাদের পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট।"

মনোমোহনবাবু বললেন, "পাছে সাপটা পালিয়ে যায় সেই ভয়েই বুঝি ওর ল্যাজে দড়ি বেঁধে রেখেছিল?"

—"তাও নয়।"

—"তবে?"

—"শুনুন তবে বলি। আমি যখন শ্যামদেশে ছিলুম তখনই শুনেছিলুম যে, চুয়াং নাকি জানোয়ারদের পোষ মানাতে ওস্তাদ—এক সময়ে তার নিজেরও একটি বৃহৎ সার্কাসের দল ছিল, আর এখনও চুয়াংয়ের আড্ডায় থাকে তার নিজের হাতে শিক্ষিত নানারকম জানোয়ার। মনোমোহনবাবু, সেদিন আপনাদের মতো আমিও কিছুতেই আন্দাজ করে উঠতে পারিনি যে,

আপনার ষাট ফুট উঁচু জানলায় চোরে কেমন করে দড়ি বাঁধলে? তারপর আপনি যখন কথাপ্রসঙ্গে হঠাৎ 'সরীসৃপ' শব্দটা উচ্চারণ করলেন, অমনি ধাঁ করে আমার মাথায় একটা সন্দেহ জেগে উঠল! সাপরা সরীসৃপ জাতির অন্তর্গত। সার্কাসে আমি কয়েকবার পোষমানা শিক্ষিত সাপের আশ্চর্য খেলা দেখেছি। কেন জানিনা, হঠাৎ আমার মন বললে, 'আচ্ছা, সাপরা তো খাড়া দেয়ালের গা বেয়ে অনায়াসেই উপরে উঠতে পারে, চুয়াংও কোনও শিক্ষিত সাপের সাহায্য নেয়নি তো?' এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজবার জন্যেই আমি মনোমোহনবাবুকে এখানে এসে কিছুদিন বাস করতে বলেছি। কারণ আমি নিশ্চিতরূপেই জানতুম যে, চুয়াং তাহলে মনে করবে, মনোমোহনবাবু তার ভয়ে বজ্রভৈরব আর শিলালিপি নিয়ে আমারই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। একসঙ্গে নিজের কার্যোদ্ধার আর আমার মতন মহাশত্রুকে নিপাত করবার এমন সুযোগ সে যে কিছুতেই ত্যাগ করবে না, এটা অনুমান করাও খুব কঠিন নয়। তাই আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলুম তার দ্বারা আক্রান্ত হবার জন্যে!"

মনোমোহনবাবু বললেন, "কি মুশকিল, আমি যে এখনও আসল কথাটাই ধরতে পারছিনা! চুয়াং আমার পাঁচতলার জানলায় দড়ি বেঁধেছিল কেমন করে?"

—"অত্যন্ত সহজ উপায়ে। নিজের হাতে শিক্ষিত সাপের ল্যাজের দিকে সে দড়ি বেঁধে দিত। খুব সম্ভব লাগামের টান অনুসারে ঘোড়া যেমন কোচম্যানের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে, ল্যাজের দড়িতে চুয়াংয়ের হাতের টান বুঝে এই শিক্ষিত সাপটাও জানতে পারত, এইবারে কোথায় গিয়ে তাকে কোন কর্তব্যপালন করতে হবে! দড়িবাঁধা সাপটা নির্দিষ্ট জানলার কাছে গিয়ে এক জায়গায় গরাদের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে, অন্য একটা ফাঁক দিয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে দেয়াল বেয়ে নিচে নেমে চুয়াংয়ের কাছে ফিরে আসত! জানলায় সংলগ্ন হয়ে দড়ির দুই মুখ থাকত চোরেদের হাতে। তখন সাপকে বন্ধনমুক্ত করে দড়ি ধরে উপরে উঠতে কারুর কোনই কষ্ট হত না।"

সমস্ত শুনে বিস্ময়ে গালে হাত দিয়ে মনোমোহনবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন হতভম্বের মতো!

মানিক চমৎকৃত কণ্ঠে বলেল, "জয়ন্ত , তোমার এই চুয়াং কেবল বিপজ্জনক অপরাধী নয়, সে হচ্ছে অত্যন্ত কৌশলী ব্যক্তি!"

জয়ন্ত সায় দিয়ে বললে, "হ্যাঁ, এ কথা আমিও মানি। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর আর কোনও অপরাধীকে এমন অদ্ভুত উপায়ে পরের বাড়িতে হানা দিতে শুনেছি বলে মনে হচ্ছে না। ...মানিক, যে লোকটা আমাদের গুলিতে জখম হয়েছিল তার খানিকটা রক্ত পথের উপরে পড়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। ওই রক্তের পাশেই সাদা মতন কি একটা রয়েছে না?"

মানিক কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে হেঁট হয়ে সেটা তুলে নিয়ে বললে, "এ তো দেখছি একখানা কাগজ।"

—"দেখি।"

মানিক কাগজখানা জয়ন্তের হাতে দিলে। টর্চের আলোকে কাগজখানা দেখে সে বললে, "হুঁ, চীনে পাড়ার একটা চীনে হোটেলের খাবারের বিল। এতে যে খাবারগুলোর নাম লেখা রয়েছে সবই হচ্ছে চীনে খাবার। তাহলে এই অনুমান করাই সঙ্গত, খাবারগুলো যে খেয়েছে জাতে সেও চীনেম্যান। এখন বুঝে নাও, আমাদের এই বাঙালিপাড়ার রাস্তায় চীনেম্যানের চীনে হোটেলের বিল পড়ে থাকা খুব স্বাভাবিক কিনা!"

মানিক বললে, "খুব সম্ভব যে লোকটা আহত হয়েছে এ বিলখানা ছিল তারই পকেটে।"

—"তোমার এ অনুমান অসঙ্গত নয়।"

—" তারপর, এটাও আন্দাজ করা যেতে পারে, আজ এখানে যাদের আবির্ভাব হয়েছিল, এই চীনে হোটেল তারা হয়তো প্রায়ই যাতায়াত করে।"

—"সাধু! আমিও তোমার কথার তলায় ট্যাঁড়া সই দিচ্ছি। এই 'বিল' দেখেই বুঝতে পারছি হোটেলের পাওনা হয়েছিল বত্রিশ টাকা দু'আনা দু'পাই। একজন মাত্র লোকের পক্ষে এত টাকার খাবার উদরস্থ করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং বিলের তারিখ দেখে আমরা ধরে নিতে পারি, কোনও বিশেষ হোটেলে আজ একদল চীনেম্যান গিয়ে এই খাদ্যগুলো গলাধঃকরণ করেছে। মানিক, মানিক! আমাদের এর পরের কার্যক্ষেত্র হবে কোথায়, সেটা তুমি বুঝতে পেরেছ তো?"

—"পেরেছি বইকি জয়ন্ত!"

মনোমোহনবাবু হতাশভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "মোটেই নয়, মোটেই নয়! আমি কিচ্ছু বুঝতে পারিনি।"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "এ সব প্রত্নতত্ত্বের কথা নয় মনোমোহনবাবু, আপনি কিছু বোঝবার চেষ্টাও করবেন না।"

কলকাতায় চীনদেশের এক টুকরো

প্রথম রাত্রি।

কলকাতার চীনেপাড়ার একটি গলি।

গলি বটে, কিন্তু তার ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে জনতার স্রোত। জনতার মধ্যে চীনেম্যানের সংখ্যাই বেশি, কিন্তু সেই সঙ্গে সেখানে এমন সব চেহারাও চলাফেরা করছে, যারা জাতে চীনাও নয় এবং যাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে নিরীহ পথিকদের মনও বিশেষ আশ্বস্ত হয় না। গলির দুই দিকেই যেখা যাচ্ছে অনেক চীনে হোটেল বা খাবারের দোকান। কোনও কোনও দোকানে টেবিলের উপরে চীনা মিষ্টান্ন সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক বা একাধিক চৈনিক তরুণী, এক হাতে বুকের উপরে ছেলে বা মেয়েকে চেপে ধরে স্তন্যদান করতে করতে আর এক হাতে করছে তারা খরিদ্দারের খাবার সরবরাহ।

এই চীনেপাড়ায় একেবারে বিলাতি কায়দায় সাজানো উচ্চশ্রেণীর অতি আধুনিক হোটেল আছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন হোটেলও আছে, যার সাজসজ্জা আধুনিক হলেও যেখানে গিয়ে চীনে খাবার ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। সেখানে গিয়ে চা চাইলে একটি চীনে মেয়ে তোমার সামনে একটি হাতলহীন বাটি রেখে যাবে। সেই বাটিতে আছে গরম জল আর সেই গরম জলের ভিতরে মেয়েটি ফেলে দেয় শিকড়ের মতন একটি জিনিস। তারপর সেই বাটির উপরে আর একটি হাতলহীন বাটি উপুড় করে দিয়ে মেয়েটি তোমার কামরা থেকে অদৃশ্য হবে।

মিনিটকয় পরে তোমার কর্তব্য হচ্ছে, সেই উপুড় করা বাটিটি নামিয়ে নিচেকার বাটি থেকে চায়ের আস্বাদ গ্রহণ করা। তুমি যদি এই শ্রেণীর হোটেলে নবাগত হও, আর চীনে চায়ের অভিজ্ঞতা তোমার যদি না থাকে, তাহলে উপুড় করা বাটির উপরে হাত দিয়েই তোমাকে আঁৎকে উঠতে হবে। কারণ তার হাতল নেই আর সে বাটিটা হচ্ছে আগুনের মতন গরম। তুমি যখন নাচার হয়ে ভাবছ অতঃপর কি করা উচিত, তখন বাইরে থেকে পর্দার ফাঁক দিয়ে তোমার দুরবস্থা দেখে হয়তো সেই চৈনিক তরুণীর মনে হবে করুণার সঞ্চার এবং হয়তো সে তোমার কামরায় পুনঃপ্রবেশ করে উপুড় করা চায়ের বাটিটা আবার নিজের হাতেই নামিয়ে দিয়ে যাবে। তুমি তখন দেখবে চায়ের গরম জলের ভিতরে শুকনো শিকড়ের বদলে রয়েছে একখানি বাটিজোড়া ছড়িয়ে পড়া সবুজ পাতা। তারপরে পান কর বাটির সেই গরম ও তরল পদার্থ এবং পান করলেই জানতে পারবে এখানে চা বলতে কি বোঝায় তুমি তার কিছুই জানো না। কারণ তোমার মনে হবে তুমি যা পান করছ তা হচ্ছে উত্তপ্ত নালতের জল।

এ সব হোটেলের আর একটি বিশেষত্বের কথা বলা হয়নি। বেশ সাজানো গুছানো হলেও এসব জায়গায় গিয়ে হয়তো পাওয়া যাবে না বিলাতি চেয়ারের মতন কোনও আসন। প্রায় পাখির দাঁড়ের মতন সংকীর্ণ ছোট ছোট বেঞ্চি, তোমাকে গিয়ে বসতে হবে সেই রকম কোনও আসনের উপরেই।

মাঝে মাঝে এই রকম সব হোটেলে কৌতূহলী হয়ে যারা খেতে যায়, জাতে তারা চীনা নয়। আমরা যেদিনের কথা বলছি সেদিন রাত্রেও এই রকম একটি হোটেলের এক কামরায় বসেছিল দু'জন সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠদেহ পাঞ্জাবি খরিদ্দার। মাথায় তাদের যেন নিশান ওড়ানো পাঞ্জাবি পাগড়ি, দুই গাল দিয়ে নিচের দিকে নেমে এসেছে সুদীর্ঘ জুলপি এবং ঠোঁটের উপরে রয়েছে সূক্ষ্ম ছাঁটা গোঁফ।

তাদের কামরার সামনেই একটি সাধারণ হলঘর। এবং তারই ও ধারে রয়েছে আর একটি মাঝারি আকারের কামরা, তার দরজার পর্দা ছিল সরানো।

তারা চীনা হোটেলে বিশেষ ভাবে তৈরি কাঁকড়ার উপরে মাঝে মাঝে চামচ চালনা করছিল এবং মাঝে মাঝে অবাক হয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টিপাত করছিল ওধারের ওই কামরার দিকে।

ও কামরার সবটা দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু ওখানে যে লোক আছে দশ-বারজন, উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনে সেটা বোঝা যাচ্ছিল বেশ ভাল করেই।

দরজার দিকে মুখ করে সামনেই যে মানুষটি বসে আছে, না দেখলে তার মূর্তি কল্পনাই করা যায় না। তার উপবিষ্ট মূর্তি দেখেই আন্দাজ করা যায়, উঠে দাঁড়ালে হয়তো সে মাথায় আট ফুটের চেয়ে কম উঁচু হবে না। আর সেই অনুপাতে চওড়াতেও তার মূর্তি হচ্ছে একেবারেই অসাধারণ। তার চোখের ভাব বোঝা যাচ্ছিল না, কারণ সে পরেছিল কালো কাচের চশমা। মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন মানুষের ভিতরের প্রকৃতি আন্দাজ করবার দু'টি উপায় আছে, চোখ আর ঠোঁট। ও লোকটির চক্ষে কালো চশমা থাকলেও সে লুকিয়ে রাখতে পারেনি তার ওষ্ঠাধরকে। সে যখন কথা কইছে না তখন তার ওষ্ঠাধরের উপর থেকে ফুটে উঠছে যে ক্রূরতা, যে

নিষ্ঠুরতা আর যে কুৎসিত হিংসার ভাব, ভাষায় তা বোঝানো যায় না! আবার সে যখন কথা কইছে তখন তার ওষ্ঠাধরের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে বিবর্ণ অথচ চকচকে দন্তের সারি তা দেখলেই মনে পড়ে সিংহ বা ব্যাঘ্রের মতন কোনও রক্তলোভী হিংস্র জন্তুকে। লোকটা পরে ছিল ইউরোপিয় পোশাক, কিন্তু সে পোশাকে তাকে মোটেই মানাচ্ছিল না।

পাঞ্জাবি দুই খরিদ্দারের মধ্যে যার মূর্তি বৃহত্তর, সে আগে উচ্চকণ্ঠে ভাজা চিংড়িমাছ আনবার হুকুম দিয়েই অত্যন্ত নিম্নস্বরে বাংলা ভাষায় বললে, "মানিক, ও পাশে সামনের ঘরের ঐ মূর্তিটিকে দেখলে তোমার কী মনে হয়?"

—"নরদেহধারী রাক্ষস!"

—"ও কে জানো?"

—"কি করে জানব? ওকে আমি আগেও কখনও দেখিনি আর পরেও দেখতে ইচ্ছা করি না! ও হচ্ছে একটা মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন!"

—"ঠিক বলেছ। ওরই নাম হচ্ছে চুয়াং!"

মানিক চমকে উঠল। তারপর সাগ্রহে নিজেদের কামরার পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগল সেই আশ্চর্য মূর্তিটাকে। তারপর ফিরে বললে, "আরব্য উপন্যাসে আর রূপকথায় যে সব দৈত্য আর রাক্ষসের বর্ণনা পড়েছি, চুয়াংকে দেখলে যে তাদের কথাই স্মরণ হয়! জয়ন্ত, অসাধারণ বলবান বলে তোমার একটা খ্যাতি আছে, কিন্তু চুয়াং-এর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করলে তোমাকেও হয়তো হার মানতে হবে!"

জয়ন্ত আর একবার পর্দার ফাঁক দিয়ে চুয়াং-এর দেহ যতটা দেখা যায় দেখে নিলে। তারপর ঠোঁট টিপে একটুখানি হেসে বললে, "মানিক, ক্ষুদ্র মানুষের কাছে হাতিরা হার মানে কেন?"

—"আগ্নেয়াস্ত্রের গুণে!"

—"না মানিক, তা নয়। যখন আগ্নেয়াস্ত্রের সৃষ্টি হয়নি, পৃথিবী যখন সভ্য হয়নি, সেই স্মরণাতীত আদিম যুগেও ক্ষুদ্র মানুষের কাছে এখনকার চেয়ে ঢের বেশি বৃহৎ সেকালকার সেই রোমশ 'ম্যামথ' হাতিদের বারবার পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। শক্তি পরীক্ষার সময়ে কেবল প্রকাণ্ড দেহ থাকলেই চলে না, যে যোদ্ধা অধিকতর রণকৌশলী, অধিকতর সাহসী আর অধিকতর বুদ্ধিমান, জয় হয় তারই। কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলেও আমি বিশ্বাস করি, চুয়াং আকারে আমার চেয়ে বড় হলেও দেহের শক্তিতে সে বোধহয় আমাকে হারাতে পারবে না।"

ঠিক এই সময়েই একটি নূতন চীনে 'বয়' ভাজা চিংড়ির ডিশ নিয়ে তাদের কামরার ভিতরে প্রবেশ করলে। একখানা ডিশ রাখলে সে মানিকের সামনে এবং দ্বিতীয় ডিশখানা রাখতে গিয়ে জয়ন্তের দিকে তাকিয়েই সে চমকে ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার এই সচকিত ভাবটা স্থায়ী হল এক পলকের জন্যে। তার পরেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে অত্যন্ত সহজভাবেই ডিশখানা জয়ন্তের সমুখে স্থাপন করে বেরিয়ে গেল কামরার ভিতর থেকে।

জয়ন্ত সামনের দিকে হেঁট হয়ে পড়ে চুপিচুপি বললে, "মানিক, তুমি ওই লোকটার ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করেছ কি?"

—"করেছি।"

—"লোকটা আমার মুখের পানে চেয়ে চমকে উঠল কেন?"

—"হয়তো ও চুয়াং-এর দলের লোক। হয়তো ও তোমাকে চেনে আর ছদ্মবেশের ভিতর থেকেও তোমাকে চিনতে পেরে চমকে উঠেছে।"

—"ভাল কথা নয় মানিক, ভাল কথা নয়! দেখতে হল।" জয়ন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কামরার পর্দার কাছে গিয়ে ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে।

একটু পরেই জয়ন্ত দেখলে, সেই লোকটা একখানা খাবারের ডিশ হাতে করে ও ধারে চুয়াংদের কামরার মধ্যে গিয়ে ঢুকল। তারপর খাবারের ডিশখানা চুয়াং-এর সামনে রেখে তার কানে কানে কি যেন বলতে লাগল।

চুয়াং-এর কোনই ভাবান্তর হল না। এমন কি সে একবারও জয়ন্তদের কামরার দিকে ফিরে তাকালে না। কেবল মৃদুস্বরে সেই 'বয়'টাকে কি দু'একটা কথা বললে, কামরার বাইরে থেকে কেউ তা শুনতে পেলে না। চীনে 'বয়'টা চুয়াং-এর সামনে থেকে বেশ সহজভাবেই একখানা খালি এঁটো ডিশ তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে সেই কামরার অন্য দিকে চলে গেল।

জয়ন্ত আবার নিজের চেয়ারে বসে পড়ে বললে, "কিছুই বুঝলুম না। যাক গে! খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, এসো আগে তার সদ্ব্যবহার করা যাক!"

দু'জনে নীরবে ছুরি ও কাঁটা তুলে নিয়ে সামনের ডিশ দু'খানাকে আক্রমণ করলে।

মিনিটখানেক পরেই আচম্বিতে এক অন্ধকারের ধাক্কায় তারা দু'জনেই উঠল চমকে! হোটেলের সমস্ত ঘরের উপর নেমে এল এক অন্ধকারের বন্যা—নিশ্চয়ই বৈদ্যুতিক আলোকের কল বিগড়ে গিয়েছে!

হোটেলের কামরায় কামরায় বসে আহার করছিল তখন বহু খরিদ্দার—তারা সকলেই একসঙ্গে উচ্চ চিৎকার করে উঠল। সর্বত্রই দ্রুত পদের ও চেয়ার প্রভৃতি উল্টে পড়ার শব্দ এবং বিষম গোলমাল!

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে ব্যস্তকণ্ঠে বললে, "মানিক এখানে আর একদণ্ডও নয়, শিগগির বাইরে বেরিয়ে চলো!"

জয়ন্ত এবং মানিক দ্রুতপদে কামরার বাইরে গিয়ে পড়ল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্দি হল অনেকগুলো বজ্রবাহুর বেষ্টনে! তারা আত্মরক্ষা করবার এতটুকু সুযোগ পেলে না। কারা তাদের ধরে সজোরে ও নিষ্ঠুর ভাবে টানতে টানতে সেই অন্ধকারেই কোন দিকে নিয়ে চলল!

খানিকক্ষণ পরেই আবার আলো জ্বলে উঠল, এবং জয়ন্ত ও মানিক দেখলে তারা হোটেলের ভিতরকার এমন একটা ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে বাইরের খরিদ্দারদের আনাগোনা নেই। ইতিমধ্যে অন্ধকারেই শত্রুরা তাদের হাতগুলো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলেছিল।

তাদের কাছ থেকে হাত পাঁচ ছয় তফাতে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং চুয়াং—মূর্তিমান পাহাড়ের মতন! এবং তারই আশেপাশে মূর্তির মতো স্থির হয়ে আছে আরও দশ-বারজন অতি কুৎসিত ও দেখতে ভয়াবহ চীনেম্যান! তাদের মধ্যে জন চারেকের হাতে চকচক করছে এক একটা রিভলবার!

চুয়াং-এর দু'টো মঙ্গোলীয় কুতকুতে চক্ষু জ্বলছিল যেন অঙ্গার খণ্ডের মতো। কিন্তু তার মুখ সম্পূর্ণ ভাবহীন। ধীরে ধীরে সে ইংরেজিতে বললে, "বাবু, আমি তোমাকে চিনি।"

জয়ন্ত কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে প্রশান্ত কণ্ঠেই বললে, "চুয়াং, তুমিও আমার অপরিচিত নও।"

—"জানি বাঙালিবাবু, জানি। কি করে সন্ধান পেয়ে আমাকে আবিষ্কার করবার জন্যে তুমি গিয়েছিলে শ্যামদেশে। কিন্তু আমি যখন আড়ালে থাকতে চাই, তখন সারা পৃথিবীর কোনও গোয়েন্দাই কি আমাকে আবিষ্কার করতে পারে?"

জয়ন্ত হা হা করে হেসে উঠে বললে, "পারে না? এই তো আজই আমরা তোমাকে আবিষ্কার করে ফেলেছি!"

—"কিন্তু এ আবিষ্কারে ফল হল কি? আমাকে যে আবিষ্কার করবে তার ভাগ্যে মৃত্যু অনিবার্য! অবশ্য, স্বীকার করছি যে, আজ তোমাদের দেখেও আমি চিনতে পারিনি, আর তোমাদের এখানে দেখবার জন্যে আমি প্রস্তুতও ছিলুম না! কিন্তু এই হোটেলেই আমার এমন কোনও পুরাতন চর আছে, যার দৃষ্টি হচ্ছে ঈগল পাখির মতন তীক্ষ্ণ! তুমি এবারে প্রথম যেদিন কলকাতায় এসেছিলে, আমার ওই চরই হুকুম পেয়ে সেদিন তোমার পিছনে পিছনে গিয়েছিল তোমাকে বধ করবার জন্যে। সেদিন তুমি তার চোখে ধুলো দিতে পেরেছিলে বটে, কিন্তু সে ভোলেনি তোমার মুখ। ছদ্মবেশের ভিতর থেকেও আজ সে তোমার মুখ আবিষ্কার করে ফেলেছে। তোমার সঙ্গের এই বাঙালিবাবুটি আবার কে?"

—"আমার বন্ধু।"

—"তোমার বন্ধু? তার মানে আমার শত্রু?"

—"আমার বন্ধু তো তোমার শত্রু হওয়াই উচিত। কিন্তু যাক গে ও সব বাজে কথা। এখন বলো দেখি, তুমি আমাদের নিয়ে কী করতে চাও?"

চুয়াং-এর সুদীর্ঘ মূর্তি যেন আরও উঁচু হয়ে উঠল। সে গম্ভীরস্বরে বললে, "কি করতে চাই? কি করতে চাই? তোমাকে যে বধ করতে চাই এটা বলাই হচ্ছে বাহুল্য!"

—"বেশ তো, তোমার সেই ইচ্ছাই পূর্ণ করতে পারো। আমরা প্রস্তুত। মরতে আমরা ভয় পাই না।"

—"হতে পারে। হয়তো সত্যিই তোমরা মরতে ভয় পাও না। কিন্তু তোমাদের আমি মুক্তি দিতে রাজি আছি একটিমাত্র শর্তে।"

—"শর্ত? শয়তানের সঙ্গে মানুষের শর্ত! শয়তান যা পালন করবে না সেই শর্ত?"

চুয়াং তার সেই সম্পূর্ণ ভাবহীন মুখেই ধীরে ধীরে বললে, "বাঙালিবাবু, তুমি আমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসেও আমাকে শয়তান বলে গালাগালি দিচ্ছ, কিন্তু তবু আজ আমি তোমার উপরে রাগ করব না। যখন কাজের কথা ওঠে তখন রাগ করা উচিত নয়। আমার শর্তটা কি শুনবে?"

—"শোনবার জন্যে আমার কোনই আগ্রহ নেই। তবে বলতে যখন চাচ্ছ, বলো।"

চুয়াং সামনের দিকে আরও দুই পদ এগিয়ে এল। তারপর বললে, "আমি চাই বজ্রভৈরবের মূর্তি আর শিলালিপি! এই দু'টি জিনিস যদি তুমি আমার হাতে সমর্পণ করতে পার, তাহলে আমি তোমাদের বধ করব না, মুক্তি দেব!"

—সত্যি নাকি? ধন্যবাদ! কিন্তু কেমন করে তোমার এই অনুগ্রহ আমরা গ্রহণ করব বলো দেখি?"

—"তোমার এ কথার অর্থ?"

—"তুমি যে দু'টো জিনিসের নাম করলে তা যে আমার সম্পত্তি নয়, এটা তো তুমি ভাল করেই জানো?"

—জানি বাঙালিবাবু, জানি। ও দু'টি জিনিসের সব ইতিহাসই আমি জানি। এও জানি যে, মনোমোহনবাবু আমার কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে বজ্রভৈরবের মূর্তি আর শিলালিপি তোমার জিম্মাতেই রেখে দিয়েছেন। তোমাকে আর কিছু করতে হবে না, আমাকে বলে দাও তুমি ওই দু'টি জিনিসকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ। আমার লোকেরা এখনই গিয়ে অনায়াসেই তা উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারে। আর ভগবান কনফিউসিয়াসের নামে শপথ করে বলছি, ওই দু'টি জিনিস যে মুহূর্তেই আমি হাতে পাব, তোমাদের মুক্তি দেব সেই মুহূর্তেই!

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "বাধিত হলুম। চুয়াং, কিন্তু তুমি দু'টো বড় কথা ভুলে যাচ্ছ। প্রথমত, তুমি যে দু'টি জিনিসের নাম করলে তা আমার কাছে নেই। দ্বিতীয়ত, ও দু'টি জিনিস আমার হাতে থাকলেও আমি তোমার হাতে সমর্পণ করতে পারতুম না, কারণ ও দু'টি জিনিসের মালিক হচ্ছেন অন্য লোক।"

—"বাজে কথায় আমাকে ভুলোবার চেষ্টা কোরো না বাঙালিবাবু। আমি এক কথার মানুষ, বাজে কথা বলবার সময় আমার নেই। স্পষ্ট করে বলো, বজ্রভৈরব আর শিলালিপি তুমি আমাকে দেবে কিনা?"

—"যা আমার কাছে নেই, যা আমার জিনিস নয়, তা আমি তোমাকে দেব কেমন করে? আর জেনে রাখো চুয়াং, দেবার শক্তি থাকলেও ও দু'টি জিনিস আমি তোমার হাতে দিতুম না।"

—"তাই নাকি? তাহলে তোমার মরবার সাধ হয়েছে?"

—"মরবার সাধ না হলেও মানুষকে মরতে হয় যে কোনওদিন। মানুষ এই পৃথিবীতে চিরদিন বাঁচতে আসেনি , আর আমিও যে চিরদিন বাঁচব না সে কথা জানি। এতএব তোমার যা খুশি করতে পারো। বারবার বলছি তো, আমি মরবার জন্যে প্রস্তুত। মানিক, তোমার কি মত?"

—"তুমিও যখন প্রস্তুত, আমিও তখন অপ্রস্তুত নই বন্ধু!"

—"তাহলে জেনে রাখো চুয়াং, এই হল আমাদের শেষ কথা!"

চুয়াং অল্পক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু তার ভাবহীন স্থির মুখের ভিতর থেকে দু'টো জ্বলন্ত ক্রূর চক্ষু বার কয়েক জয়ন্ত ও মানিকের মুখের দিকে চঞ্চল ভাবে আনাগোনা করলে। তারপর সে বললে, "বাঙালিবাবুরা, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তোমাদের এই সাহস দেখে আমি যে বিস্মিত হয়েছি এ কথা স্বীকার করছি। কিন্তু চুয়াংকে তোমরা চেনো না—চুয়াংকে তোমরা চেনো না! মুগ্ধ কি বিস্মিত হলে আমার কাজ চলে না! যখন তোমরা এতই অবুঝ, তোমাদের উপরে মৃত্যুদণ্ডই দিলুম! তোমাদের মতন শত্রু আমার পথ থেকে সরে দাঁড়ালে ওই বজ্রভৈরব আর শিলালিপি আমি যখন খুশি হস্তগত করতে পারব।" বলেই সে চীনে ভাষায় তার সঙ্গীদের সম্বোধন করে কি এক আদেশ প্রদান করলে।

সঙ্গে সঙ্গে তার অনুচরেরা জয়ন্ত ও মানিকের উপরে বাঘের মতন লাফিয়ে পড়ল। তারপর প্রচণ্ড ধাক্কা দিতে দিতে তাদের ঘরের বাইরের দিকে ঠেলে নিয়ে চলল।

হঠাৎ ঘরের দরজার সামনে আবির্ভূত হল আর একটি চীনেম্যানের মূর্তি। হৃষ্টপুষ্ট চেহারা—আর মুখ দেখলেই মনে হয় তার মধ্যে আছে যেন প্রভুত্বের স্পষ্ট ভাব।

সে এসেই চীনে ভাষায় কি বললে, জয়ন্ত ও মানিক তা বুঝতে পারলে না। কিন্তু তার কথা শুনেই চুয়াং বিদ্যুতের মতন ফিরে দাঁড়াল এবং সেও কি কথা বললে তার মাতৃভাষায়।

তারপর চীনা ভাষাতেই তাদের দু'জনের কি কথাবার্তা চলতে লাগল। চুয়াং স্থিরভাবে শান্ত স্বরেই কথা বলতে লাগল, কিন্তু আগন্তুকের ভাবভঙ্গি অত্যন্ত উত্তেজিত এবং তার কণ্ঠস্বরও চিৎকারেরই সামিল।

মিনিট তিন-চার পরে সেই নূতন আগন্তুক হঠাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে খুব চেঁচিয়ে যেন কাকে ডাকলে—সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল অনেকগুলো অতি দ্রুত পদশব্দ! দরজার বাইরে ছিল একটা মাঝারি আকারের উঠোন। দেখতে দেখতে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন চীনেম্যান এসে সেই উঠোনটাকে প্রায় পরিপূর্ণ করে তুললে। হাত দিয়ে সেই লোকগুলিকে দেখিয়ে আগন্তুক চুয়াং-এর দিকে ফিরে আবার কি বললে।

আগন্তুকের কথার কোনও জবাব না দিয়ে চুয়াং দীপ্ত চক্ষে একবার জয়ন্তের মুখের দিকে তাকালে, তারপর নিজের লোকদের প্রতি দিলে কি আদেশ।

হঠাৎ জয়ন্ত ও মানিককে ছেড়ে দিয়ে চুয়াং-এর দল নীরবে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল। আগন্তুককে চুয়াং কি বললে অবরুদ্ধ গর্জনের স্বরে। তারপর তারও সুবৃহৎ মূর্তি ঘরের ভিতর থেকে হল অদৃশ্য!

আগন্তুক এগিয়ে এসে আগে বন্ধনমুক্ত করলে জয়ন্ত ও মানিককে। তারপর ইংরেজিতে বললে, "আমি এই হোটেলের মালিক।"

জয়ন্ত কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললে, "আপনি আমাদের প্রাণ রক্ষা করলেন, আপনার এ উপকার আমরা চিরকাল মনে করে রাখব। কিন্তু ব্যাপার কিছুই বুঝলুম না। চুয়াং আমাদের ধরলেই বা কেন, আর আপনার কথায় ছেড়েই বা দিলে কেন?"

মালিক বললে, "বাবু, ব্যাপারটা সংক্ষেপেই বুঝিয়ে দিচ্ছি। বছর আষ্টেক আগে চুয়াং-এর সঙ্গে আমার আলাপ হয় সিঙ্গাপুরে। সেই আলাপ প্রায় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। তারপর আমি কলকাতায় এসে এই হোটেল খুলি, চুয়াং-এর সঙ্গে আর দেখাশোনা হয়নি। মাসখানেক আগে এই কলকাতাতেই আবার চুয়াং-এর দেখা পেলুম। সে বললে এই শহরেই থাকবে, বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমার হোটেলে এসেই রাত্রের আহারটা সেরে যাবে। চুয়াং যে নিরাপদ লোক নয় লোকের মুখে আমি একথা শুনেছি। কিন্তু সাধারণ খরিদ্দারের মতন সে যদি এই হোটেলে আসে তাতে আমার আপত্তি হবার কোনই কারণ ছিল না। চুয়াং বন্ধুবান্ধব নিয়ে রোজই এখানে আসত, তারপর খাওয়া দাওয়া আর গল্পগুজব করে আবার চলে যেত যথাসময়ে। আমি চুয়াং-এর দলের লোক নই। সুতরাং সে যে কখনও আমার হোটেলকে তার কার্যক্ষেত্র করে তুলতে পারে, এ সন্দেহ কোনদিনই আমি করিনি। আজ তার কাণ্ড দেখে প্রথমটা আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম। ইলেকট্রিকের প্রধান 'সুইচ' টিপে চারিদিক অন্ধকার করে সে যখন আপনাদের বন্দি করে হোটেলের ভিতরের ঘরে টেনে নিয়ে এল, তখন আমার হুঁশ হল। বুঝলুম আমার হোটেলে যদি এইরকম কাণ্ড-কারখানা চলে, তাহলে আমি যে খালি খরিদ্দারদের

হারাব তা নয়, সেই সঙ্গে আমার উপরে পড়বে পুলিসের দৃষ্টি। আমার জীবিকা অর্জনের পথ তো বন্ধ হবেই, তার উপর হয়তো আমাকে গুরুতর রাজদণ্ডও ভোগ করতে হবে। চুয়াং ভেবেছিল, আমি তার স্বজাতি আর বন্ধু বলে তাকে কোনই বাধা দেব না। কিন্তু বাবু, আমি চিরদিন সৎপথে থেকে নিজের জীবিকা নির্বাহ করছি, আমি কি কোনওদিন তার পাপপথের সঙ্গী হতে পারি? সেইজন্যেই আমি তাড়াতাড়ি লোকজন নিয়ে আপনাদের উদ্ধার করতে ছুটে এলুম। চুয়াং-এর মুখেই শুনলুম আপনারা বাঙালি। কিন্তু আপনারা ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন কেন, আপনারা কি পুলিসের লোক? চুয়াং কি কোনও গুরুতর অপরাধ করেছে?''

হঠাৎ একেবারে বদলে গেল জয়ন্তের মুখের ভাব। সে তাড়াতাড়ি বললে, ''আর একদিন এসে আপনার সব কথার জবাব দিয়ে যাব, আজ আর সময় নেই! আপনার এখানে টেলিফোন আছে তো?''

—''আছে বইকি।''

—''চলুন, চলুন শিগগির আমাকে টেলিফোনের কাছে নিয়ে চলুন!''

জয়ন্তের এই আকস্মিক ভাব পরিবর্তনের কারণ বুঝতে না পেরে বিস্মিত হয়ে মানিক চলল তার বন্ধুর পিছনে পিছনে।

টেলিফোনের 'রিসিভারটা' তুলে নিয়ে জয়ন্ত ডাক দিলে সুন্দরবাবুকে। তারপর বললে, ''হ্যালো! কে, সুন্দরবাবু? হ্যাঁ, আমি জয়ন্ত। যা বলি মন দিয়ে শুনুন। সার্জেণ্ট আর পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে নিয়ে ট্যাক্সি বা মোটরে করে শিগগির আমার বাড়ির কাছে যান! আরে মশাই, এখন কোনও 'হুম' বললে চলবে না! যা বলছি তাই করুন, কোনও কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। যদি কেউ স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক উপায়ে আমার বাড়ির ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করে, তবে তখনই গ্রেপ্তার করবেন তাকে বা তাদের। আর যদি দেখেন সেখানে কেউ নেই, তাহলে রাস্তার আনাচে কানাচে লুকিয়ে আমার বাড়ির উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। আমিও খুব শীঘ্রই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করব।'' 'রিসিভার'টা রেখে দিয়ে সে মালিকের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে, ''আপনার হোটেলের পিছন দিয়ে বাইরে যাবার রাস্তা আছে?''

—''আছে। কেন বলুন তো?''

—''হোটেলের সামনের দিকের রাস্তায় চুয়াং-এর দলবল নিশ্চয়ই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। আপাতত তাদের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা আমার নেই।''

—''তাহলে আমার সঙ্গে আসুন বাবু!''

—''এসো মানিক!''

—''ব্যাপার কি জয়ন্ত?''

—''মনে একটা বিশেষ সন্দেহের উদয় হয়েছে। সন্দেহটা কি এখন তা আর বলব না। চলো।''

বাংলার শার্লক হোমস

হোটেলের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে জয়ন্ত ও মানিক গিয়ে পড়ল একটা সরু গলির ভিতরে।

জয়ন্ত বললে, "দৌড় দাও মানিক, দৌড় দাও! এখন প্রত্যেক মুহূর্তটি হচ্ছে অত্যন্ত দামী।"

গলি ধরে ছুটতে ছুটতে তারা বউবাজার স্ট্রিটের উপরে গিয়ে পড়ল। সমুখ দিয়েই একখানা খালি ট্যাক্সি যাচ্ছিল, মানিকের সঙ্গে তার উপরে উঠে পড়ে জয়ন্ত বললে, "ড্রাইভার, যত তাড়াতাড়ি পারো গাড়ি চালিয়ে যাও! বখশিস পাবে!"

চালক খুব দ্রুতবেগেই গাড়িখানা চালিয়ে দিলে।

মানিক তাকিয়ে দেখলে জয়ন্তের মুখের উপরে দুশ্চিন্তার ছাপ! কোনওদিকে না তাকিয়ে মাথা হেঁট করে বসে সে নীরবে কি ভাবতে লাগল। মানিক বুঝলে, এখন জিজ্ঞাসা করলেও তার বন্ধুর কাছ থেকে কোনও জবাব পাওয়া যাবে না। কাজেই সেও করলে না আর কথা কইবার চেষ্টা। ... ...

...গাড়ি জয়ন্তের বাড়ির সামনে এসে থামল। চালকের প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েই জয়ন্ত ও মানিক দেখলে, আশপাশের অলিগলি থেকে সুন্দরবাবুর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসছে একদল পুলিসের লোক।

সুন্দরবাবু কাছে এলে পর জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "সন্দেহজনক কিছু দেখেছেন?"

সুন্দরবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "কিছু না, কিছু না! এমন কি একখানা মেঘও চাঁদের মুখ ঢাকেনি; একটা প্যাঁচাও ডাকেনি, একটা বাদুড় পর্যন্ত ওড়েনি! খেয়ে দেয়ে ঘুমোবার চেষ্টায় ছিলুম, অনর্থক কেন বাবা তুমি আমাকে এমন ঘোড়দৌড় করালে?"

জয়ন্ত যেন আশ্বস্ত হয়ে বললে, "তাহলে আমার সন্দেহ ভুল। বাঁচা গেল!"

—"তুমি কি সন্দেহ করেছিলে?"

—"সুন্দরবাবু, চুয়াং আজ আমাদের গ্রেপ্তার করেছিল। তারপর কেন যে আমাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে সেকথা পরে শুনবেন। তবে সন্দেহটা যে কি সেকথা এখন বলতে পারি। চুয়াং-এর বিশ্বাস, বজ্রভৈরব আর শিলালিপিকে রক্ষা করবার জন্যেই মনোমোহনবাবু আমার বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমি ভেবেছিলুম, আমরা বাড়ির বাইরে আছি জেনে চুয়াং আজ আমার বাড়ির উপরে আবার হানা দেবার সুযোগ ত্যাগ করবে না। কিন্তু এখন দেখছি চুয়াং-এর মাথায় সেরকম কোনও বুদ্ধির উদয় হয়নি। যাক, তার নির্বুদ্ধিতার জন্যে আমি দুঃখিত নই। নিরীহ মনোমোহবাবুকে এখানে একলা পেলে চুয়াং যে কি করত, ভগবানই জানেন!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম! ওই তোমার একটা ভারি বদ অভ্যাস জয়ন্ত! তুমি যখন যে অপরাধীর পিছু নাও, সর্বদাই যেন তাকেই দেখ সর্বত্র! আরে বাবা, চুয়াং এখানে এসে করবে কি? এটা তো চীনে মুল্লুক নয়, ওই চ্যাং-চোং-চুং বুলির কারদানি এখানে চলবে না!"

মানিক বললে, "সুন্দরবাবু, আপনার ওই বাজে মুখসাবাসি রাখুন! চুয়াং এর মধ্যেই কলকাতায় এসে যেসব কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়েছে, তা কি আপনি জানেন না? আজ সকলের চোখের সামনে একটা সাধারণ হোটেলের ভিতরে চুয়াং আমাদের ধরে খুন করবার জন্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল! তখন তো আপনাদের পুলিসের কোনই সাড়া পাইনি!"

সুন্দরবাবু দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতন করে তুলে বললেন, "এ্যাঁ! বল কি হে মানিক, বল কি! হ্যাঁ জয়ন্ত, এ আবার কি শুনছি?"

—"আসুন, বাড়ির ভিতরে গিয়ে সব কথা বলছি।" বলে জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে নিজের বাড়ির সদর দরজার কড়া নাড়তে লাগল।

মিনিটখানেক কড়া নাড়বার পরও কেউ দরজা খুলে দিলে না।

জয়ন্ত বিরক্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে বললে, "মধু, মধু, অ মধু! আমি বাড়িতে নেই বলে রাত এগারটার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছ? শিগগির নেমে এসে দরজা খুলে দাও। মধু, মধু!"

মানিকও চিৎকার করে বললে, "মধু, মধু! আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনে বাবা, ত্রাহি হে মধুসূদন!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম! মধুর ঘুম দেখছি আমারও চেয়ে ভারি!"

সকলে মিলে "মধু", "মধু" বলে চেঁচিয়ে রীতিমতো একটা কোলাহল সৃষ্টি করবার পরেও বাড়ির ভিতর থেকে পাওয়া গেল না কোনও সাড়াশব্দই! জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বললে, "এ তো ভাল কথা নয়! এত কম রাতে মধু তো কখনও এমন ভাবে ঘুমিয়ে পড়ে না! আবার আমার সন্দেহ হচ্ছে, বাড়ির ভিতরে নিশ্চয়ই কোনও অঘটন ঘটেছে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "তোমার যতসব বাজে সন্দেহ! ঘুম যে কি চীজ, আমি তা জানি! আমার বাড়িতে বজ্রপাত হলেও হয়তো আমার ঘুম ভাঙবে না।"

জয়ন্ত বললে, "বাড়ির ভিতরে খালি মধুই নেই, একথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন সুন্দরবাবু! মনোমোহনবাবুও আছেন। তাঁরও কোনও সাড়া পাচ্ছি না কেন?"

মানিক উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, "জয়, ব্যাপারটা আমিও ভাল বুঝছি না! আমরা সবাই মিলে যে রকম আকাশভেদী কোলাহল করছি তার চোটে কুম্ভকর্ণেরও নিদ্রাভঙ্গ হত, কিন্তু বাড়ির ভিতরে থেকেও মধু বা মনোমোহনবাবু কারুরই সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? দরজা ভাঙা ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায়ই নেই!"

জয়ন্ত বললে, "বেশ! তাহলে দরজাই ভাঙো!"

কয়েকজন মিলে একসঙ্গে দরজার উপরে উপরউপরি সজোরে পদাঘাত করবার পরই সশব্দে খিল ভেঙে দরজার পাল্লা দু'খানা খুলে গেল।

জয়ন্ত বললে, "এই তো কলকাতার বাড়ির দরজা! এই রকম সব দরজায় খিল দিয়ে আমরা ভাবি, আমাদের আর কোনও ভয়ের কারণ নেই!...মধু কি আজ আলোগুলোও জ্বালেনি? বাড়ির ভিতরে ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার!" বলতে বলতে সে সর্বাগ্রে এগিয়ে গিয়েই হঠাৎ বাধা পেয়ে মাটির উপরে পড়ে গেল।

মানিক উৎকণ্ঠিত স্বরে বললে, "কি হল জয়? হোঁচট খেলে নাকি?"

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এখানে একটা মানুষের দেহ পড়ে আছে! তার গায়েই পা লেগে আমি হোঁচট খেয়েছি!" বলেই সে দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে আলোর চাবি টিপে দিলে।

দেখা গেল, সেইখানে মাটির উপরে হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে জয়ন্তের ভৃত্য মধুর দেহ!

বন্ধনমুক্ত হয়ে মধু জানালে, খানিকক্ষণ আগে বাইরে থেকে সদরের কড়া নাড়ার শব্দ শুনে বাবু এসেছেন মনে করে সে নেমে দরজা খুলে দিয়েছিল, কিন্তু দরজা খুলে দেখে, বাইরে জনকয় চীনেম্যান দাঁড়িয়ে রয়েছে; দরজা খোলা পেয়েই তারা হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়ে তাকে আক্রমণ করে তার হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলে। তারপর তারা বাড়ির উপরে উঠে যায়।

জয়ন্ত অধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "মনোমোহনবাবু কোথায়?"

—"ওপরেই আছেন।"

—"দেখছেন সুন্দরবাবু, চুয়াং সময় নষ্ট করে না? চলুন উপরে!"

দোতলায় উঠে সুন্দরবাবু বললেন, "একবার এখানকার ঘরগুলো খানাতল্লাস করব নাকি?"

—"কোনও দরকার নেই, আগে তেতলায় মনোমোহনবাবুর কাছে চলুন। ভগবান জানেন তাঁর এখন কি অবস্থা হয়েছে!"

মনোমোহনবাবু চেয়ারের উপরে বসেছিলেন এবং চেয়ারের সঙ্গে দড়ি দিয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ বাঁধা! তাঁর মুখেও কাপড়ের শক্ত বাঁধন!

বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেই মনোমোহনবাবু বললেন, "বলেন কি মশাই, একটা মূর্তি আর একখানা শিলালিপির জন্যে শেষটা কি প্রাণে মারা পড়ব? মোটেই নয়, মোটেই নয়! ও দু'টো আপদ আমি কালকেই মিউজিয়ামে দান করব! চুয়াং পারে তো সেখান থেকে তাদের চুরি করুক!"

জয়ন্ত বললে, "সে কথা পরে হবে, এখন আজকের ব্যাপারটা কি বলুন দেখি?"

—"বলব কি আর মাথা মুণ্ডু ছাই! নির্ভাবনায় ঘুমোচ্ছিলুম মশাই, আচমকা যেন ভূমিকম্পের ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠলুম। আমি ভাল করে কিছু আন্দাজ করবার আগেই একদল চীনেম্যান আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললে।"

—"চুয়াংও এসেছিল নাকি?"

"বলেন কি মশাই, আসেনি আবার? হাড়জ্বালানো হাসি হেসে সে আমাকে বললে, 'আমি কথার মানুষ নই, কাজের মানুষ। যদি বাঁচতে চাও, এখনই সেই মূর্তি আর লিপি আমার হাতে দাও।' আমি জানালুম মূর্তি আর লিপি আমার কাছে নেই। সে চোখ রাঙিয়ে বললে, 'এখানে দাঁড়িয়ে গল্প করবার সময় আমার নেই। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখো! এগারটা বাজতে আর তিন মিনিট বাকি। এই তিন মিনিটের মধ্যে সেই দু'টো জিনিসের সন্ধান যদি না পাই, তাহলে গুলি করে তোমাকে কুকুরের মতন মেরে ফেলব।' বলেই সে রিভালবার বার করলে।"

সুন্দরবাবু বললেন "হুম! তারপর—তারপর?"

—"তারপর আবার কি, রিভলবারের কাছ থেকে নিস্তার পাবার জন্যে আমি যখন গুপ্তকথা ব্যক্ত করতে যাচ্ছি, হঠাৎ রাস্তার দিক থেকে কেমন অস্বাভাবিক স্বরে একটা হুলো বেড়াল তিনবার ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চুয়াং বিষম চমকে উঠে তাড়াতাড়ি আমার মুখ বাঁধতে বাঁধতে দলের লোকদের কি ইঙ্গিত করলে, আর অমনি ওরা সকলে বেগে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে তেতলার ছাদের দিকে উঠে গেল। চুয়াংও সরে পড়তে দেরি করলে না।"

জয়ন্ত বললে, "চুয়াং-এর চর ছিল রাস্তায়। বেড়ালের ডাক ডেকে সে জানিয়ে দিলে, ঘটনাস্থলে পুলিস এসে হাজির হয়েছে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "বেটারা তেতলার ছাদে গিয়ে উঠেছে? চলো, আমরাও সেখানে যাই।"

জয়ন্ত বললে, "পাহারাওয়ালাদের নিয়ে আপনি ছাদে যান। আমি এখন বাজে সময় নষ্ট করতে পারব না!"

—"মানে?"

—"মানে, ছাদে গিয়ে দেখবেন চুয়াং তার দলবল নিয়ে এতক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে।"

—"তুমি এতটা নিশ্চিন্ত কেন?"

—"যে লোক এত সহজে ধরা পড়ে সে কোনওদিন চুয়াংয়ের মতন পৃথিবীবিখ্যাত অপরাধী হতে পারে না।"

—"বেশ, দেখা যাক।"

সুন্দরবাবু সদলবলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। জয়ন্ত বললে, "মনোমোহনবাবু, আপনি আজ প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। চুয়াং নিশ্চয়ই তার বাক্য রক্ষা করত।"

—"বাক্য রক্ষা?"

—"হ্যাঁ, তার হিংস্র প্রকৃতির অনেক কাহিনীই আমি শুনেছি। এগারটা বাজবার আগে আপনি যদি মুখ না খুলতেন, সে আপনাকে গুলি করে মারতে একটুও ইতস্তত করত না। ভাগ্যে যথাসময়ে আমার মাথায় বুদ্ধি এসেছিল, ভাগ্যে যথাসময়েই আমি সুন্দরবাবুকে এখানে প্রেরণ করতে পেরেছিলুম! এখানে আপানার কিছু হলে আমার আর অনুতাপের সীমা থাকত না।"

মনোমোহনবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, "না মশাই আমি আর এর মধ্যে নেই! চুলোয় যাক মূর্তি আর লিপি, আপনি ও দু'টো বিপজ্জনক জিনিসকে চুয়াং-এর কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।"

মানিক বললে, "এই যে আপনি বললেন মূর্তি আর লিপি মিউজিয়মে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন? আমার মতে ওই ব্যবস্থাই ভাল।"

—"মোটেই নয়, মোটেই নয়! এখন আমি ভেবে দেখছি, চুয়াং তাহলে আমার ওপরে আরও বেশি রেগে যাবে। আমার অপঘাতে মরবার বাসনা নেই। জয়ন্তবাবু, ও দু'টো জিনিস আপনি চুয়াংয়ের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।"

মানিক হেসে বললে, "আমরা চুয়াংয়ের ঠিকানা জানলে সে কি আর এত লাফালাফি করতে পারত?"

জয়ন্ত সামনের টেবিলের উপরে সজোরে এক চড় বসিয়ে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে বললে, "মনোমোহনবাবু মাঝে মাঝে চমৎকার ইঙ্গিত দেন। ঠিক বলেছেন চুয়াংয়ের ঠিকানা—চুয়াংয়ের ঠিকানা!"

মানিক বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "হঠাৎ এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠলে কেন হে? তুমি কি চুয়াংয়ের ঠিকানা জানো?"

—"তোমার প্রশ্নের উত্তরে মনোমোহনবাবুর ভাষায় বলতে পারি—মোটেই নয়, মোটেই নয়!"

—"তবে?"

জয়ন্ত আর মুখ খুললে না, একেবারে চুপ করে গিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

এমন সময়ে সুন্দরবাবুর পুনঃপ্রবেশ। ডানহাতে তাঁর কুণ্ডলীকৃত দড়ি। তিনি বললেন, "হুম, ছাদে কেউ নেই।"

মানিক বললে, "দড়িগাছা কোথায় পেলেন?"

সুন্দরবাবু মুরুব্বির মতন ভারিক্কে চালে বললেন, "দড়িগাছা ছাদ থেকে ঝুলে জয়ন্তের বাড়ির পিছনকার বাগানের জমির ওপরে গিয়ে পড়েছিল। সুতরাং চুয়াং যে তার দল নিয়ে এই দড়ি ধরে বাগানের পাঁচিল টপকেপালিয়ে গিয়েছে, সে বিষয়ে আমি একেবারে নিঃসন্দেহ হয়েছি।"

মানিক দুই চক্ষু ডাগর করে তুলে বললে, "উঃ কী অদ্ভুত আবিষ্কার।"

সুন্দরবাবু চটে গিয়ে বললেন, "বাজে ফ্যাচ ফ্যাচ কোরো না মানিক! এ আমার আবিষ্কার নয় তো কি? একটু আগে জিজ্ঞাসা করলে তোমরা কি বলতে পারতে, চুয়াং কেমন করে পালিয়ে গিয়েছে?"

মনোমোহনবাবু বললেন, "মোটেই না, মোটেই না!"

মানিক হাত জোড় করে বললে, "আহাহা, চটেন কেন সুন্দরবাবু? আমরা একবাক্যে স্বীকার করতে রাজি আছি যে, আপনি হচ্ছেন বাংলাদেশের শার্লক হোমস!"

—"আবার বিদ্রূপ? মানিক, আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানো? দিই তোমার পিঠে দুম করে এক ঘুষি বসিয়ে!"

মানিক তাড়াতাড়ি সুন্দরবাবুর সামনে পিঠ পেতে দিয়ে বললে, "আহা, তাই দিন দাদা, তাই দিন! বাংলার শার্লক হোমসের হাতের কিল খাওয়াও হচ্ছে মস্ত বড় ভাগ্যের কথা!"

সুন্দরবাবু এইবারে ফিক করে হেসে ফেলে বললেন, "না মানিক, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না! তুমি হচ্ছ একটি আস্ত ভাঁড়!"

—"আমি ভাঁড় কি খুরি কি সরা তা জানি না সুন্দরবাবু, কেবল এইটুকুই জানি যে আমি আপনাকে বড্ড, বড্ড ভালবাসি!"

—"ক্ষান্ত দাও মানিক, ক্ষান্ত দাও! আজ আর তোমার ভালবাসার নতুন কোনও নজির দিও না! তাহলে আমার পক্ষে সহ্য করা শক্ত হয়ে উঠবে কিন্তু!"

জয়ন্ত এতক্ষণ অত্যন্ত স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। হঠাৎ সে লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "অনেকটা সময় খরচ করে ফেলেছি, অনেকটা সময় বাজে খরচ করে ফেলেছি মানিক!"

—"তোমার কথার অর্থ কি জয়?"

—"আচ্ছা মানিক, চুয়াং আজ সন্ধ্যার পর থেকে দু' দু'বার হার মানতে বাধ্য হয়েছে, কেমন?"

—"হ্যাঁ।"

—"রাত এখন প্রায় একটা বাজে। আজ বোধহয় নতুন কোনও অভিযানে বেরুবার জন্যে চুয়াং-এর মনে আবার নতুন করে উৎসাহের সঞ্চার হবে না, কি বল?"

—"তাই তো মনে হয়। কিন্তু চুয়াং যে চীজ, তার সম্বন্ধে জোর করে কিছুই বলা যায় না।"

—"ও কথা আমিও স্বীকার করি। তবে চুয়াং যখন এখানে পুলিসের দল দেখে গেছে, তখন এদিকে বোধহয় আজ আর তার পা বাড়াবার ভরসা হবে না।"

—"না হওয়াই তো স্বাভাবিক।"

—"এখন আন্দাজ করো দেখি, এখান থেকে চুয়াং কোথায় যেতে পারে?"

—"নিশ্চয়ই নিজের আস্তানায়।"

—"আমারও তাই বিশ্বাস। মনোমোহনবাবু একটু আগে চুয়াং-এর ঠিকানার কথা বললেন বটে, কিন্তু তার আস্তানার ঠিকানা আমরা কেউ জানি না। এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? ভেবে দেখো মানিক, ভেবে দেখুন সুন্দরবাবু!"

মানিক মৌন হয়ে ভাবতে লাগল।

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম, আপাতত এক্ষেত্রে আমরা করতে পারি ছাই আর ভস্ম! চুয়াং কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তা আবিষ্কার করা কি বড় চারটি খানেক কথা! কি বলো মানিক?"

মানিক উৎসাহিত কণ্ঠে বলে উঠল, "জয়, জয়, আজকেই চুয়াং-এর ঠিকানা বলতে পারেন একটি ভদ্রলোক!"

—"কে বলো দেখি?"

—"মিঃ সুং!"

সুন্দরবাবু বললেন, "মিঃ সুং আবার কে বাবা?"

—"একটি চীনে হোটেলের মালিক। তিনি চুয়াং-এর দলের লোক নন, কিন্তু তার পুরাতন বন্ধু। খুব সম্ভব, তিনি চুয়াং-এর ঠিকানা বলতে পারেন।"

জয়ন্ত নিজের রুপোর শামুকদানি থেকে এক টিপ নস্য নিয়ে বললে, "সাবাশ, ঠিক বলেছ মানিক! আমি এখনই টেলিফোনে মিঃ সুং-এর সঙ্গে কথা কইব।" বলেই জয়ন্ত টেবিলের কাছে গিয়ে টেলিফোনের 'রিসিভার'টা তুলে নিয়ে মিঃ সুং-এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবার চেষ্টা করলে। ওদিক থেকে সাড়া আসতে খানিক দেরি হল, অত রাত্রে সুং নিশ্চয়ই শয্যায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তারপর 'রিসিভারে'র মধ্যে জাগল একটি কণ্ঠস্বর।

জয়ন্ত বললে, "হ্যালো! কে আপনি? মিঃ সুং? এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করছি বলে ক্ষমা করবেন। আমি কে? আমি হচ্ছি জয়ন্ত—আজকেই আপনার হোটেলে যাকে আপনি চুয়াং-এর কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন! তাহলে বুঝতে পেরেছেন? ধন্যবাদ! হ্যাঁ, আপনার কাছে একটি বিশেষ দরকারি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। আপনি চুয়াং-এর ঠিকানা নিশ্চয়ই জানেন? জানেন না, কি মুশকিল! কি বললেন? চুয়াং-এর বাসা আপনি চেনেন? সে একদিন সেখানে আপনাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিল? খুব ভাল কথা, খুব ভাল কথা! তাহলে দয়া করে আমার একটি অনুরোধ রাখবেন কি? কি অনুরোধ? আমার এখানে পুলিস ফৌজ প্রস্তুত হয়েই আছে। সবাইকে নিয়ে আমি এখনই আবার আপনার কাছে গিয়ে হাজির হচ্ছি। আজ রাত্রেই আপনাকে আমাদের সঙ্গে কষ্ট স্বীকার করে একবার বাইরে বেরুতে হবে। কি বলছেন? কাল সকালে হলেই ভাল হয়? না মিঃ সুং, কাল সকাল হবে অত্যন্ত অসময়! চুয়াং হচ্ছে অতিশয় ধড়িবাজ, আজকের রাতটা মিছে নষ্ট করলে কাল সকালে আমরা তাকে আর খুঁজে পাব বলে মনে করি না! আমি তাকে নিশ্বাস ফেলবার বা ভাববার সময় দিতে প্রস্তুত নই! যেতে যদি হয়, আজ এখনই আমাদের চুয়াং-এর বাসায় যেতে হবে। মনে রাখবেন মিঃ সুং, আজ আপনার হোটেলে যে বিশ্রী কাণ্ডটা হয়ে গেছে তার পরেও আপনি যদি আমাদের এটুকু সাহায্যও না করেন, তাহলে পুলিসের কাছে আপনার হোটেলের সুনাম বোধহয় বাড়বে না। কি বললেন? আপনি রাজি? ধন্যবাদ মিঃ সুং, ধন্যবাদ! ততক্ষণে আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন, আমরা যথাসম্ভব শীঘ্র এখান থেকে বেরিয়ে পড়ছি।" টেলিফোনের 'রিসিভার'টা আবার রেখে দিয়ে সে ফিরে বললে, "সুন্দরবাবু! জাগ্রত হোন! এখনই আরও কিছু পুলিসের লোক আর খানকয় গাড়ি আনবার ব্যবস্থা করুন।"

সুন্দরবাবু বললেন, "বলো কি জয়ন্ত! এই রাত্রে?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ,—এই রাত্রে, আজই! চুয়াং, নিশ্চয়ই আজ আমাদের দেখতে পাবে বলে আশা করছে না, সে এখন অপ্রস্তুত! কাল সকালে তার বাসায় গেলে দেখব পাখি হয়তো উড়ে গেছে! আমি তাকে হাঁপ ছাড়তে দিতে রাজি নই!"

—"কিন্তু—"

—"কিন্তু টিন্তু এর মধ্যে নেই সুন্দরবাবু! এটা হচ্ছে বিংশ শতাব্দী। আমার ঘরে রয়েছে টেলিফোন যন্ত্র, আপনি ইচ্ছা করলে সারা কলকাতায় আপনার কণ্ঠস্বরকে এখনই ছড়িয়ে দিতে পারেন। বসুন টেলিফোনের কাছে এসে। তারপর কার সঙ্গে কি কথা কইতে হবে সেটা আমার চেয়ে আপনিই ভাল করে জানেন!"

মনোমোহনবাবু আড়ষ্টভাবে বললেন, "বলেন কি মশাই, এক ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে আপনারা আবার এক নতুন বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়তে চান?"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "এই রকমই আমাদের জীবন! আর আপনিও যখন আমাদের দলে এসে ভিড়েছেন, তখন আপনাকেও আমরা এখানে ফেলে যাব না, সঙ্গে করেই নিয়ে যাব।"

মনোমোহনবাবু প্রবলভাবে মস্তক আন্দোলন করতে করতে আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে বললেন, "মোটেই নয়, মোটেই নয়! বাপরে, আপনাদের সঙ্গে আমি কোথায় যাব? উঁহু, উঁহু! অসম্ভব!"

—"বেশ, তাহলে আপনি এখানেই থাকুন। কিন্তু মনে রাখবেন মনোমোহনবাবু, এই বিচিত্র অপরাধী চুয়াং-এর কথা কিছুই বলা যায় না। আমরা একটা 'চান্স' নিয়ে দেখছি বটে, কিন্তু কে বলতে পারে, চুয়াং এখানেই আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে নেই? হয়তো আমরা যেই বেরিয়ে যাব, তখনই এইখানে হবে আবার তার আবির্ভাব! সে ঠ্যালা আপনি সামলাতে পারবেন তো?"

মনোমোহনবাবু তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে বললেন, "বলেন কি মশাই! চুয়াং আবার এখানে আসতে পারে? আর তার ঠ্যালা সামলাব একলা আমি? মোটেই নয়, মোটেই নয়! যমালয়ে যদি যেতেই হয় তাহলে আপনাদের সঙ্গে যাত্রা করাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কার্য!"

সুন্দরবাবু প্রায় হতাশ কণ্ঠে বললেন, "পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে! কোনই উপায় নেই মনোমোহনবাবু, আমাদের কোনই উপায় নেই! যাই, এখন টেলিফোনের কাছে গিয়ে বসি, জয়ন্তের আজ্ঞা পালন করি! হুম্!"

চুয়াংয়ের বাগানবাড়ি

খিদিরপুর পার হয়ে, গঙ্গার ধারে অনেকটা নির্জন স্থানে মাঝারি আকারের বাড়ি—তার চারিধারে প্রাচীর দেওয়া প্রশস্ত উদ্যান।

অবশ্য উদ্যান বলতে যা বোঝায় এ বাগানটি ঠিক তেমনধারা নয়। এর কতক কতক জায়গায় বিবিধ ফুলের চারা বসিয়ে উদ্যান রচনার অল্পবিস্তর চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই বিরাজ করছে রীতিমতো একটা বিশৃঙ্খল দৃশ্য। এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় পুরাতন গাছ এবং এখানে ওখানে ঝোপঝাপের সংখ্যাও অল্প নয়।

এই খানিক সাজানো ও খানিক অগোছানো উদ্যানের উপরে আজ জেগে আছে প্রতিপদের প্রায় পরিপূর্ণ চন্দ্রালোক। সকলে লক্ষ্য করে দেখেন কিনা জানিনা, কিন্তু চাঁদের আলোর মায়ামন্ত্রে ছাঁটা কাটা ফুলবাগিচারও চেয়ে বিশৃঙ্খল জঙ্গলের ঝোপঝাপ এবং এলোমেলো গাছের দলকেই মনে হয় ঢের বেশি সুন্দর! চাঁদের আলোর নিজস্ব রূপের লেখায় হেলে পড়া ভাঙা কুঁড়েঘরও হয়ে ওঠে বিচিত্র সৌন্দর্যময়! সুতরাং এই যত্ন এবং অযত্নের চিহ্ন নিয়ে এই উদ্যানটিও ভাবুকের চক্ষে আজ ফুটিয়ে তুলতে পারে রূপকথার সুমধুর স্বপ্ন!

বাগানের সীমানার বাইরে একদিক দিয়ে চলে গিয়েছে একটি রাজপথ। তারও দু'ধারে দাঁড়িয়ে ফুলের আদর মাখা বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে নানান গাছের সবুজ পাতারা মর্মর স্বরে গেয়ে উঠছিল চন্দ্রকিরণের রাগিণী!

বাগানের আর একদিক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কলরবে মুখরা গঙ্গা, সর্বাঙ্গে জ্যোৎস্নার আশীর্বাদ নিয়ে তাকেও দেখাচ্ছিল উজ্জ্বল দুধের ধারার মতো।

পথের ধারের যে গাছগুলোর কথা বলেছি তাদের উপরে পাতা ডালপালার আড়ালে গা ঢেকে বসেছিল দলে দলে মানুষ! তাদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বাগানের মাঝখানকার বাড়িখানার দিকে। সে সব চক্ষের মধ্যে ছিল না চন্দ্রালোকের কবিত্বের ছাপ—ছিল শুধু শিকারী জীবের বুভুক্ষু দৃষ্টি!

একটা বড় ডালের উপরে সুন্দরবাবুর সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে জয়ন্ত ও মানিক।

জয়ন্ত চুপিচুপি বললে, "গতিক সুবিধের নয় বোধহয়।"

মানিক বললে, "কেন?"

—"বাড়ির ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। এখান থেকেই জানলা দিয়ে বেশ দেখা যাচ্ছে, লোকজনেরা ব্যস্ত ভাবে এ ঘরে ও ঘরে ছুটোছুটি করছে। এত রাত্রে ওদের এমন ব্যস্ততা কেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "দেখো, দেখো! বাগানের ফটক দিয়ে পরে পরে ভিতরে ঢুকছে একখানা বাস আর দু'খানা মোটরগাড়ি!" জয়ন্ত বললে, "আবার বলছি সুন্দরবাবু, গতিক বড় সুবিধের নয়। ভাগ্যিস আমরা কাল সকালে আসিনি!"

—"হুম!"

—"কাল সকালে এলে দেখতুম, পাখির খাঁচা খালি পড়ে আছে!"

—"ঠিক বলেছ। চুয়াং রাস্কেল বোধ হয় আজ রাত্রেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে এখান থেকে সরে পড়বার ফিকিরে আছে!"

—"চালাকিতে চুয়াংয়ের জুড়ি মেলা ভার। সে বেশ বুঝেছে মিঃ সুংয়ের কাছে তার আস্তানা যখন অপরিচিত নয়, আর তিনি যখন তার পাপকার্যে সাহায্য করেননি, তখন এ বাড়ির ভিতরে সে আর নিরাপদে বাস করতে পারবে না। অতএব পুলিসের আবির্ভাবের আগেই এখান থেকে সে অন্তর্হিত হতে চায়! অদ্ভুত তার তৎপরতা! এইজন্যেই এত কাল ধরে সে পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে আসতে পেরেছে—কারণ পুলিসের ঘুম ভাঙতে দেরি লাগে।"

সুন্দরবাবু সগর্বে বললেন, "ও কথা তুমি বলতে পারো না। এবারে পুলিসের ঘুম ভেঙেছে যথা সময়ে। বাগানবাড়ির চারিদিক ঘিরে যে জাল পেতে রেখেছি তা ভেদ করে আজ চুয়াং কেমন করে পালায় দেখি!"

—"অতটা নিশ্চিন্ত হবেন না সুন্দরবাবু। চুয়াং হচ্ছে পারদের মতন পিচ্ছিল। ধরেও ধরা যায় না।"

মানিক উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, "বাড়ির সব ঘরের আলো নিবে গেল! একাধিক মোটর 'স্টার্ট' করার শব্দ জাগল!"

মিনিট দেড়েক পরেই দেখা গেল, বাস এবং মোটরগাড়ি দু'খানা বাগানের ফটকের দিকে এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

জয়ন্ত গাছের উপর থেকে নামতে নামতে বললে, "সুন্দরবাবু, পুলিস বাঁশি বাজিয়ে আপনিও মানিককে নিয়ে চটপট নেমে আসুন!"

রাত্রির বক্ষ ভেদ করে বেজে উঠল পুলিস বাঁশির তীব্র ও তীক্ষ্ণ ধ্বনি! সঙ্গে সঙ্গে গাছগুলো করতে লাগল মনুষ্য বৃষ্টি!

গাড়ি তিনখানা হঠাৎ গতি বাড়িয়ে দিয়ে বেগে ফটক পার হয়ে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ফটকের সমুখে এসেই তাদের গতি বন্ধ করতে হল, কারণ সামনেই পালাবার পথ জুড়ে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র পুলিসের লোক!

প্রথম গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে একজন লোক ইংরেজিতে বললে, "কে তোমরা?"

সুন্দরবাবু বললেন, "পুলিস!"

—"আমাদের বাধা দিচ্ছ কেন?"

—"তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে ইচ্ছা করি না। চুয়াং কোথায়?"

—"চুয়াং!"

—"একেবারে আকাশ থেকে পড়লে যে!"

—"কে চুয়াং?"

—"তোমাদের দলপতি।"

—"আমাদের কোন দলও নেই, দলপতিও নেই। চুয়াং বলে কারুকে আমরা চিনি না।"

—"বেশ, আমরা সব গাড়ি খুঁজে দেখতে চাই।"

—"কোন অধিকারে?"

সুন্দরবাবু গর্জন করে বললেন, "পাজি ডাকু কোথাকার! ফের তুই প্রশ্ন করছিস?... সেপাই, এই সেপাই! গাড়ি তিনখানাকে ঘিরে ফ্যালো! সব ব্যাটাকে গাড়ির ভিতর থেকে টেনে বাইরে এনে দাঁড় করাও!"

আচম্বিতে গাড়ি তিনখানা আবার 'স্টার্ট' নিয়ে পুলিস বাহিনীর দিকে তীরবেগে এগিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক গাড়ির ভিতর থেকে হু হু করে বেরিয়ে আসতে লাগল রিভলবারের গুলি! পরমুহূর্তে পুলিসের আগ্নেয় অস্ত্রগুলোও করতে লাগল বিকট চিৎকার!

জয়ন্ত কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও না করে বললে, "মানিক, ও গাড়ি তিনখানার মধ্যে নিশ্চয়ই চুয়াং নেই—সে কখনওই এমন বোকার মতন নিজের জীবনকে বিপন্ন করবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাকে পালাবার সুযোগ দেবার জন্যেই গাড়ি থামিয়ে ওরা পুলিসের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছিল। চলো, আমরা বাগানে যাই।"

জয়ন্ত ও মানিক দ্রুতপদে অগ্রসর হল। চাঁদের আলোয় চারিদিক করছে ধবধব। সেই আলোতে খানিকটা তফাতেই দেখা গেল, একটা ঝোপ সন্দেহজনক ভাবে দুলে দুলে উঠছে!

তারা দু'জনেই সেইদিকে ছুটল এবং তৎক্ষণাৎ ঝোপের অপর পার্শ্ব ভেদ করে আবির্ভূত হল একটা সুদীর্ঘ ও প্রকাণ্ড মূর্তি এবং আত্মপ্রকাশ করেই সে মহা বেগে একদিকে দৌড়তে আরম্ভ করলে!

ছুটতে ছুটতে জয়ন্ত বললে, "ছোটো মানিক, যত জোরে পারো ছোটো! যা ভেবেছি তাই! ওই দেখো চুয়াং!"

চুয়াং খানিক দূর অগ্রসর হয়েই সামনে পেলে একটা মেদিপাতার বেড়া। এক লাফে সেই বেড়া অতিক্রম করে সে অন্য পার্শ্বে গিয়ে পড়ল এবং তারপর তাকে আর দেখা গেল না।

জয়ন্ত এবং মানিকও লাফ মেরে সেই মেদিপাতার বেড়ার ওপারে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের দিকে আর অগ্রসর হবার উপায় নেই। কারণ তাদের সমুখেই কয়েক হাত তফাতে রয়েছে সেই বাগানবাড়ির সুদীর্ঘ দেয়াল এবং দেয়ালের ঠিক তলা দিয়ে একটানা চলে গিয়েছে সারিসারি ফুলন্ত কেনা গাছ। ডান দিকেও বাড়ি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে রয়েছে করোগেট দিয়ে গড়া খুব উঁচু একখানা লম্বা ঘর—সম্ভবত সেখানাকে একাধিক মোটরের 'গ্যারেজ'রূপে ব্যবহার করা হয়।

সামনেই দেয়ালের পাশে একটা হাত তিনেক উঁচু কেনাগাছ তখনও দুলছিল ঘনঘন। নিশ্চয় সেই গাছটা কোন মানুষের দেহের আঘাত পেয়েছে!

কিন্তু সেখানে মানুষ কোথায়? এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে কোনও মানুষেরই লুকিয়ে থাকবার উপায় নেই, অথচ এইমাত্র তারা স্বচক্ষে চুয়াংকে বেড়া পার হয়ে এইখানে অবতীর্ণ হতে দেখেছে।

সামনের দিকে বাড়ির উচ্চ দেয়াল, ডান দিকে 'গ্যারেজে'র দেয়াল এবং বাম দিকেও খানিকটা পরেই সেই মেদিপাতার বেড়া দিয়ে জমিটা রয়েছে ঘেরা। চুয়াং যদি ওইদিক দিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে পালাবার চেষ্টা করত তাহলে কিছুতেই জয়ন্ত ও মানিকের দৃষ্টিকে এড়াতে পারত না। চুয়াং সামনের দিকে, বাম দিকে ও ডান দিকে যায়নি, অথচ আচম্বিতে অদৃশ্য হয়েছে ঠিক যেন কোনও যাদুমন্ত্রের প্রভাবেই!

জয়ন্ত পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে গেল! মাটির উপরে টর্চের তীব্র আলোক শিখা ফেলে জমির উপরটা পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ বাড়ির দেয়ালের সামনেই এক জায়গায় থেমে দাঁড়িয়ে পড়ে সে বললে, "এই দেখো মানিক! ফুলগাছের নরম জমির উপরে চারখানা সুবৃহৎ পায়ের টাটকা দাগ! নিশ্চয়ই চুয়াং মিনিট খানেক আগেই এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এর পর এ পাশে আর ও পাশে আর কোনও পায়ের দাগ নেই। দেখলে সন্দেহ হয়, পৃথিবী এইখানে ঠিক যেন তাকে নিঃশেষে গ্রাস করে ফেলেছে! এও কি সম্ভব? এমন আশ্চর্য ব্যাপার তো জীবনে কখনও দেখিনি! সত্যই কি চুয়াং মায়াবী?"

মানিক স্তম্ভিত হয়ে বোবার মতো দাঁড়িয়ে রইল, কিছু বলবার ভাষা খুঁজে পেলে না।

জয়ন্তও নীরবে বেড়া দিয়ে ঘেরা সেই জমির সব জায়গায় আলো ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়াতে লাগল। প্রায় দশ মিনিট কেটে গেল, কিন্তু চুয়াং-এর আর কোনও চিহ্নই সে আবিষ্কার করতে পারলে না।

ওদিকে নিশীথ রাত্রির স্তব্ধতা ভাঙানো আগ্নেয় অস্ত্রের গর্জন থেমে গিয়েছে খানিক আগেই। এখন দেখা গেল সুন্দরবাবু, মনোমোহনবাবু এবং কয়েকজন পাহারাওয়ালা বেগে ছুটে আসছে জয়ন্তদের দিকেই।

সুন্দরবাবু কাছে এসেই বিষম হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "হুম, হুম! আমরা করছি তুমুল যুদ্ধ, আর তোমরা কিনা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছ বাগানের বায়ুসেবন? ছিঃ জয়ন্ত,ছিঃ মানিক, এতটা আমি তোমাদের কাছ থেকে আশা করিনি!"

সুন্দরবাবুর তিরস্কার আমলের মধ্যে না এনেই জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "আপনাদের তুমুল যুদ্ধের কি পরিণাম হল মশাই?"

—"পরিণাম?" সে একরকম মন্দের ভালই!"

—"মন্দের ভাল কিরকম?"

—"হতভাগাদের একখানা মোটর আমাদের ফাঁকি দিয়ে লম্বা দিতে পেরেছে! কিন্তু সেই বাসের আর একখানা মোটরের সব লোককে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। যাদের গ্রেপ্তার করেছি তাদের মধ্যে তোমার চুয়াং-এর মতন কোনও অতিকায় দানবকে দেখতে পেলুম না! নিশ্চয়ই যে মোটরখানা পালিয়ে গিয়েছে, চুয়াং ছিল তার মধ্যেই!"

—"ভুল সুন্দরবাবু, ভুল! চুয়াং গাড়ি ছেড়ে আবার এই বাগানের মধ্যেই নেমে পড়েছিল। আমরা তার পিছনে পিছনে ছুটেছিলুম বটে, কিন্তু তাকে ধরতে পারিনি। ঠিক এইখানে এসে একরকম আমাদের চোখের সামনেই চুয়াং করেছে সশরীরে পাতালের মধ্যে প্রবেশ!"

—"তুমি কি বলছ হে জয়ন্ত? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?"

—"মাথা খারাপ হয়ে গেলে আমি এতটা বিস্মিত হতুম না! চোখের সামনে এই দেখলুম চুয়াংকে, তার পরমুহূর্তেই দেখলুম চুয়াং আর আমাদের চোখের সামনে নেই! এ এক আজগুবি ভেল্কি!"

মনোমোহনবাবু দুই চোখ পাকিয়ে বললেন, "বলেন কি মশাই? একটা রক্তমাংসে গড়া আস্ত মানুষ—বিশেষ চুয়াং-এর মতন অমন মস্তবড় মানুষ, আপনাদের মতন পাকা শিকারীর চোখের সুমুখ থেকে কখনও হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যেতে পারে? মোটেই নয়, মোটেই নয়!"

মানিক কিঞ্চিৎ তপ্ত স্বরেই বললে, "আমার কথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি, কিন্তু জয়ন্তের চোখকে ফাঁকি দেয় এমন জীব বোধহয় পৃথিবীতে জন্মায়নি। চুয়াং আজ যে ভোজবাজির খেলা দেখালে, দুনিয়ায় তার তুলনা নেই!"

মনোমোহনবাবু তখন বললেন, "হতে পারে মানিকবাবু, হয়তো আপনাদের কথাই ঠিক! এখন আমার মনে হচ্ছে ব্রহ্মদেশে গিয়ে শুনেছিলুম, চুয়াং নাকি এক অদ্বিতীয় যাদুকর! সাধারণ মানুষ কি কখনও যাদুকরকে এঁটে উঠতে পারে? মোটেই নয়, মোটেই নয়!"

সুন্দরবাবু বললেন, "যাদুকরের নিকুচি করেছে! আমি বেশ বলতে পারি জয়ন্ত আর মানিক ভুল দেখেছে, চুয়াং লম্বা দিয়েছে সেই পলাতক মোটরে চড়েই!"

জয়ন্ত তিক্ত হাসি হেসে বললে, "হয়তো আপনার কথাই ঠিক! হয়তো আমি আর মানিক যা দেখেছি সবই হচ্ছে স্বপ্ন!"

—"হুম, ও সব কথা চুলোয় যাক! এখন আমাদের কী করা উচিত?"

জয়ন্ত অকারণেই হঠাৎ রীতিমতো চিৎকার করে বললে, "বাগানের বাইরে চলুন, তারপর আমাদের কর্তব্য স্থির করবার অনেক সময় পাওয়া যাবে।"

একটি ফুলন্ত কেনাগাছ

রাত্রি তখন প্রায় প্রভাতের কাছে এসে পড়েছে।

স্তব্ধ পৃথিবী। গাছে গাছে ঘুমিয়ে পড়েছে মর্মরধ্বনি পর্যন্ত। এমন কি ঝিল্লীরাও ডেকে ডেকে শ্রান্ত হয়ে অবলম্বন করেছে মৌনব্রত।

বিশ্বের সবাই নিদ্রিত, ঘুম নেই কেবল চাঁদের চোখে। আজকের প্রতিপদের চাঁদ জানে, প্রভাতের প্রথম আলো ফুটলেও পাবে না সে ঘুমোবার অবসর! তাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে সূর্যালোকের তীব্রতার মধ্যে।

সেই মেদিপাতার বেড়া দিয়ে ঘেরা জমিটুকুর ভিতরে ঘুমিয়ে পড়েছিল জ্যোৎস্নাও।

আচম্বিতে জাগরণ দেখা গেল কিন্তু একটি অসম্ভব জায়গায়।

একটি পুষ্পিত কেনাগাছ আস্তে আস্তে মাটির উপর থেকে খানিকটা উঠে একটু সরে গিয়ে আবার পৃথিবীর উপরে অবতীর্ণ হয়েই দুলতে লাগল। তারপরই দেখা গেল এক আশ্চর্য দৃশ্য, যেখানে গাছ ছিল সেইখান থেকে আত্মপ্রকাশ করলে বিপুলবপু এক মনুষ্যমূর্তি!

সামনের ঘাস জমির উপরে দাঁড়িয়ে মূর্তি একবার এদিকে আর একবার ওদিকে দৃষ্টিপাত করলে। তারপর অত্যন্ত সন্তর্পণে হেঁট হয়ে আস্তে আস্তে একদিকে অগ্রসর হতে লাগল।

মেদিপাতার বেড়ার ওপাশ থেকে হঠাৎ জেগে উঠল আর একটা মূর্তি! সে লম্ফ দিয়ে বেড়া পার হয়ে এল এবং বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল সেই বৃহৎ মূর্তিটার দিকে!

বৃহৎ মূর্তিটা তাকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠতে না উঠতেই দ্বিতীয় মূর্তিটা তার উপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে করলে এক প্রচণ্ড মুষ্টাঘাত এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপুল আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠল, "চুয়াং! এইবারে তোমাকে পেয়েছি। তুমি দেবে জয়ন্তকে ফাঁকি?"

জয়ন্ত যে বিষম ঘুষি মেরেছিল বিষম বলিষ্ঠ লোকও তা সামলাতে পারত না, কিন্তু চুয়াং একবার হেলে পড়েই আবার সিধা হয়ে দাঁড়াল এবং চকিতে পকেট থেকে রিভলবার বার করে জয়ন্তকে গুলি করতে উদ্যত হল। কিন্তু জয়ন্ত বিদ্যুতের মতন হেঁট হয়ে বাম হাত দিয়ে রিভলবারসুদ্ধ চুয়াং-এর হাতখানা উপর দিকে ঠেলে দিলে এবং পরমুহূর্তেই চুয়াং-এর রিভলবার করলে আকাশের দিকে গুলিবর্ষণ!

চুয়াং তখন তার বিপুল বামবাহু দিয়ে জয়ন্তের দেহকে উপর দিকে তুলে উল্টে ফেলবার চেষ্টা করল। কিন্তু জয়ন্ত তার ডান হাত দিয়ে চুয়াং-এর বাম হাতখানা নিচের দিকে টেনে ধরলে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের দুই পদ দিয়ে বেষ্টন করলে শত্রুর দুই পদকে! দু'জনেই প্রাণপণে পরস্পরের প্রতি শক্তি প্রয়োগ করতে লাগল প্রায় একস্থানে দাঁড়িয়েই এবং এই ভাবেই কেটে গেল মিনিট খানেক!

খুব কাছেই শোনা গেল অনেকগুলো দ্রুত পায়ের শব্দ! রিভলবারের গর্জন শুনে প্রথমেই বেগে ছুটে আসছে মানিক, তারপরেই সুন্দরবাবু এবং তারও পরে আসছে কয়েকজন 'সার্জেন্ট' ও পাহারাওয়ালা। তারাও সকলে এসে চুয়াং-এর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর তাকে মাটির উপরে ফেলে দিয়ে তার দুই হাতে পরিয়ে দিলে হাতকড়ি!

জয়ন্ত দু'চারবার নিজের গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "চুয়াং, তুমি খুব চালাক, স্বীকার করছি! আসল ব্যাপারটা আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারিনি বটে, কিন্তু তুমি যে এই মেদিপাতার বেড়ার মধ্যেই কোনওখানে লুকিয়ে আছো, এবিষয়ে আমার একটুও

সন্দেহ ছিল না। একটা নিরেট মানুষ কখনও হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না! তাই আমি সবাইকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়ে বেড়ার ও পাশে ঘুপ্টি মেরে বসে সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলুম তোমার পুনরাবির্ভাবের জন্যেই! আমার অপেক্ষা করা সার্থক হয়েছে!"

চুয়াং দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে সগর্জনে বলে উঠল, "বাঙালি কুকুর, আজ দল বেঁধে তুই যদি আমাকে আক্রমণ না করতিস, তাহলে কে তোকে আমার হাত থেকে রক্ষা করত?"

জয়ন্ত শান্ত কণ্ঠেই বললে, "চুয়াং, তোমাকে আমি থোড়াই কেয়ার করি! তোমার হাতে ছিল রিভলবার, আমাকে রিভলবার ব্যবহার করবার কোনও সুযোগই তুমি দাওনি! তবু আমি শুধু হাতেই তোমার রিভলবারকে ব্যর্থ করেছি আর তোমাকেও রেখেছিলুম বন্দি করে।... সুন্দরবাবু, খুলে দিন এই শয়তানের হাতকড়ি! উঠে দাঁড়াক এ আমার সামনে! আমি আজ আমার নিজের গায়ের জোরেই একে ফের মাটির উপরে পেড়ে ফেলব!"

মানিক এগিয়ে এসে জয়ন্তের সামনে দাঁড়িয়ে বললে, "না, না, না! পাগলা কুকুর হেরে গিয়েও গর্জন করতে পারে, কিন্তু মানুষ কবে যেচে কুকুরের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে যায়? যথেষ্ট হয়েছে, এদৃশ্যের উপরে এখন যবনিকা পড়ুক!"

জয়ন্ত হেসে বললে, "বন্ধু, যবনিকা পড়তে একটু দেরি আছে। এখনও দেখা হয়নি চুয়াং কোন কৌশলে পাতালের ভিতরে প্রবেশ করেছিল!" বলতে বলতে সে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সেইখানে, যেখান থেকে চুয়াং করেছিল আশ্চর্য ভাবে আত্মপ্রকাশ!

প্রথমেই দেখা গেল ফুলগাছের নরম জমির উপরে বসানো রয়েছে একটা বড় গোলাকার পাত্র। কাঠ দিয়ে সেটা তৈরি এবং তার গভীরতা হচ্ছে প্রায় দেড় হাত! সেই গভীরতার শূন্যতাকে পরিপূর্ণ করা হয়েছে মাটি দিয়ে এবং সেই মাটির ভিতরে শিকড় রোপণ করে দাঁড়িয়ে আছে একটি ফুলন্ত কেনাগাছ!

তার পাশেই মাটির ভিতরে রয়েছে একটা গর্ত, যার মধ্যে নেমে জয়ন্ত সকলেরই চোখের সুমুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর সে গর্ত থেকে আবার উপরে উঠে এসে বললে, "চুয়াং, তোমাকে আমি অভিনন্দন দিতে রাজি আছি। ধন্য তুমি! লোকের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য এমন উপায় যে কেউ অবলম্বন করতে পারে, এটা কল্পনাতেও আনা সম্ভবপর নয়।...সুন্দরবাবু, এই চমৎকার লুকোবার জায়গাটি চুয়াং আগে থাকতেই তৈরি করে রেখেছিল। সারি সারি কেনাগাছ, তারই মধ্যে একটি স্থানের একটি কেনাগাছকে তুলে প্রথমে সে কেটেছিল এই গর্তটি। তারপর সেই গর্তের মাপে তৈরি করেছিল একটি কাঠের বড় পাত্র। তারপর সে এই পাত্রের মধ্যে মাটি ভরে আবার পুঁতে দিয়েছিল কেনার চারা। এই চারার পাত্রটিকে আবার আমি গর্তের মুখে বসিয়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখুন, এর মধ্যে কোথায় ফাঁকি আছে তা ধরতে পারেন কিনা!" বলতে বলতে সে গাছ ও মাটিসুদ্ধ সেই গোলাকার পাত্রটিকে আবার দুই হাতে তুলে গর্তের মুখে বসিয়ে দিলে। তখন সেখানে যে কোনও গর্ত বা কাঠের পাত্র আছে সেটা বোঝাবার আর কোনও উপায়ই রইল না!

মানিক বললে, "আশ্চর্য! এত সহজে পৃথিবীকে ঠকানো যায়?"

মনোমোহনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "বলেন কি মশাই? অসাধু কখনও সাধুকে ঠকাতে পারে? মোটেই নয়, মোটেই নয়! এই দেখুন না, চুয়াং কি আজ জয়ন্তবাবুকে ঠকাতে পারলে?"

সুন্দরবাবু কোনওরকম মতপ্রকাশ না করে কেবল তাঁর সেই বিখ্যাত শব্দটি উচ্চারণ করলেন, "হুম!"

বিভীষণের জাগরণ

প্রথম

আর্তনাদ ও সিংহনাদ

রাত দুপুর।

একে 'ব্ল্যাক আউট'-এর মহিমায় মানুষের চক্ষু হয়েছে প্রায় অন্ধ, তার উপরে চারিদিকে ঝরছে ঘোর অমাবস্যার তিমির-ঝরণা!

কলকাতার রাস্তায় একটিমাত্র গ্যাসের আলো জ্বলছে না এবং কোথাও নেই একখানি মাত্র দোকানের এতটুকু বাতির শিখা। মাথার উপরে দীপ্তনেত্রে জেগে আছে বটে লক্ষ লক্ষ তারকা, কিন্তু আকাশের অস্তিত্ব ছাড়া মানুষকে তারা আর কিছুই দেখাতে পারছে না। অনায়াসেই বলা চলে, অন্ধকারের অতলে ডুবে কলকাতা এখন মরে কালো পাথরের মতো আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

কেবল কোনও কোনও বাড়ির বন্ধ জানলার পিছন থেকে মাঝে মাঝে জাগছে ক্ষুধিত শিশুর কান্না, পথের মোড়ে মোড়ে এক আধখানা শোনা যাচ্ছে পাহারাওয়ালার পদশব্দ এবং হয়তো বা দূর হতে থেকে থেকে ভেসে আসছে কুকুরদের ঝগড়ার শব্দ—ব্যস, এছাড়া জীবনের আর কোনও লক্ষণই নেই।

শহরের উত্তরাঞ্চলের একটি পথকে হঠাৎ জাগ্রত করে তুললে দুই পথিকের বাধো বাধো জুতোর শব্দ। তারা অতি সাবধানে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে পথ চলছিল দৃষ্টিহীনের মতো। তাদের নাম হচ্ছে, হেমন্ত ও রবীন—পাঠক-পাঠিকাদের কাছে নিশ্চয়ই নতুন করে তাদের পরিচয় আর দিতে হবে না।

এই পূর্ণ ব্ল্যাক-আউট-এর সময়ে চোর-ডাকাত ছাড়া কলকাতার কোনও ভদ্র বাসিন্দাই পথে পা বাড়াতে সাহস করে না। কিন্তু শখের ডিটেকটিভ হেমন্ত ও তার সহকর্মী বন্ধু রবীন কলকাতার ছেলে হলেও, বহুকাল পরে বিদেশ থেকে সম্প্রতি শহরে ফিরে এসেছে, কাজেই এখনকার কলকাতার হালচাল তাদের ভাল করে জানা ছিল না।

তারা একটি বিচিত্র কেস হাতে নিয়ে অপরাধীর সন্ধানে গিয়েছিল পূর্ব আফ্রিকায়। মামলার কিনারা করবার পরই বাধল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

এবারকার মহাযুদ্ধ যে কতখানি গুরুতর হয়ে উঠবে, সেটা কেউই তখন অনুমান করে উঠতে পারেনি। কাজেই রবীন যখন প্রস্তাব করলে যে, "আফ্রিকার এত দূরে যখন এসেছি, তখন গোটাকয়েক সিংহ, হিপো, গণ্ডার আর গরিলার সঙ্গে আলাপ না জমিয়ে কলকাতায় ফেরা হতে পারে না", তখন হেমন্ত সহজেই রাজি হয়ে গেল।

কিছুকাল তারা ঘুরে বেড়ালে আফ্রিকার বনে বনে। তাদের হাতের বন্দুক যে কত হিংস্র জীবকে জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলে এবং তাদের বিস্মিত চক্ষু যে কত অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও নানাজাতের অসভ্য মানুষ দর্শন করলে, চিত্তাকর্ষক হলেও তার বিবরণ দেবার জায়গা নেই।

তারপর তারা সভ্য জগতে ফিরে এসে দেখলে, বর্তমান যুদ্ধ হয়ে উঠেছে পৃথিবীব্যাপী সর্বজাতির যুদ্ধ। এমনকি, তাদের প্রিয় স্বদেশের উপরেও পড়েছে যুদ্ধদেবতার ক্রুদ্ধদৃষ্টি। তখন তারা তাড়াতাড়ি দেশের দিকে যাত্রা করলে।

কাল তারা কলকাতায় এসেছে। আজ গিয়েছিল এক বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধুর মুখে তারা শুনলে দেশের খবর এবং তাদের মুখে বন্ধু শুনলেন আফ্রিকার শিকার কাহিনী। দুই পক্ষই পরস্পরের কথা শুনতে ব্যস্ত, ইতিমধ্যে ঘড়ির কাঁটা কখন যে বারটার ঘর পেরিয়ে গেল, সেটা কারুর খেয়ালেই এল না।

হঠাৎ বন্ধু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "কি বিপদ, রাত বারটা বেজে গেছে যে। হেমন্ত, রবীন, আজ আর তোমাদের বাড়ি যাওয়া চলবে না। পথ একেবারে অন্ধকার।"

হেমন্ত বললে, "এতকাল পরে দেশে ফিরে এসে নিজের বাড়িকে ভারি মিষ্টি লাগছে। হোক পথ অন্ধকার, বাড়িতে আমি যাবই।"

রবীন বললে, "আমরা কলকাতার ছেলে, সারা শহর আমাদের নখদর্পণে। দুই চোখ মুদেও আমরা বাড়িতে গিয়ে হাজির হতে পারব।"

বন্ধুর মানা তারা মানলে না, তখনই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু দু'চার পা হেঁটেই রাস্তার অবস্থা দেখে তারা রীতিমতো দমে গেল। এতটা কল্পনা করা অসম্ভব। এ হচ্ছে, অচেনা কলকাতা,—রবীনের 'নখদর্পণে' এর কিছুই দেখা যায় না।

মিনিট চার চলতে না চলতেই তারা বার কয়েক হোঁচট খেলে। পঞ্চম মিনিটে রবীন সটান লম্বমান হল ফুটপাতের উপর নিদ্রিত প্রকাণ্ড একটা কালো ষাঁড়ের পিঠের উপরে। ষাঁড়টা 'এ কি হল' ভেবে চমকে ধড়মড় করে দাঁড়িয়ে উঠল এবং রবীন 'বুঝি গুঁতো খেলুম' ভেবে তার পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ল একগাদা গোবরে মুখ গুঁজড়ে! ইতিমধ্যে হেমন্ত একটা কুকুরের ল্যাজ মাড়িয়ে দিয়ে, কামড় খাবার ভয়ে মেরেছে মস্ত এক লাফ এবং পরমুহূর্তেই অদৃশ্য কলা বা আমের খোসায় পা হড়কে করেছে কঠিন ভূতলে শয়ন!

রবীন মুখ থেকে গোবরের দুর্গন্ধ প্রলেপ চাঁচতে চাঁচতে ম্রিয়মাণ স্বরে বললে, "ভাই হেমন্ত, বাড়িতে যাচ্ছি বটে, কিন্তু বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারব কি?"

হেমন্ত গায়ের ধুলো-কাদা ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, "ভাই রবীন, আমারও সেই সন্দেহ হচ্ছে! কে জানত কলকাতার অন্ধকার এমন ভয়াবহ হতে পারে!"

তারপর তারা সন্তর্পণে বাড়ির দেওয়াল ধরে ধরে এগুতে লাগল ধীরে ধীরে।

খানিক পরে হেমন্ত বললে, "আন্দাজে বোধ হচ্ছে, পাশের গলিটাই কানাইবাবুর লেন।"

রবীন বললে, "ওটা বলাইবাবুর স্ট্রিট হলেও আশ্চর্য হব না। আমার চোখ ভরে ঝরছে খালি আলকাতরার বৃষ্টি!"

—"এটা যদি কানাইবাবুর লেন হয়, তাহলে এখান থেকে আমাদের বাড়ি আছে এক মাইল দূরে!"

—"এক মাইল? এই অন্ধকারে এক মাইল মানে, বিশ মাইলের ধাক্কা! বাপ, এ অন্ধকার যেন জীবন্ত বিভীষিকার মতো!"

হঠাৎ কাছ থেকে হুমকি জাগল—"এই! কোন হায় রে!" সুমিষ্ট সম্ভাষণ শুনেই বোঝা গেল, কোনও সজাগ লালপাগড়ির টনক নড়েছে!

হেমন্ত বললে, "আমরা ভদ্রলোকের ছেলে বাবা, অন্ধকারে হয়ে পড়েছি অন্ধ নাচারের মতো!"

পাহারাওয়ালা বললে, "ঝুট বাত! তোম লোক কো থানামে যানে হোগা!"

হেমন্ত বললে, "বেশ, তাই চলো বাবা! এ অন্ধকারের চেয়ে, থানা ঢের ভাল! হে লালপাগড়ি, আমাদের পথ দেখাও।"

পাহারাওয়ালা কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই খানিক তফাৎ থেকে জাগল সে কী বিকট ও ভয়ঙ্কর কোলাহল! রাত্রির তিমিরাবগুণ্ঠন ভেদ করে ভেসে আসতে লাগল বহু কণ্ঠের আর্তনাদের পর আর্তনাদ, দুড়ুম দড়াম দড়াম শব্দ এবং বর্ণনাতীত ও অমানুষিক গর্জনের পর গর্জন—যা শুনলে সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে এবং হৃদয় হয়ে যায় স্তম্ভিত!

দ্রুত পদধ্বনি শুনে হেমন্ত ও রবীন বুঝলে, পাহারাওয়ালা বেগে ছুটল—যেদিক থেকে কোলাহল ভেসে আসছে সেইদিকে।

রবীন অভিভূত কণ্ঠে বললে, "হেমন্ত, ভাই! ও কী গর্জন! ও যে কলকাতার মুখে আফ্রিকার হুহুঙ্কার!"

হেমন্ত বিস্ময়রুদ্ধ স্বরে বললে, "হ্যাঁ রবীন, হ্যাঁ! ও যে সিংহের গর্জন!"

রবীন বললে, "কিন্তু দারুণ ভয়ে চেঁচিয়ে কাঁদে কারা? অমন দুড়ুম দড়াম শব্দ কিসের? আর এখানে সিংহের আবির্ভাবই বা হবে কেমন করে?"

আর্ত চিৎকার ও দুড়ুম দড়াম শব্দ কমে এল, কিন্তু সিংহনাদ তখনও থামল না।

কলকাতার রাজপথে দাঁড়িয়ে হেমন্ত ও রবীনের মনে হল, তারা দাঁড়িয়ে আছে আফ্রিকার ভীষণ জঙ্গলে—যেখানে নিশীথ রাতের স্তব্ধ বুক ও গহন বনের বিজন মাটি কাঁপিয়ে জাগে রক্তলোলুপ পশুরাজ সিংহের কণ্ঠে মুহুর্মুহু মেঘধ্বনির মতো গুরুগম্ভীর গর্জন!

আরও মিনিটখানেক পরে থেমে গেল সিংহনাদ।

রবীন বললে, "এ পাড়ার কোনও ধনী হয়তো শখ করে সিংহ পুষেছে, আর সেই সিংহটা—" হঠাৎ আবার বিকট আর্তনাদ ও সিংহনাদ শুনে সে সচমকে মুখ বন্ধ করলে!

হেমন্ত উত্তেজিত স্বরে বললে, "রবীন, রবীন, এবারে চিৎকার যে খুব কাছেই এগিয়ে এসেছে!"

রবীন সভয়ে বলে উঠল, "সিংহটা নিশ্চয় খাঁচা ভেঙে পথে বেরিয়ে পড়েছে—"

—"খালি তাই নয়, সে এদিকেই ছুটে আসছে, রবীন, আমি তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি! শিগগির পালিয়ে এসো—শিগগির!"

কিন্তু তারা পালাবারও সময় পেলে না, অন্ধকারের ভিতর থেকে ঝড়ের বেগে হুড়মুড় করে তাদের উপরে এসে পড়ল বিরাট একটা তুষারশীতল দেহ—হেমন্ত ও রবীন প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে দুইদিকে ছিটকে পড়ে ভূতলশায়ী হল এবং পরমুহূর্তেই কানফাটানো সিংহনাদেই ফুটল খল খল খল অট্টহাস্য আর সঙ্গে সঙ্গে বন্য দুর্গন্ধে চারিদিক হয়ে উঠল পরিপূর্ণ! তারপরেই কার ভারি ভারি দ্রুত পদ মাটি কাঁপাতে কাঁপাতে দূরে চলে গেল!

রবীন উঠে বসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "সিংহের কণ্ঠে মানুষের অট্টহাস্য। একি অসম্ভব ব্যাপার!"

হেমন্তও তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। বললে, "রবীন, যে জীবটা এখান দিয়ে ছুটে চলে গেল সে সিংহ নয়! অন্ধকারের ভিতরে মাটি থেকে প্রায় পনের যোল ফুট উঁচুতে আমি তার জ্বলন্ত চক্ষু দু'টো স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি! জীবটা অন্তত হাতির সমান উঁচু!"

রবীন অবিশ্বাস ভরা কণ্ঠে বললে, "তুমি কী বলছ হেমন্ত? সিংহের মতন গর্জন করতে আর মানুষের মতন হাসতে পারে, অথচ হাতির মতন উঁচু—এমন কোনও জীবই পৃথিবীতে কখনও ছিল না, এখনও নেই।"

হেমন্ত বললে, "সে কথা আমিও জানি রবীন। কিন্তু নিজের চোখ-কানকে তো অবিশ্বাস করতে পারি না,। আশ্চর্য কাণ্ড, আজকের অন্ধকার কি অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলতে চায়?"

—"না হেমন্ত, আজকের অন্ধকারে আমাদেরই মাথা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। যে দেহটার ধাক্কায় আমরা গড়াগড়ি খেলুম, তার ভয়াল স্পর্শটা অনুভব করতে পেরেছ কি? জ্যান্ত দেহ মড়ার চেয়ে ঠাণ্ডা! এ কি অসম্ভব ব্যাপার! তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়ি এসো!" তারা আর অন্ধকার মানলে না, জোরে পা চালিয়ে দিলে। কিন্তু বেশিদূর অগ্রসর হতে হল না—হঠাৎ পথের ধারে বাধা পেয়ে হেমন্ত আবার হল প্রপাতধরণীতলে!

রবীন বললে, "কি মুশকিল, আছাড় খেয়ে খেয়ে আজ যে আমাদের গতর চূর্ণ হয়ে যাবে দেখছি।"

হেমন্ত গম্ভীর স্বরে বললে, "রবীন, এখানে পথের উপরে পড়ে আছে একটা মৃতদেহ।" বলেই সে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে।

দেশলাইয়ের কাঠির পর কাঠি জ্বেলে দেখা গেল, এক বীভৎস দৃশ্য! রক্তধারার মাঝখানে পাহারাওয়ালার পোশাক পরা একটা মুণ্ডহীন নরদেহ পথের উপরে দু'দিকে দু'হাত ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে এবং তার ছিন্নমুণ্ডটাও ছিটকে পড়ে আছে দেহ থেকে আট-দশ হাত তফাতে!

রবীন শিউরে উঠে বললে, "নিশ্চয়ই এই হতভাগ্য একটু আগে আমাদের সঙ্গে কথা কয়েছিল!"

হেমন্ত বললে, "এর কাঁধের আর দেহের দিকে তাকিয়ে দেখো! কোনও অস্ত্র দিয়ে এর মুণ্ডটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়নি—এর কাঁধের আর দেহের উপর রয়েছে বড় বড় দাঁত আর নখের চিহ্ন।"

এমন সময় পেছনে বেজে উঠল ঘনঘন মোটরের ভেঁপু!

তারা দু'জনেই চমকে ফিরে দেখলে, পথের অন্ধকারকে তীব্র 'হেডলাইট'-এর উজ্জ্বল আলোতে ভাসিয়ে দিয়ে একখানা মোটর গাড়ি বেগে তাদের দিকে ছুটে আসছে!

দ্বিতীয়

টেলিফোনে সিংহনাদ

মোটরখানা হুড়মুড় করে একেবারে কাছে এসে পড়ল—তাদের চাপা দেয় আর কি!

হেডলাইট-এর তীব্রতায় হেমন্ত ও রবীনের চোখ তখন অন্ধ হয়ে গেছে। কোনওরকমে নিজেদের সামলে নিয়ে তারা পথের পাশের দিকে লাফিয়ে পড়ল! সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িখানাও।

গাড়ির ভেতর থেকে হুমকি জাগল—"কে তোমরা? এত রাতে, এই অন্ধকারে এখানে কি করছ?"

হেমন্ত গাড়ির কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে বললে, "কে কথা কয়? আওয়াজটা যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে!"

"আরে, আরে, একি! হেমন্তবাবু যে! আপনি না পগার পার হয়ে আফ্রিকায় লম্বা [illegible]নেন?"

হেমন্ত হেসে বললে, "পগার নয় ভূপতিবাবু, আমরা সমুদ্র পার হয়েছিলুম।"

এই উড়োজাহাজ, ডুবোজাহাজ আর কলের জাহাজের যুগে সমুদ্র হয়ে পড়েছে পগারেরই মতন ছোট্ট। পার হতে কতক্ষণই বা লাগে।...কিন্তু সে কথা যাক! কবে এলেন? এখানে কি করছেন?"

—"আজই এসেছি। বন্ধুর বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি ফিরছিলুম। কিন্তু পথের মাঝে হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে পড়েছি।"

—"স্তম্ভিত হয়েছেন! কেন?"

—"এখানে শুনেছি, মানুষের কণ্ঠে আর্তনাদ আর মানুষের কণ্ঠে সিংহনাদ।"

—"মানে?" ভূপতিবাবু তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন! যাঁরা "রাত্রির যাত্রী" পড়েছেন, তাঁদের কাছে ইনস্পেক্টার ভূপতিবাবুর নূতন পরিচয় অনাবশ্যক।

হেমন্ত বললে, "সঙ্গে টর্চ আছে তো? ওই দিকে আলো ফেলে দেখুন। মানেটা বুঝতে দেরি হবে না"।

ভূপতিবাবুর হাতের টর্চ অন্ধকারকে ছ্যাঁদা করে টেনে দিলে অগ্নিশিখার দীর্ঘ রেখা। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল পাহারাওয়ালার মুণ্ডহীন দেহ এবং দেহহীন মুণ্ড!

ভূপতিবাবু হতভম্ব। মোটর থেকে পুলিসের অন্যান্য লোকেরাও টপাটপ নেমে পড়ল।

হেমন্ত বললে, "ভূপতিবাবু, এত সহজে হতভম্ব হবেন না। লাশের কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখুন!"

মোটর ফিরিয়ে হেডলাইট-এর শিখা ফেলা হল মৃতদেহের উপর।

ভূপতিবাবু দেহটা খানিকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। তাঁর হতভম্ব ভাবটা আরও বেড়ে উঠল। তিনি অতিশয় হতাশভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন।

হেমন্ত বললে, "লাশের ওপরে থাবা আর নখের চিহ্ন দেখছেন?"

—"দেখছি তো।"

—"পাহারাওয়ালা মারা পড়েছে কোনও হিংস্র জন্তুর আক্রমণে।"

—"কলকাতা শহরে হিংস্র জন্তু!"

—"অসম্ভব কথা বটে। কিন্তু আপাতত তা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।"

—"কিন্তু, কি জন্তু?"

—"জানি না। যদিও আমি সিংহনাদ শুনেছি।"

—"সিংহ? বলেন কি মশাই?"

—"হ্যাঁ, আমি সিংহনাদ শুনেছি বটে—কিন্তু মানুষের কণ্ঠে।"

—"এ কি হেঁয়ালি, বাবা!"

—"একটা জীব অন্ধকারে আমাদের পাশ দিয়ে মাটি কাঁপিয়ে ছুটে চলে গেল। সেটা হাতির মতন উঁচু।"

ভূপতিবাবু হেসে ফেললেন। বললেন, "আজব কথা নম্বর এক হচ্ছে, কলকাতা শহরে সিংহ। নম্বর দুই হচ্ছে, সিংহ চিৎকার আর হাস্য করে—মানুষের কণ্ঠস্বরে। নম্বর তিন হচ্ছে, সিংহটা হাতির সমান উঁচু। হেমন্তবাবু, এই কি রূপকথা বলবার সময়?"

হেমন্ত জবাব দিলে না, পথের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। হেডলাইট-এর মহিমায় পথের খানিকটা দিনের বেলার চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

ভূপতিবাবু ব্যঙ্গের স্বরে বললেন, "কি ব্যাপার, হেমন্তবাবু? এইবারে পথের ধুলোর ভিতর থেকে আপনি কি সিংহটাকে পুনরাবিষ্কার করতে চান?"

—"না ভূপতিবাবু, পথের ধূলোয় আমি আবিষ্কার করেছি এক আশ্চর্য মানুষের পদচিহ্ন! আপনার ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—আজব কথা নম্বর চার।"

—"কই, দেখি!"

—"এই দেখুন—পরে পরে কতকগুলো পায়ের দাগ! প্রত্যেক পদচিহ্ন লম্বায় প্রায় আঠার-উনিশ ইঞ্চি!"

ভূপতিবাবুর চোখ দু'টো যেন ঠিকরে পড়বার মতো হল।

সাব-ইনস্পেক্টর পতিতপাবন এসেছিল ভূপতিবাবুর সঙ্গে। সে বললে, "স্যর, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমরা এদিকে এসেছি জরুরি ফোন পেয়ে!"

ভূপতিবাবু চমকে উঠে বললেন, "ঠিক বলেছ। কিন্তু কি করব ভাই, পথের মাঝে যা দেখছি আর যা শুনছি, তাতে যে দুনিয়াকেই ভুলে যেতে হয়। এখন কোন দিক সামলাই বলো দেখি?"

পতিত বললে, "আপনি আর একটা মস্ত কথাও ভুলে যাচ্ছেন। টেলিফোনেও আপনি সিংহের গর্জন শুনেছেন!"

ভূপতিবাবু লম্ফত্যাগ করে বললেন, "ঠিক বলেছ ভাই, ঠিক বলেছ! এখানেও সিংহনাদ, টেলিফোনেও সিংহনাদ! আমি এখন কি করব? কোন সিংহনাদের পিছনে ধাবিত হব?"

পতিত বললে, "স্যর, আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।"

—"হচ্ছে নাকি? মানে?"

—"হ্যাঁ স্যর, হচ্ছে। আমার বিশ্বাস, থানার টেলিফোনে আর এই রাস্তায় গর্জন করেছে একই সিংহ!"

—"ঠিক বলেছ ভাই, ঠিক বলেছ ভাই, ঠিক বলেছ! পতিত, তোমাকে ধন্যবাদ!"

হেমন্ত বললে, "টেলিফোনে সিংহনাদ ব্যাপারটা বুঝলুম না!"

—"আরে মশাই, আমিও একটু-আধটু যা বুঝেছিলুম, আপনার কথা শুনে তাও গুলিয়ে গিয়েছে! ব্যাপার কি জানেন? দিব্যি শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলুম, হঠাৎ ফোনে এল ডাক। রিসিভারটা

তুলে নিয়েই শুনলুম, কে একজন লোক বিষম ভয় পেয়ে বলছে—'আপনারা শীঘ্র আসুন—আমার বাড়িতে ডাকাত পড়েছে—আমি দশ নম্বর কানাইবাবুর লেনে থাকি...', তারপর হঠাৎ তার স্বর থেমে গেল, আমার কানে এল দুমদাম আওয়াজ আর একটা সিংহের ভীষণ গর্জন আর মানুষের আর্তনাদ। তারপর সব চুপ!"

হেমন্ত বললে, "আপনি কি দলবল নিয়ে সেইখানেই যাচ্ছেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু যেতে যেতে পথে এই কাণ্ড!"

—"ভূপতিবাবু, ঘটনাস্থল বোধহয় খুব কাছেই। মানুষের আর্তনাদ, সিংহের গর্জন, দুড়ুম দড়াম শব্দ আমরাও শুনেছি—আর বেশিদূর থেকেও নয়।"

—"এইটেই তো কানাইবাবুর লেন। খানিক তফাতে এতক্ষণ পরে কতকগুলো আলো দেখা যাচ্ছে না?"

পতিত বললে, "হ্যাঁ স্যর, অনেক লোক ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি করছে! বোধহয় এতক্ষণ ওরা ভয়ে চুপটি মেরে লুকিয়েছিল!"

—"ঠিক বলেছ পতিত, ঠিক বলেছ! কিন্তু ভয়ের আর অপরাধ কি বল? কলকাতায় সিংহের তর্জন-গর্জন শুনলে হিটলার-মুসোলিনিও ভয়ে ভড়কে যেতেন! তার ওপরে হেমন্তবাবুর কথায় আমার পিলে চমকে গেছে। হাতি নয়, অথচ হাতির মতো উঁচু জানোয়ার—যা নয়, তাই। সেটাও না হয় গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিলুম, কিন্তু, এগুলো কি বাবা? আঠার-উনিশ ইঞ্চি লম্বা মানুষের পায়ের দাগ! স্বচক্ষে দেখছি, এগুলো তো উড়িয়ে দিলেও উড়ে যাবে না? আচ্ছা, এসব নিয়ে পরে মাথা ঘামালেও চলবে—এখন আগে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হওয়া যাক। আসুন হেমন্তবাবু, আপনিও আসুন।"

তৃতীয়

উন্মত্ত প্রেতাত্মার অট্টহাসি

কানাইবাবুর লেনের দশ নম্বর। মস্ত বড় বাড়ি—প্রাসাদ বললেও চলে। চারিদিকে রেলিং ঘেরা প্রকাণ্ড বাগান। বড় বড় ফুল-ফলের গাছ সবুজ ফুলওয়ারী জমির উপরে ছায়ার আদর ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে! এখানে ওখানে সাজানো মর্মর মূর্তি। মাঝখানে একটি মার্বেল পাথরের ফোয়ারা—উপরে ভৃঙ্গার হাতে করে একটি নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে সকৌতুকে জল ঢালছে নিচের দিকে। বাড়ির পিছনদিকে একটি মাঝারি পুকুর।

কানাইবাবুর লেনের মতন একটা গলির ভিতরে এ রকম অট্টালিকা—দৃষ্টিকে সচকিত করে তোলে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের মতো। বাড়ির মালিক যে লক্ষপতি, সেটা বুঝতেও বিলম্ব হয় না।

বাড়ির সামনে রাস্তার উপরে কোলাহল সৃষ্টি করেছে বিপুল এক জনতা। অনেকের হাতে লণ্ঠন—তারা এতটা উত্তেজিত হয়েছে যে ব্ল্যাক-আউট-এর আইন ভঙ্গ করতেও ভীত নয়।

পুলিস দেখে লোকেরা পথ ছেড়ে দিলে।

পুলিসের সঙ্গে হেমন্ত ও রবীন বাড়ির সামনে এসে দেখলে, ফটকের লোহার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজার লোহার রেলিঙের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, বাগানের মাটির উপরে

একটা মানুষের মূর্তি অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে আছে। টর্চ-এর আলো ফেলে বোঝা গেল, লোকটা মৃত—তার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত, মাটির উপরেও রক্তের ধারা।

ভিড়ের ভিতর থেকে একজন মাতব্বর গোছের লোক বেছে নিয়ে ভূপতিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার নাম কি?"

—"শ্রী সুদর্শন বিশ্বাস।"

—"বাড়ি?"

—"সামনেই।"

—"আপনি কিছু দেখেছেন?"

—"দেখবার বিশেষ কিছু ছিল না। তবে শুনেছি যথেষ্ট।"

—"মানে?"

—"এই ব্ল্যাক-আউট-এর দিনে মানুষের চোখ তো অন্ধেরই সামিল। তবে গোলমাল যা শুনেছি তা আর বলবার নয়।"

—"আচ্ছা সুদর্শনবাবু, গোড়া থেকে সব গুছিয়ে বলুন দেখি!"

—"এই বাড়িখানা হচ্ছে, অবনীকান্ত রায়চৌধুরীর। অবনীবাবু পূর্ববঙ্গের জমিদার, অনেক টাকার মালিক, এ পাড়ার মাথা বললেও চলে। তিনি খুব ধার্মিক, দিনরাত পুজো আর আহ্নিক নিয়ে থাকেন, প্রায়ই তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে মাঝে মাঝে প্রবাসেই মাসকয়েক কাটিয়ে আসেন। শুনেছি, বিন্ধ্যাচলের এক মহাতান্ত্রিক সন্ন্যাসী তাঁর গুরু। মাঝে মাঝে তাঁর গুরুভাইরাও এখানে এসে অতিথি হন, তাঁরাও সবাই সন্ন্যাসী। এই কালকেই তাঁর একদল সন্ন্যাসী-গুরুভাই এখানে এসেছিলেন।"

হেমন্ত বললে, "সন্ন্যাসীরা কি বাংলাদেশের লোক?"

—"হিন্দুস্তানি।"

—"তারা এখন নেই?"

—"না। কাল এসে, কালকেই চলে গেছে। এত তাড়াতাড়ি তারা আর কোনওবারে যায় না। দশ-পনেরদিন এইখানেই কাটিয়ে যায়।"

—"এবারে এত তাড়াতাড়ি গেল কেন, বলতে পারেন?"

—"না। তবে কাল দুপুরে বাড়ির ভেতর থেকে রাগারাগি আর বচসার সাড়া পেয়েছিলুম। বোধহয় অবনীবাবুর সঙ্গে সন্ন্যাসীদের ঝগড়া হয়েছিল। ঝগড়ার কারণ জানি না।"

—"অবনীবাবুর বাড়ির ফটক ভিতর থেকে বন্ধ। কোনও লোকজনেরও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এর কারণ কি?"

—"কেমন করে বলব? বোমার ভয়ে অবনীবাবু পরিবারবর্গকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি একলা নেই, বাড়িতে দাসদাসী দারোয়ান আছে অনেক। দেখতেই পাচ্ছেন, একজন দারোয়ান ওখানে মরে পড়ে আছে। কিন্তু বাকি লোকজনরা কোথায় গেল জানি না।"

ভূপতিবাবু বললেন, "বাড়ির ভিতরে ঢুকলেই সেটা বোঝা যাবে। তারপর আপনার কথা বলুন।"

—"রোজ রাতে ঘুমোবার আগে আমি খানিক পড়াশোনা করি। আজ রাত বারটা বাজবার পর আমি বই মুড়ে আলো নেবাবার উপক্রম করছি, হঠাৎ ভীষণ চিৎকার শুনে চমকে বারান্দায় ছুটে এলুম।"

—"ভীষণ চিৎকার?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, কে যেন 'বাপ রে, মা রে, মেরে ফেললে রে' বলে চেঁচিয়ে উঠল। বারান্দায় এসে অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলুম না, কিন্তু অবনীবাবুর বাড়ির ভিতরে তখন কি যে হুলুস্থূল বেধেছিল, তা ভগবানই জানেন! একসঙ্গে অনেক লোকের আর্তনাদ, দুড়ুম দড়াম করে যেন দরজা-জানলা ভাঙার শব্দ, ছুটোছুটি হুটোপুটি, হুঙ্কারের পর হুঙ্কার—"

হেমন্ত বাধা দিয়ে বললে, "কি রকম হুঙ্কার?"

—"সেটা হুঙ্কার না বলে অন্য কিছু বললে আপনারা হয়তো আমাকে পাগল মনে করবেন।"

—"অসঙ্কোচে বলুন, আমরা কিছু মনে করব না।"

—"আমার মনে হল, বাড়ির ভিতরে যেন একটা ক্রুদ্ধ সিংহ ক্রমাগত গর্জন করছে! যদিও আমি বেশ জানি, এখানে সিংহের আবির্ভাব অসম্ভব।"

—"অবনীবাবু শখ করে সিংহ পোষেননি?"

—"পাগল! অবনীবাবুকে যে চেনে, সে জানে যে, তাঁর ও রকম অদ্ভুত শখ হতেই পারে না!"

—"তারপর?"

—"কিন্তু সিংহগর্জনের চেয়েও ভয়ানক আর একটা শব্দ আমি শুনেছি।"

—"কি?"

—"খলখল করে অট্টহাসি! সিংহের গর্জন যতবার থেমেছে, সেই প্রচণ্ড অট্টহাসি জেগে উঠেছে ততবার! সে এমন বিশ্রী হাসি যে, ভাবতেও আমার বুক এখনও শিউরে উঠছে! আপনারা হাসবেন না, কিন্তু আমার মনে হল, একটা প্রেতাত্মা যেন হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে গিয়ে অট্টহাস্য করছে!"

অন্য কেউ হাসলে না, কিন্তু ভূপতিবাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন, "উন্মত্ত প্রেতাত্মার অট্টহাস্য! সুদর্শনবাবু, আপনার কল্পনাশক্তি আছে!"

সুদর্শন আহত কণ্ঠে বললেন, "ঘটনার সময়ে এখানে হাজির থাকলে আপনি কেমন করে হাসতেন, দেখতুম! আমি যা শুনেছি আর দেখেছি, কোনও কল্পনাশক্তিই তার কাছ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না!"

—"তাহলে শুধু শোনা নয়, আপনি কিছু দেখেছেনও?"

—"এই অন্ধকারে ছায়া ছায়া যা দেখেছি তা না দেখারই সামিল।"

—"তবু কি দেখেছেন বলুন!"

—"আমি বলব না।"

—"মানে?"

—"আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আমি ভুল দেখেছি। সুতরাং সে কথা বলে আপনার হাসিকে আর উৎসাহিত করতে চাই না।"

—"মশাই, পুলিসের কাছে কিছু লুকোবেন না। ভুল হোক, ঠিক হোক, বলুন।"

—"দেখছেন, ফটকের পাশে এই আধঘোমটা দেওয়া মিটমিটে গ্যাসের আলোতে এখানটায় অল্পস্বল্প নজর চলে? যদিও এরকম মর মর আলো গাঢ় অন্ধকারের চেয়েও খারাপ। কারণ, এমন আলোতেই রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। তার উপরে সেইসব তীব্র আর্তনাদ, বিকট হুঙ্কার আর অমানুষিক অট্টহাসি শুনে আমার অবস্থা হয়েছে তখন আচ্ছন্নের মতো। ধরতে গেলে তখন আমার ভাল করে দেখবার শক্তিই ছিল না। আমি যা দেখেছি বলে মনে করছি তা হচ্ছে একেবারেই অলৌকিক। অলৌকিক কথা বলে খোকাদের মন ভোলানো যায়, কিন্তু পুলিসের কাছে তার কোনও দামই নেই!"

—"তবু বলুন, আর আমাদের সময় নষ্ট করবেন না।"

—"অবনীবাবুর বাড়ির সেই বিষম গোলমাল থামবার পরেই শুনলুম, ধুপধুপ করে মাটি-কাঁপানো পায়ের শব্দ—যেন একটা মত্ত মাতঙ্গ ধেয়ে আসছে। এত দূরে বারান্দার উপর থেকেও আমি সেই আশ্চর্য পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম! তারপরেই ফটকের কাছে এই না-আলো না-অন্ধকারে আবির্ভূত হল এক বিভীষণ ছায়ামূর্তি।"

—"ছায়ামূর্তি?"

—"ঠিক ছায়ামুর্তি নয়, তবে আবছা আলোয় তাকে দেখাচ্ছিল বিরাট একটা ছায়ার মতো!"

—"বিরাট মানে?"

—"বিরাট মানে মহাপ্রকাণ্ড। মূর্তিটা আমার চোখের সামনে জেগে ছিল এক কি দুই মুহূর্ত মাত্র। কিন্তু তার মধ্যেই আমি দেখেছিলুম, মূর্তির মাথাটা ফটক ছাড়িয়ে উপরে উঠেছে। এই ফটকটা দেখুন। এটা চোদ্দ ফুটের চেয়ে কম উঁচু নয়। তাহলেই বুঝুন, মূর্তিটা বিরাট কিনা?"

হেমন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "সেটা কিসের মূর্তি?"

—"তা বলতে পারব না, স্পষ্ট করে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। মনে তো হল, সে একটা অতিকায় মানুষের দেহ, আর মানুষের মতোই সে সিধে হয়ে হাঁটছিল। কিন্তু তার দেহের উপর দিকটায় যেন কি একটা অবর্ণনীয়, অমানুষিক বিভীষিকার ভাব ছিল, আলোর অভাবে যা দেখতে পাইনি, কেবল অনুভব করতে পেরেছি।"

—"তারপর? তারপর?"

—"মূর্তিটা ঝড়ের মতো ছুটে এল, তারপর খুব সহজেই এই উঁচু ফটকটা এক লাফে পার হল—সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার তাকে যেন গ্রাস করে ফেললে—পথের উপরে শুনলুম কেবল ধুপধুপ শব্দ আর সিংহের গর্জন! ভয়ে অজ্ঞানের মতো হয়ে আমি কাঁপতে কাঁপতে বারান্দার উপর বসে পড়লুম!"

ভূপতিবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "ধ্যেৎ! যত সব বাজে কথা! ফটকের চেয়ে উঁচু মানুষ-দানব, আবার সিংহের গর্জন!"

হেমন্ত বললে, "সিংহের গর্জন আপনিও শুনেছেন, আমরাও শুনেছি। আর পথের উপরে সেই প্রকাণ্ড পদচিহ্ন কি আমরাও দেখিনি?"

ভূপতিবাবুর মুখ ম্লান হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি তিনি বললেন, "চলুন চলুন, আর দেরি নয়! এইবারে বাড়ির ভিতরে ঢোকা যাক।"

চতুর্থ

ভূপতিবাবুর হৃৎকম্প

হেমন্ত শুধোলে, "ভূপতিবাবু, আপনি ফোনে শুনেছিলেন, দশ নম্বর বাড়িতে ডাকাত পড়েছে! কিন্তু এখানে ডাকাত-টাকাতের কথা কেউ তো বললে না!"

ভূপতিবাবু বললেন, "ঠিক কথা! ও সুদর্শনবাবু! বলি, মস্ত বড় নরদানবের কথা চেপে যান, আদালতে ওকথা তুললে হাকিম আপনাকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেবে। আসল ব্যাপারটা ভাঙুন দেখি! এখানে ক'জন ডাকাত হানা দিয়েছিল?"

সুদর্শন বললে, "ডাকাত! কোনও ডাকাতের সাড়া বা দেখা আমি পাইনি।"

—"লুকোবেন না দাদা, খুলেই বলুন না!"

—"না মশাই, ডাকাতের কথা আমি জানি না।"

—"এখানে আর কেউ ডাকাতদের দেখেছে?"

ভিড়ের কেউ বললে না—হ্যাঁ।

—"তবে চলুন বাড়ির ভেতরে।"

একজন কনস্টেবল লোহার রেলিং টপকে বাগানের ভিতরে গেল। ফটকের ভিতর থেকে তালা লাগানো ছিল। তালা ভেঙে ফটক খোলা হল।

প্রথমেই বাগানের মধ্যে দারোয়ানের যে মৃতদেহটা পড়েছিল সকলে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

মৃতদেহের অবস্থা দেখলে শিউরে ওঠে সর্বাঙ্গ। মাথার বেশির ভাগ উড়ে গিয়েছে, ঘাড়টা ভেঙে একদিকে লটকে পড়েছে—দেহের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে মাংস, খুলি ও মস্তিষ্কের রক্তাক্ত টুকরো।

হেমন্ত বললে, "দেখছেন, এখানেও অস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি? একে একবার মাত্র প্রচণ্ড, তীক্ষ্ণ আঘাত করা হয়েছে!"

ভূপতি বললেন, "কিন্তু কিসের আঘাত?"

—"আমার বিশ্বাস, বড় বড় নখওয়ালা থাবার।"

—"থাবার! গাঁজার ধোঁয়া আপনারও মাথায় ঢুকেছে? আপনিও ভাবছেন এখানে সিংহ-টিংহ কিছু এসেছিল?"

—"সিংহনাদ শুনেছি বটে, কিন্তু সিংহ আমি দেখিনি। এ লোকটা যে সিংহেরই থাবায় মরেছে, এমন কথাও আমি জোর করে বলছি না। তবে এর মৃত্যুর কারণ যে কোনও বিষম বলবান জন্তুর নখযুক্ত থাবা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।"

ভূপতি জবাব না দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে চললেন। বাড়ি একেবারে স্তব্ধ—কোথাও একটি মাত্র আলোও জ্বলছে না। আলো জ্বালবার জন্যে পাহারাওয়ালাদের নিয়ে পতিত বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

এত রাত্রে ঘুম ভাঙানোর জন্যে ভূপতি অদৃশ্য ডাকাতদের উদ্দেশ্যে বাছা বাছা গালাগালি বৃষ্টি করতে লাগলেন।

রবীন বললে, "ভাই হেমন্ত, আজকের সব ব্যাপারটাই কেমন অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে না?"

—"কেবল অদ্ভুত নয়, অপার্থিব। বাড়ির কেউ ফোনে পুলিসকে ডেকে বলেছে, এখানে ডাকাত পড়েছে। পাড়ার কেউ কিন্তু ডাকাতদের দেখেনি। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, এখানে কোনও অমানুষিক দানবের আবির্ভাব হয়েছিল। আমরা কিছু দেখিনি বটে, কিন্তু যে অট্টহাসি আর গর্জন শুনেছি, আর যে অদ্ভুত দেহের ধাক্কা খেয়েছি দুঃস্বপ্নেই তা স্বাভাবিক। সত্য কথা বলতে কি রবীন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না—আমারও মাথা দস্তুরমতো গুলিয়ে গিয়েছে!"

বাড়ির ভিতরে ভীত ও বিস্মিত কণ্ঠের সাড়া জাগল।

পতিত দৌড়ে এসে উত্তেজিত স্বরে বললে, "স্যর, স্যর! শিগগির—শিগগির আসুন!"

ভূপতি পায়ে পায়ে পিছোতে পিছোতে বললেন, "মানে? শিগগির যাব কি রকম? না, আমি শিগগির যাব না! আগে কি হয়েছে বলো!"

—"স্যর, ভয়ঙ্কর ব্যাপার?"

ভূপতি তখনও পিছোচ্ছেন। দুই চোখ বিস্ফারিত করে বললেন, "সেই সিঙ্গিটা এখনও বাড়ির ভেতরে আছে? যাও পতিত, দৌড়ে যাও—শিগগির ফোন করে দাও—সেপাই আসুক, বন্দুক আনুক, একটা মেশিন গান আনলেও মন্দ হয় না! হেমন্তবাবু, রবীনবাবু, পালিয়ে আসুন মশাই, পালিয়ে আসুন!"

পতিত বললে, "পালাবেন না স্যর, পালাবেন না। সিঙ্গি-টিঙ্গি কিচ্ছু নেই! খালি লাশ!"

—"লাশ? মানে?"

—"আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যর! লাশ—খালি লাশ—লাসের পর লাশ! বাড়ির উঠোনে লাশ, সিঁড়িতে লাশ, দালানে লাশ, ঘরে লাশ! বাড়িময় লাশ! ভীষণ হত্যাকাণ্ড! একটা লোকও বেঁচে নেই!"

ভূপতি ঢোঁক গিলতে গিলতে বললেন, "ও হেমন্তবাবু, উপায়?"

—"কিসের উপায়?"

—"আমার ভগ্নদূত কি খবর এনেছে শুনলেন তো? বাড়িময় লাশ—খালি লাস! এত লাশ আমি একলা সামলাতে পারব কেন? বড়সায়েবকে খবর পাঠাব নাকি?"

—"আগে নিজেরাই গিয়ে দেখি না, ব্যাপারটা কি?"

ভূপতি ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "ঝাড়ু মারি এই পুলিসের কাজে! এখন পৃথিবীর সমস্ত ভদ্রলোক দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে সুখস্বপ্ন দেখছে, আর আমাদের কিনা, মুদ্দাফরাসের মতো মড়ার গাদা ঘেঁটে মরতে হবে।...বাবা পতিত, তুমি দুই চক্ষু উন্মীলন করে আর একবার চারিদিক ভাল করে দেখে এসো তো! কে জানে সিঙ্গি ব্যাটা আনাচে কানাচে কোথাও ঘুপটি মেরে বসে আছে—শেষটা লাশ দেখতে গিয়ে কি, লাশ হব বাবা?"

—"না স্যর, আমি খুব ভাল করে দেখেছি—সিঙ্গি-ফিঙ্গি কিছু নেই, খালি লাশ! আমি গুণে দেখেছি—সবসুদ্ধু ঊনিশটা!"

—"ওরে-ব্বাপ রে, ঊনিশটা! ডাকাতের দল তাহলে রীতিমতো ভারি ছিল বলো? বাড়ির ভিতরে ঊনিশটা, বাগানে একটা আর রাস্তার আর একটা—কি সর্বনাশ, একরাত্রে এক জায়গায় একুশটা খুন! আমার যে হৃৎকম্প হচ্ছে!"

হেমন্ত অগ্রসর হয়ে বললে, "আসুন ভূপতিবাবু, আর সময় নষ্ট করবেন না।"

বাড়ির মধ্যে ঢুকে যে বীভৎস দৃশ্য দেখা গেল, এখানে তার বিস্তৃত বর্ণনা দিতে চাই না। পতিত একটুও অত্যুক্তি করেনি—বাড়ির সর্বত্র, ঘরে, দালানে, সোপানে, উঠানে বইছে যে রক্তগঙ্গার ঢেউ—কোথাও দারোয়ানের, কোথাও দাস বা দাসীর এবং কোথাও বা পড়ে আছে বাড়ির অন্যান্য লোকের মৃতদেহ! প্রত্যেক দেহই ভয়াবহ রূপে ক্ষতবিক্ষত এবং অনেক দেহেই মুণ্ডের চিহ্নমাত্র বর্তমান নেই।

ভূপতি আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে বললেন, "এতকাল এ লাইনে আছি, কিন্তু এমন অভাবনীয় ব্যাপার কখনও দেখিনি। কখনও শুনিওনি।"

ত্রিতলের একটি ঘরে ঢুকে আবার যা দেখা গেল, তার চেয়ে ভীষণ দৃশ্য কল্পনাও করা যায় না। ঘরের মেঝেয় এমন জায়গা নেই যেখান দিয়ে বইছে না রক্তের প্রবাহ! কেবল কি মেঝেয়? দেওয়ালের—এমনকি ছাদেরও গায়ে গিয়ে লেগেছে রক্তের ফিনকি!

এবং গৃহতলে—এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে মানুষের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ! কোথাও হাত, কোথাও পা, কোথাও দেহের বিভিন্ন অংশ এবং কোথাও চূর্ণবিচূর্ণ মুণ্ড! চেনবারও জো নেই সেটা মানুষের মুণ্ড কিনা!

রবীন বলল, "আমার গা কেমন করছে, আমি চললুম।"

হেমন্ত বললে, "আমারও দেহ সুস্থ নয়। কিন্তু পালালে চলবে না ভাই, এই নৃশংস হত্যাকারীকে ধরতেই হবে!"

ঘরের মেঝের উপরে পড়েছিল টেলিফোনের তার ছেঁড়া রিসিভারটা। সেটা তুলে নিয়ে ভূপতি বললেন, "যাঁর খণ্ড দেহ এখানে পড়ে রয়েছে, তিনিই বোধহয় ফোনে থানায় খবর পাঠিয়েছিলেন।"

হেমন্ত বললে, "আর তিনি ফোন ছাড়বার আগেই হত্যাকারী এসে তাঁকে আক্রমণ করেছিল।"

সুদর্শনও সকলের সঙ্গে উপরে এসেছিল। সে বললে, "এটা অবনীবাবুর শোবার ঘর।"

ভূপতি বললেন, "বলেন কি, তাহলে এগুলো কি অবনীবাবুরই দেহের অংশ?"

হেমন্ত বললে, "খুব সম্ভব তাই। বোঝা যাচ্ছে, অবনীবাবুরই ওপরে হত্যাকারীর আক্রোশ ছিল বেশি! সে তাঁকে কেবল হত্যা করেনি, তাঁর দেহকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছে। লক্ষ্য করে দেখুন, এখানেও কোনও অস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি—অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো যেন দাঁতে কামড়ে আর থাবা মেরে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে! আবার ওইদিকে দেখুন, রক্তের উপরে সেই এক হাতেরও চেয়ে লম্বা পায়ের ছাপ!"

পঞ্চম

অত্যাশ্চর্য হাত

ভূপতি অনেকক্ষণ আগে থেকেই মনে মনে ভড়কে গিয়েছিলেন, কেবল মুখে কিছু ভাঙেননি। কিন্তু এবারে আর সামলাতে পারলেন না, একখানা চেয়ারের উপরে ধপাস করে বসে পড়ে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, "ভাই হেমন্তবাবু, একি সর্বনেশে মামলা আমাদের হাতে পড়ল!"

ঠিক সেই সময়ে বাইরের দালান থেকে পতিত ভয়ার্ত স্বরে বললে, "স্যর শিগগির আসুন!"

একসঙ্গে ভূপতির মুখ চোখ ভুরু ভুঁড়ি হাত পা সব চমকে উঠল! লাফ মেরে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, "ওই রে বাবা, সেরেছে। দরজা বন্ধ করে দিন—দরজা বন্ধ করে দিন!"

হেমন্ত বললে, "দরজা বন্ধ করব কেন?"

—"আরে মশাই, আগে দরজা বন্ধ করুন! পতিত নিশ্চয় সেই সিঙ্গিটাকে দেখেছে!"

শুনেই সুদর্শন রক্তময় মেঝের উপরে ঝাঁপ খেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় সড়াৎ করে ঢুকে পড়ল।

বাহির থেকে পতিত বললে, "সিঙ্গি-ফিঙ্গি কিছু নয় স্যর! সিঙ্গির দেখা পেলে আমি কি আর এখানে থাকি—আমি কি তেমনই কাঁচা ছেলে, স্যর!"

বুকের উপরে হাত দিয়ে বুকের ধুকপুকুনি বন্ধ করবার চেষ্টা করে ভূপতি বললেন, "সিঙ্গি-ব্যাটা নয়? আঃ বাঁচলুম!...পতিত, তোমাকে আগে থাকতে বলে রাখছি, ফের যদি তুমি 'শিগগির আসুন' বলে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠো, তাহলে তোমার নামে আমি রিপোর্ট করব। 'শিগগির আসুন'! না, আমি শিগগির যাব না!"

—"তাহলে স্যর, আপনি ধীরে ধীরেই একবার এদিকে এলে ভাল হয়!"

—"কেন, ওদিকে আবার কি মাথামুণ্ডু আছে?"

—"মাথাও নয় স্যর, মুণ্ডুও নয়। খালি একখানা হাত!"

—"হাত! হাত মানে?"

—"হাত মানে, একখানা অত্যাশ্চর্য হাত!"

—"হাত আবার অত্যাশ্চর্য! নাঃ পতিত, তুমি আমাকে জ্বালালে দেখছি। চলুন হেমন্তবাবু, পতিতবাবুর হুকুম—অত্যাশ্চর্য হাত দেখতে হবে!"

কিন্তু দালানে এসে পতিতের অঙ্গুলি নির্দেশে দেওয়ালের উপর দিকে তাকিয়ে সত্য সত্যই ভূপতির চক্ষুস্থির হয়ে গেল!

মাটি থেকে প্রায় চোদ্দ পনের ফুট উঁচুতে, দেওয়ালের গায়ে রয়েছে একখানা প্রকাণ্ড রক্তমাখা করতলের ছাপ। সে হাতখানা সাধারণ মানুষের হাতের চেয়ে প্রায় আড়াইগুণ বড়!

ঘর্মাক্ত কপাল মুছতে মুছতে ভূপতি ভয়ে ভয়ে কেবল বললেন, "বাপ!"

হেমন্ত বললে, "যে দেহের ওই হাত, সে দেহটা কত উঁচু, কল্পনা করতে পারেন ভূপতিবাবু?"

ভূপতি হতাশভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে করুণস্বরে বললেন, "না। এসব দেখেশুনে আমি কল্পনাশক্তি হারিয়ে ফেলেছি।"

সুদর্শন বললে, "এখন কি আমার কথায় আপনার বিশ্বাস হচ্ছে?"

—"না বলবার শক্তি আমার নেই।"

হেমন্ত বললে, "হাতের আঙুলগুলোর ডগার দিকে তাকিয়ে দেখুন। প্রত্যেক আঙুলের ডগায় একটা করে রক্তের আঁচড়ের মতো রেখা রয়েছে দেখছেন? রেখাগুলোর প্রত্যেকটাও প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা।"

—"দেখছি বটে। কী ওগুলো?"

—"নখের দাগ!"

—"বাস রে বাস! আক্কেল-গুড়ুম বলে একটা কথা শুনেছি, আজ তার মর্ম বুঝতে পারলুম।"

—"কিন্তু বাড়িতে ডাকাত পড়েছে বলে ফোন করা হয়েছিল, তাদের তো কোনও চিহ্নই দেখতে পাচ্ছি না।"

—"মশাই, যা দেখছি তাই-ই কি যথেষ্ট নয়? এর ওপরেও ডাকাতদের চিহ্ন দেখতে চান? বোঝার ওপরে শাকের আঁটি!"

—"কিন্তু ও কথা বলে ফোন করা হয়েছিল কেন, সেটা তো জানা দরকার!"

—"এ প্রশ্নের জবাব দিতেন যিনি, তিনি এখন পরলোকে।"

—"আমার কি সন্দেহ হচ্ছে, জানেন? অবনীবাবু হয়তো নিজেই জানতেন না, কে তাঁকে আক্রমণ করতে আসছে! নিচের তলায় দুমদাম দরজা ভাঙার শব্দ, লোকজনের আর্তনাদ, চিৎকার, হুটোপুটি, একটা অজানা ভৈরব হুঙ্কার শুনে তিনি বোধহয় ভেবেছিলেন, বাড়িতে ডাকাত পড়েছে।"

—"অসম্ভব নয়।"

—"আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার মতো। হত্যাকারী বাড়ির সব লোককে বধ করেছে, সাক্ষ্য দিতে পারে এমন একজনও লোক রেখে যায়নি। তবু যে আমরা কিছু কিছু অনুমান করতে পেরেছি, সে হচ্ছে, দৈবের কৃপা।"

—"আমিও আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। হত্যাকারী দরজা ভেঙেছে, হত্যার পর হত্যা করেছে, কিন্তু কোনও দেরাজ আলমারি বা সিন্দুকে হাত দেয়নি। এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য যদি চুরি না হয়, তবে আর কি হতে পারে?"

—"খুনের কত রকম কারণ থাকে। ঈর্ষা, ব্যক্তিগত শত্রুতা, প্রতিহিংসা, গৃহবিবাদ। দু'দিন পরেই কোনও না কোনও সূত্র পাওয়া যাবেই।"

রবীন বললে, "আমার বিশ্বাস, কোনওরকম সূত্রই পাওয়া যাবে না। ঈর্ষা, ব্যক্তিগত শত্রুতা, প্রতিহিংসা, গৃহবিবাদ—এসবের সঙ্গে থাকে মানুষের যোগাযোগ। কিন্তু আজকের এই আশ্চর্য হত্যাকাণ্ডের ভিতরে মানুষের হাত আমি কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।"

ভূপতি বললেন, "ঠিক বলেছেন রবীনবাবু! ওই হাত! আর ওই পা! একি মানুষের হাত পা? বড় ভাবনায় পড়ে গেলুম মশাই! আমি এখন কি রিপোর্ট লিখি বলুন তো?"

—"কেন, যা দেখলেন আর যা শুনলেন, তাই লিখবেন।"

—"বিলক্ষণ! ভারি পরামর্শ দিলেন তো! আমি যদি রিপোর্টে লিখি, দশ নম্বর কানাইবাবুর লেনে এমন একজন হত্যাকারী এসেছিল, যার দেহ হাতির চেয়ে উঁচু, হাত হচ্ছে এক হাতের চেয়ে বড় আর পা হচ্ছে আঠার উনিশ-ইঞ্চি লম্বা, চিৎকার করে যে সিংহের কণ্ঠস্বরে আর হাস্য করে মানুষের মতো, আর লাফ মেরে উঠতে পারে একতলা ছাদে—তাহলে কাল কি আমার চাকরি থাকবে?... হেঃ! রিপোর্ট লিখব, না ছাই লিখব!"

—"স্যর!"

—"মরছি নিজের জ্বালায় পতিত, তুমি আবার 'স্যর স্যর' কর কেন বাপু?"

—"স্যর, সুদর্শনবাবুর কথাই ঠিক।"

—"মানে?"

—"এখানে এক উন্মত্ত প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়েছিল।"

—"তুমি আমাকে রিপোর্টে ওই কথাই লিখতে বল নাকি?"

—"স্যর, অনেক রকম প্রেতাত্মার গল্প শুনেছি, তারা কেবল মাঝে মাঝে মানুষকে ভয় দেখিয়েই খুশি হয়। কিন্তু আজকের এই প্রেতাত্মাটা উন্মত্ত না হলে—"

—"চোপরাও পণ্ডিত, চোপরাও! তোমার মূল্যবান উপদেশ আমি শুনতে চাই না!"

—"দেখবেন স্যর, দেখবেন! এ খুনের কিনারা করা পুলিসের কর্ম নয়! শেষ পর্যন্ত রোজা যদি ডাকতে না হয়, আমি নাকে খত দেব!"

ষষ্ঠ

দ্বিতীয় হত্যানাট্য

পরের দিনের সকালবেলার কথা। প্রভাতী চা-পান সাঙ্গ হয়েছে। মধু বেয়ারা চায়ের ট্রে নিয়ে গেল।

ইজিচেয়ারের উপরে আড় হয়ে পড়ে হেমন্ত খবরের কাগজখানা টেনে নিলে।

রবীন বললে, "খবরের কাগজের ভিতরে একটু পরে ডুব দিও। আগে একটা জিজ্ঞাসার জবাব দাও।"

হেমন্ত হেসে বললে, "মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। তোমার জিজ্ঞাসাও নিশ্চয় কালকের ঘটনাক্ষেত্রের বাইরে গিয়ে দৌড়তে পারবে না?"

—"না। তোমার মনও কি এরই মধ্যে কালকের ঘটনাক্ষেত্রের বাইরে যেতে পেরেছে?"

—"সেটাকি স্বাভাবিক?"

—"স্বাভাবিক নয় জানি। তাই তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

—"গোলাম হাজির।"

—"ঠাট্টা নয় হেমন্ত। কাল যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতুম না।"

—"আমিও না। কাল যেন আমাদের ঘাড়ে চেপেছিল আরব্য উপন্যাসে কথিত এক আজগুবি রাত্রি। আলাদিনের দেখা পাইনি বটে, কিন্তু তার বন্ধু দৈত্যের পদধ্বনি শুনেছি।"

—"আলাদিনের দৈত্য নরহত্যা করত না।"

—"আলাদিনের হুকুম পেলে করতে পারত।"

—"কিন্তু এখানে আলাদিন কোথায়?"

—"আলাদিন আছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমি এই আধুনিক আলাদিনকে আবিষ্কার করতে পারলে সুখী হব।"

—"কোথায় তাকে পাবে বলে সন্দেহ কর?"

—"একদল সন্ন্যাসীর মধ্যে!"

রবীন সচমকে বললে, "হেমন্ত, অবনীবাবুর মৃত্যুর আগের দিন যে সন্ন্যাসী গুরুভাইদের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়েছিল, তুমি কি তাদেরই সন্দেহ কর?"

—"অল্পবিস্তর করি বৈকি!"

—"তাদের ঠিকানা তুমি জান না।"

—"রবীন, এইবার তুমি বোকার মতো কথা কইলে। মাত্র একজন অজানা খুনি খুব চুপিসাড়ে কাজ সেরে পালিয়ে গিয়েও ধরা পড়ে। একদল সন্ন্যাসীর সন্ধান করা কি বিশেষ শক্ত কথা?"

—"কিন্তু খুনের রাত্রে সন্ন্যাসীদের কেউ দেখেনি। আর ঘটনাক্ষেত্রেও তাদের উপস্থিতির কোনও প্রমাণ নেই।"

—"মানি। আমিও জানি, সন্ন্যাসীদের সন্ধান পেলেই খুনি ধরা পড়বে না। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে খুনের কোনও সম্পর্ক আছে।"

—"সন্দেহের কারণ?"

—"কারণ খুব স্পষ্ট বা মস্ত নয়।"

—"তবু?"

—"প্রথমত সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ঝগড়ার পরের দিনই এই হত্যাকাণ্ড হল কেন? দ্বিতীয়ত, অবনীবাবু থানায় ফোন করে 'আমার বাড়িতে ডাকাত পড়েছে' বলেছিলেন কেন?"

—"তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের কোনও মানে হয় না।"

—"হয়। নিচের তলায় হট্টগোল মারামারি শুনেই অবনীবাবু ভেবেছিলেন তাঁর বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। হঠাৎ তাঁর এরকম ভাববার কারণ কি? আগের দিনে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়েছে, হয়তো তিনি এইরকম আক্রমণেরই আশঙ্কা করেছিলেন।"

—"হতে পারে। কিন্তু তাঁর সে আশঙ্কা অমূলক। সন্ন্যাসীরা তাঁর বাড়ি আক্রমণ করেনি। ঘটনাক্ষেত্রে যার সাড়া, দেখা আর চিহ্ন পাওয়া গেছে, সে যেই হোক—সন্ন্যাসী নয়।"

—"হত্যাকারী যে সন্ন্যাসী এ কথা আমিও বলছি না। আমার বক্তব্য হচ্ছে, অবনীবাবু হয়তো সন্দেহ করেছিলেন, তাঁর উপরে চটে একদল সন্ন্যাসী তাঁকে আক্রমণ করতে এসেছে। আমার অনুমান ঠিক হলে দেখা দরকার, কেন তাঁর মনে এমন সন্দেহ হয়? কেন তাঁর সঙ্গে সন্ন্যাসীদের ঝগড়া হয়েছিল? সুদর্শনবাবুর মুখে শুনলে তো, অন্য অন্য বারে সন্ন্যাসীরা অবনীবাবুর বাড়িতে দশ-পনের দিন না কাটিয়ে যায় না। এবারে কেন তারা এসেই চলে গেল? তারা কি যথার্থ সাধু নয়? তাই কি অবনীবাবু তাদের বিদায় করে দিয়েছিলেন? আমি এইসব প্রশ্নের উত্তর চাই। আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ঝগড়ার পরের দিনেই অবনীবাবু খুন হলেন কেন?"

—"তোমার কথা শুনে এইবারে বুঝেছি, খুনের কিনারা হোক বা না হোক সন্ন্যাসীদের সন্ধান নেওয়া দরকার বটে।"

হেমন্ত অল্পক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "রবীন, তুমি অতিপ্রাকৃত ঘটনা বিশ্বাস কর?"

—"হঠাৎ এমন প্রশ্ন কেন?"

—"বলো না, বিশ্বাস কর কিনা?"

—"কি করে বলব? আমি কোনও অতিপ্রাকৃত—অর্থাৎ অসম্ভব ঘটনা দেখিনি।"

—"কালকের ঘটনা কি অতিপ্রাকৃত নয়?"

—"না হতেও পারে।"

—"কেন?"

—"কালকের ঘটনার উপরে রয়েছে গভীর রহস্যের আবরণ। এ আবরণ সরে গেলে হয়তো দেখা যাবে, সমস্ত ব্যাপারটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক।"

—"অসম্ভব নয়। কিন্তু তুমি অতিপ্রাকৃত ঘটনা বিশ্বাস কর না?"

—"এই বিজ্ঞানের যুগে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।"

—"কিন্তু আমার প্রবৃত্তি হয়।"

—"আশ্চর্য কি, লোকচরিত্র বিচিত্র। চার সহোদরের প্রকৃতি চাররকম হয়।"

—"রবীন, আমি অন্ধের মতো কোনও কিছুতে বিশ্বাস করি না। এ বিশ্বের সর্বত্র যে রহস্যময়, অজ্ঞাত শক্তি বাস করে, আমরা যদি তার সঠিক খবর রাখতে পারতুম, তাহলে প্রত্যেক মানুষই হয়ে উঠত মহামানুষ। 'স্পিরিচুয়ালিজম' নিয়ে তুমি কিছু পড়াশোনা করেছ?"

—"বিশেষভাবে নয়।"

—"এমন অনেক মানুষ আছে, যারা স্পর্শ না করেও ধাতুকে চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে যেতে পারে। কেউ কেউ আগুনের উপর দিয়ে নগ্নপদে হাঁটতে পারে, হাজার হাজার লোক এ ব্যাপার স্বচক্ষে দেখেছে। তারা এসব শক্তি কেমন করে অর্জন করলে?"

—"ও প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না হেমন্ত!"

—"বিলাতের এক সাহেব গেল শতাব্দীতে সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি তোমার আমারই মতন সাধারণ মানুষ—যোগী বা সাধু নন। কিন্তু তাঁর ভিতরে আত্মপ্রকাশ করেছিল প্রকৃতির এক দুর্লভ শক্তি। এই জড়দেহ নিয়েই তিনি শূন্যে বিচরণ করতে পারতেন। ইউরোপের বড় বড় প্রসিদ্ধ লোকের সামনে তিনি শূন্যপথে ঘরের এক জানলা দিয়ে বেরিয়ে, আর এক জানলা দিয়ে আবার ভিতরে এসে ঢুকেছিলেন।"*

—"তোমার কথা শুনে বিস্মিত হচ্ছি।"

—"আমেরিকার এক পরীক্ষাক্ষেত্রে নামজাদা ডাক্তাররা একত্র হয়ে এক সমাধিগ্রস্ত যোগীকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করে বলেছিলেন, তাঁর দেহে জীবনের কোনও লক্ষণ নেই—এমনকি তাঁর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে—আধুনিক বিজ্ঞানের মতে যা মৃত্যুরই নামান্তর। কিন্তু তারপর সমাধিভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই যোগীর দেহে জীবনের পূর্ণলক্ষণ ফিরে এসেছিল। দেখছো রবীন, তুমি যে বিজ্ঞানের দোহাই দিচ্ছ, বিশ্বব্যাপী রহস্যময় শক্তির কাছে সে কতখানি পঙ্গু!"

—"বিজ্ঞানের কাজই হচ্ছে বিশ্বব্যাপী রহস্যময় শক্তিকে মানুষের সামনে পূর্ণভাবে প্রকাশ করা। সুতরাং বিজ্ঞানের দোহাই দেব না কেন?"

---

* এ গল্প নয়, বাস্তবিকই সত্যকথা। ঐ ইংরেজ ভদ্রলোক জনসাধারণের সামনে বারংবার নিজের শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন এবং ইউরোপের অসংখ্য পুস্তকে ও পত্রিকায় সেই বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।—লেখক

—"কেবল বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে কোনও লাভ নেই ভাই, বিজ্ঞানের সত্যিকার ভক্ত নিজের চোখ আর মন সর্বদাই খোলা রাখেন। ভারতবর্ষের অনেক যোগী যে ভূপ্রোথিত হয়ে সমাধিগ্রস্ত হয়ে ত্রিশ-চল্লিশ দিন কাটিয়েছেন, শত শত প্রত্যক্ষদর্শী তার সাক্ষ্য দিতে পারেন। একবার ভেবে দেখো দেখি, চারিদিক অন্ধকার—সমস্ত দেহ ঘিরে বিরাজ করছে ছিদ্রহীন পাতালের মাটি—আর সেই দেহও সমাধিগ্রস্ত, অর্থাৎ পঙ্গু, বিজ্ঞানের ভাষায়, জীবনহীন! তারপরে আলো নেই, বাতাস নেই, জল নেই, খাবার নেই—যার অভাবে জীব বাঁচে না—অন্তত একেলে বিজ্ঞান বলবে, বাঁচা অসম্ভব! ত্রিশ-চল্লিশ দিন পরে সমাধি ভেঙে যোগী কেমন করে অক্ষত আর জীবন্ত দেহ নিয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেন? কোন অজানা রহস্যময় শক্তির আশীর্বাদ তিনি লাভ করেছেন? এসব কি অতিপ্রাকৃত ঘটনা নয়? এসব চোখে দেখলেও কি বিশ্বাস করব না? বিজ্ঞান—অর্থাৎ নব্য বিজ্ঞান এখনও শিশু, এই রহস্যসাগরে মগ্ন হবার শক্তি এখনও সে অর্জন করেনি। কিন্তু প্রাচীন জগতের বিজ্ঞান এসব সত্য বলে জানত আর মানত, কারণ গভীর অনুসন্ধানের ফলে রহস্যলোকের চাবি একবার সে হস্তগত করতে পেরেছিল। আজ সে পুরনো চাবি হারিয়ে গিয়েছে, তোমাদের নূতন চাবি দরজায় আর লাগছে না!"

—"তোমার হঠাৎ এই বক্তৃতার কারণ কি হেমন্ত? কালকের ব্যাপারের মধ্যে তুমি কি অতিপ্রাকৃত কোনও কিছুর খোঁজ পেয়েছ?"

—"খোঁজ আমি কিছুই পাইনি। তবে আপাতত কালকের ঘটনাগুলোকে অসাধারণ বলতে পারি বটে। হয়তো তোমার অনুমানই ঠিক। রহস্যের আবরণ সরিয়ে নিলে কালকের ঘটনাগুলো খুবই সাধারণ হয়ে পড়বে।"

হেমন্ত মুখ বন্ধ করে খুললে খবরের কাগজ। রবীন মধুর উদ্দেশে চেঁচিয়ে আর এক পেয়ালা চা পান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে।

রবীন চা পান করছে, হেমন্ত হঠাৎ অভিভূত কণ্ঠে বলে উঠল, "কি সর্বনাশ, কি সর্বনাশ?"

চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে রবীন জিজ্ঞাসুভাবে বন্ধুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

হেমন্ত খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলেই বললে, "রবীন, কাগজে কালকের ঘটনা বেরিয়েছে।"

—"আমাদের পক্ষে ও তো পুরনো খবর। এ জন্য তোমার অতটা অভিভূত হবার কারণ নেই।"

—"না! আমি অভিভূত হয়েছি, আর একটা খবর পড়ে! অবনীবাবুর হত্যাকারীই কাল রাত্রে আর এক জায়গাতেও আর এক হত্যানাট্যের অভিনয় করেছে!"

—"বল কি, বল কি!"

—"শোনো।" হেমন্ত উচ্চস্বরে খবরটা পড়তে লাগল:

—"দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটিয়াছে দুই নম্বর তালপুকুর স্ট্রিটে।

—"বাড়ির মালিকের নাম বিধুরঞ্জন বসু। তিনি চিরকুমার, বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ। তাঁহার আত্মীয়স্বজন কেহ নাই—অন্তত তাঁহার সঙ্গে কেহ বাস করিতেন না। বাড়িতে থাকিত কেবল একজন পাচক ও একজন বেয়ারা।

"যতদূর জানা গিয়াছে, বিধুবাবুও অবনীবাবুর মতো ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন, তান্ত্রিক পূজা-অর্চনাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান আনন্দ। এবং তাঁহার বাড়িতেও মাঝে মাঝে কোথা হইতে একদল সন্ন্যাসী আসিয়া দিন কয়েকের জন্য রীতিমতো আসর জমাইয়া তুলিতেন!

"গত রাত্রে প্রায় একটার সময় অমাবস্যা ও ব্ল্যাক আউটের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ভীষণ এক গোলমালে প্রতিবেশীদের নিদ্রাভঙ্গ হয়। গোলমাল হইতেছিল বিধুবাবুর বাড়ির ভিতরে। ডাকাত পড়িয়াছে ভাবিয়া প্রতিবেশীরা লাঠি, দা ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ছুটিয়া আসে। তাহাদের মধ্যে ছিলেন ও পাড়ার বিখ্যাত ব্যায়ামবীর ও লাঠিয়াল বিনোদলাল। সর্বাগ্রে সাহস করিয়া তিনিই বিধুবাবুর বাড়ির দরজার নিকটে গিয়া উপস্থিত হন।

"তাহার পর কি হইল, কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। তবে সকলে বলে, হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে মাটি হইতে সতের-আঠার ফুট উপরে দপদপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল ভাঁটার চেয়ে বড় দু'টো তীব্র, ক্রুদ্ধ ও অগ্নিময় চক্ষু, জাগিয়া উঠিল বজ্রধ্বনির মতো প্রচণ্ড সিংহের গর্জন ও তার পরেই খলখল অট্টহাস্য—সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল একটা মর্মভেদী আর্তনাদ। তাহার পর সকলের মনে হইল, যেন একটা মদমত্ত হস্তী পদভরে পৃথিবী কম্পিত করিয়া দ্রুতবেগে কোথায় চলিয়া গেল।

"এই কাণ্ডের পর প্রতিবেশীরা কেহই আর অগ্রসর হইতে ভরসা করিল না। ইতিমধ্যে কে থানায় ফোনে খবর দিয়াছিল, পুলিস আসিয়া পড়িল! পুলিস আসিয়া রাস্তার উপরে সর্বপ্রথমে আবিষ্কার করিল হতভাগ্য যুবক বিনোদলালের মৃতদেহ। কোনও দারুণ হিংস্র জন্তু যেন কাঁধের উপর হইতে তাহার মুণ্ডুটা থাবার এক আঘাতে উড়াইয়া দিয়াছে! বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুলিস দেখিল, নিচের তলায় পড়িয়া রহিয়াছে বিধুবাবুর পাচক ও বেয়ারার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। উপরতলায় শয়নকক্ষের মধ্যে যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে বিধুবাবুর দেহ না বলিয়া, দেহাবশেষ বলা উচিত। কারণ, এই নৃশংস হত্যাকারী অবনীবাবুর মতন বিধুবাবুর দেহকেও খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে!

"কে এই হত্যাকারী? বেশ বুঝা যায়, অবনীবাবু ও বিধুবাবুর হত্যাকারী একই ব্যক্তি। কিন্তু কে সে? একই রাত্রে কেন এই দুই হত্যাকাণ্ড? একদিনে একই ব্যক্তি বা দলের দ্বারা পঁচিশটি নরহত্যা কলিকাতায় কখনও হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। এরপরেও আমরা যদি পুলিসকে অকর্মণ্য বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে কি অন্যায় করা হইবে?

"দুই ঘটনাক্ষেত্রেই সিংহনাদ ও অট্টহাস্য শোনা গিয়াছে। নিহত ব্যক্তিদের দেহ দেখিলেও বুঝা যায়, কোনও প্রকাণ্ড জন্তুর কবলে পড়িয়াই সকলকে মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছে। অট্টহাস্য করিয়াছে হয়তো হত্যাকারীরাই। কিন্তু সিংহনাদের অর্থ কি? হত্যাকারীরা কি কোনও পালিত, পোষমানা সিংহ লইয়া ঘটনাক্ষেত্রে আসিয়াছিল? অনেকে নাকি সন্দেহ করিতেছেন, এই দুই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ভৌতিক ব্যাপারের সম্পর্ক আছে। প্রথম ঘটনাক্ষেত্রে নাকি আশ্চর্য ও প্রকাণ্ড হাত ও পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, ওসব হইতেছে পুলিসের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের জন্য কৌশলী হত্যাকারীদের ছলনামাত্র। ওই হাত ও পায়ের ছাপ হইতেছে নকল ছাপ।

"দুই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। দুই স্থলেই কোনও মূল্যবান দ্রব্য চুরি যায় নাই। সুতরাং হত্যার কারণ অর্থলোভ নয়।"

রবীন স্তম্ভিতপ্রায় স্বরে বললে, "ভয়ানক! এর ওপরে কোনওরকম মত প্রকাশ করবার শক্তি আমার নেই।"

হেমন্ত বললে, "বন্ধু খবরের কাগজের এই রিপোর্টারটি তোমার দলভুক্ত হলেও তোমার চেয়ে উচ্চশ্রেণীর মনুষ্য।"

—"কি রকম?"

—"ইনি তোমার দলের লোক, কারণ অতিপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস করেন না। আবার ইনি তোমার চেয়ে উচ্চশ্রেণীরও বটে, কারণ হরেকরকম মূল্যবান মত প্রকাশ করেছেন।"

—"মূল্যবান মত?"

—"যথা, পুলিস অকর্মণ্য, অট্টহাসি হেসেছে হত্যাকারীরা, তাদের পরিচালনায় হত্যা আর সিংহনাদ করেছে পোষা সিংহ, সেই হাত আর পায়ের ছাপ জাল—পুলিসের চোখে ধুলো দেবার জন্যে!"

—"চুলোয় যাক রিপোর্টারের গবেষণা। হেমন্ত, এখন তুমি কি করতে চাও?"

—"আপাতত ফোনের কাছে যেতে চাই—ওই শোনো ঘণ্টা বাজছে।"

টেলিফোন ছেড়ে ফিরে এসে হেমন্ত বললে, "অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার সতীশবাবুর টনক নড়েছে, তিনি নাকি সোজা আমার বাড়ির দিকেই ধাবমান হয়েছেন!"

সপ্তম

কড়িকাঠের সার্থকতা

হেমন্তের বৈঠকখানাতে ঢুকেই সতীশবাবুর প্রথম কথা—"নতুন খবরটাও শুনেছেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"কি কাণ্ড!"

—"কল্পনাতীত।"

—"ভুতুড়ে বললেও চলে।"

—"কেন?"

—"হাতির মতো উঁচু জীব, দানব-মানুষের হাত-পায়ের ছাপ, মাটি থেকে সতের-আঠার ফুট ওপরে অগ্নিময় চক্ষু, খলখল অট্টহাস্য, সিংহনাদ, আঁচড়ে কামড়ে পঁচিশটা নরহত্যা—এসব কী?"

—"আমায় যদি জিজ্ঞাসা করেন, জবাব পাবেন না। কারণ, আমিও হতভম্ব হয়ে গিয়েছি।"

—"আপনি হতভম্ব হলে তো চলবে না হেমন্তবাবু! খবরের কাগজওয়ালারা পুলিসের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করেছে। আমরা যে আপনারই সাহায্য চাই।"

—"ভূপতিবাবু কি বলেন?"

—"ভূপতির কথা ভুলে যান! সে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়েছে! বলে, ভুত-প্রেতের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে না—তা চাকরি থাক আর যাক!"

—"ভূপতিবাবুর সহকারি পতিতবাবু উপদেশ দিয়েছেন, রোজা ডাকবার জন্যে।"

—"পতিত? এর মধ্যেই ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাখিল করে সে তিনমাসের ছুটি চেয়েছে।"

—"তাই নাকি?"

—"তার অসুখটা ভান। আসল কথা, সে এ মামলা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে রাজি নয়।"

—"আমি কিন্তু ঠিক তার উল্টো। আমি চাই এ মামলার রহস্যটা ভাল করে বুঝতে। আপনার অবস্থা কি রকম?"

—"সুবিধের নয়। তাই তো আপনার দরজায় ধর্না দিতে এসেছি।"

—"আমাকে লজ্জা দেবেন না সতীশবাবু! নিজের তুচ্ছতার কথা আমি ভাল করেই জানি।"

—"আপনার তুচ্ছতা অনেক শ্রেষ্ঠতারও চেয়ে লোভনীয়।"

—"থাক সতীশবাবু, থাক! বিনয়ে আপনাকে হারাবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করে আর সময়ের অপব্যবহার করব না। এইবার কাজের কথা হোক। দ্বিতীয় ঘটনাক্ষেত্রের কি কি সূত্র পেয়েছেন?"

—"সূত্র? যা পেয়েছি, প্রথম ঘটনাক্ষেত্রেও সেইরকম সব সূত্রই পাওয়া গিয়েছে।"

—"বলুন দেখি, পরশু দিন একদল সন্ন্যাসী বিধুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কি না?"

সতীশবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "আপনি কি এর মধ্যেই ঘটনাস্থলে ঘুরে এসেছেন?"

—"না।"

-"তবে কেমন করে জানলেন?"

—"অনুমানে।"

—"আশ্চর্য আপনার অনুমানশক্তি। হ্যাঁ, বিধুবাবুর প্রতিবেশীদের মুখে খবর পেয়েছি, ঘটনার আগের দিন একদল হিন্দুস্তানি সন্ন্যাসী বিধুবাবুর বাড়িতে এসেছিল। কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই তারা আবার চলে যায়! হ্যাঁ, হেমন্তবাবু, আপনি কি এই সন্ন্যাসীদের সন্দেহ করেন? না, না, অসম্ভব। ঘটনার সময়ে কেউ তাদের দেখেনি। যে এসেছিল, যার সাড়া আর চিহ্ন পাওয়া গেছে, সে তো এক বিভীষণ মূর্তি! সে মানুষ, না দানব, না জন্তু—কিছুই ঠিক করে বলবার উপায় নেই!"

হেমন্তের ভাব দেখে মনে হয়, সতীশবাবুর কোনও কথাই তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করছিল না, দুই চোখ মুদে সে যেন কি গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে!

সতীশবাবু বললেন, "বিধুবাবুর ঘর থেকে একটা জিনিস পেয়েছি হেমন্তবাবু!"

—"কি বললেন?"

—"বিধুবাবুর একখানা ডায়েরি পেয়েছি।"

সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে হেমন্ত ডায়েরিখানা গ্রহণ করলে। দুই এক পাতা উল্টে বললে, "যাদের ডায়েরি লেখার অভ্যাস আছে, আমি তাদের ভালবাসি। পুলিসের বহু সমস্যার সমাধান করতে পারে এই ডায়েরি।" আরও কয়েকখানা পাতার উপরে চোখ বুলিয়ে বললে, "ওরে মধু, সতীশবাবুকে চা আর খাবার দিয়ে যা! ভগবানের ইচ্ছা নয় যে, শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ অলস হয়ে বসে থাকে। আমি পড়ি ডায়েরি, আর সতীশবাবু নিযুক্ত থাকুন পানাহারে। কি বল রবীন?"

—"আর আমি?"

—"তুমি একবার আমার দিকে, আর একবার সতীশবাবুর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে সময় কর্তন কর। যার যা কাজ।"

—"তার মানে তুমি বলতে চাও, আমি হচ্ছি নির্বোধ, আর সতীশবাবু হচ্ছেন পেটুক?"

কিন্তু হেমন্ত আর কিছু বলতে চাইলে না, হেঁটমুখে একমনে ডায়েরির পাতার পর পাতা ওল্টাতে লাগল।

চা আর খাবার এল। রবীন খবরের কাগজখানা টেনে নিলে। চায়ের পেয়ালা আর খাবারের থালা খালি করে সতীশবাবু ফিরে দেখলেন, হেমন্ত হাঁ করে এক দৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে আছে।

সতীশবাবু হেসে ফেলে বললেন, "হাতে বই, চোখ কড়িকাঠে। আপনি উচ্চশ্রেণীর পাঠক!"

—"যা পড়বার, পড়েছি। এখন আমি ভাবছি—কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমার চিন্তাশক্তি বাড়ে।"

—"জানা রইল। এবারে আমিও এই পদ্ধতি পরীক্ষা করব। কিন্তু আপনার চিন্তাশক্তি বাড়াবার প্রয়োজন হল কেন?"

—"ডায়েরিখানা পড়েছেন?"

—"না। এখনও সময় পাইনি।"

—"তাহলে এই অংশটুকু শুনুন।"

হেমন্ত পড়তে লাগল :

"না, না, অসম্ভব—সম্পূর্ণ অসম্ভব! গুরুর ইচ্ছা হয়েছে বলে পাপাচার সমর্থন করতে পারব না। একজটা স্বামীজি বলেছিলেন, আমাদের গুরুভক্তি তিনি পরীক্ষা করবেন। মহাকালী নাকি স্বপ্নে তাঁকে আদেশ দিয়েছেন, এক বৎসরকাল ধরে প্রতি অমাবস্যায় তিনি একটি করে নরবলি চান। গুরুদেব তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর ভেতর থেকে বারজনকে বেছে নিয়ে বললেন, 'তোমাদের প্রত্যেককে একটি করে বলির জীব সংগ্রহ করতে হবে। মহাকালীর ইচ্ছা পূর্ণ করলে আমিই যে কেবল পূর্ণসিদ্ধি লাভ করব, তা নয়; আমার অনুগ্রহে তোমরাও দৈবশক্তির অংশ লাভ করবে!' গুরুদেবের অন্যদেশীয় শিষ্যেরা সম্মত হল, কিন্তু আমরা তিনজন বাঙালি—আমি, অবনী আর শক্তিপদ—দৃঢ় প্রতিবাদ না জানিয়ে পারলুম না। গুরুদেব ক্রুদ্ধ হলেন। আমরা তিনজনেই একবাক্যে বললুম, 'আমরা নরহত্যায় সাহায্য করতে পারব না। এমন কি, গুরুদেব যদি এই নিষ্ঠুর আর অন্যায় সংকল্প পরিত্যাগ না করেন, তাহলে আমরা

পুলিসে খবর দিতেও বাধ্য হব।' গুরুদেব শাসিয়েছেন, যোগবলের দ্বারা তিনি আমাদের সর্বনাশ করবেন। আমরা কিন্তু তাঁর শাসানি গ্রাহ্য না করে কলকাতায় চলে এসেছি।''

সতীশবাবু সবিস্ময়ে বললেন, ''আশ্চর্য কথা! কে এই ভয়ানক গুরু!''

—''তার নাম আছে বটে, ধাম নাই।''

—''ভারতবর্ষে এখনও এমন ধর্মোন্মাদ আছে?''

—''ভারতবাসী এখনও অতীতকে ভুলতে পারেনি। ভাল করে খোঁজ নিলে দেখবেন, অশিক্ষিতদের তো কথাই নেই, অধিকাংশ শিক্ষিতদের মনেও প্রাচীন সংস্কারের ধারা এখনও অল্পবিস্তর মাত্রায় বর্তমান আছে।''

—''মানি। কিন্তু এ যে একেবারে চরম!''

হেমন্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। খানিক পরে বললে, ''সতীশবাবু, আমি সূত্র পেয়েছি!''

—''পেয়েছেন?''

—''আজ্ঞে হ্যাঁ। অন্তত সূত্রের একটা দিক। যদিও সূত্রের অন্য প্রান্ত আছে এখনও নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে।''

—''তবেই তো!''

—''নির্ভয় হোন সতীশবাবু! মামলাটা যতই জমকালো আর চমকদার হোক, একটা হেস্তনেস্ত করতে বোধহয় বেশি বেগ পেতে হবে না। সূত্রের একদিক যখন হাতে পেয়েছি, তখন অন্য প্রান্তে যতই অন্ধকার থাক, এই সূত্রের খেই ধরে অন্ধের মতো যথাস্থানে গিয়ে হাজির হতে পারব।''

—''তাহলে আপাতত আমাদের কর্তব্য কি?''

—''শক্তিপদকে আবিষ্কার করুন।''

—''শক্তিপদকে! কেন?''

—''মাথা স্থির করে একটু ভেবে দেখুন। অবনী, বিধু আর শক্তিপদ হচ্ছে কোনও দুরাচার তান্ত্রিক গুরুর বিদ্রোহী শিষ্য। গুরু শাসিয়েছে এই তিন বিদ্রোহী চ্যালাকে শাস্তি দেবে বলে। তিনজনের মধ্যে দুইজনকে একরাত্রেই রহস্যময় উপায়ে পথ থেকে সরানো হয়েছে, বাকি রইল একজন মাত্র, আর সে হচ্ছে শক্তিপদ। খুব সম্ভব, সে এখনও ইহলোকেই বিদ্যমান আছে, কারণ তার মৃত্যুর খবর এখনও পাওয়া যায়নি। সতীশবাবু, এই ডায়েরি আমাদের সকল সন্দেহ ঘুচিয়ে দিয়েছে! জাগ্রত হোন, শক্তিপদকে আমাদের পাওয়া চাই-ই চাই! সেই হবে আমাদের অকূল পাথারের কাণ্ডারী!''

সতীশবাবু বিশেষ জাগ্রত হয়েছেন বলে মনে হল না। বললেন, ''শক্তিপদকে খুঁজে বের করতে গেলে সময়ের দরকার। ইতিমধ্যেই সে যে খুনিদের খপ্পরে গিয়ে পড়বে না, এমন কথা কে বলতে পারে?''

—''কেউ বলতে পারে না সতীশবাবু, কেউ বলতে পারে না!''

—''তার চেয়ে আগে এই নরবলির ভক্ত, বদমাইশ গুরুর সন্ধান করা হোক না কেন? একেবারে গোড়ায় কোপ মারাই কি ঠিক নয়?''

—"এখনও সময় হয়নি। তারপর দেখুন—প্রথমত, আমরা গুরুমশাইয়ের ঠিকানা পর্যন্ত জানি না। দ্বিতীয়ত, সে এখনও নরবলি দিয়েছে বলে প্রমাণ নেই। সুতরাং ও অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, কলকাতার এই দু'টো মহা হত্যাকাণ্ডের জন্যেও তাকে বা তার দলকে বন্দী করবার মতো প্রমাণও আমরা পাইনি। তবে তাকে লক্ষ্য করে আমাদের কি লাভ হবে?"

—"আপনার কথা যুক্তিসঙ্গত বটে।"

—"কিন্তু শক্তিপদকে যদি আমরা হাতে পাই, গুরুকে হস্তগত করতে বেশি বিলম্ব হবে না।...আচ্ছা, রসুন—রসুন, শক্তিপদ লাভ করবার একটি সহজ উপায় আমার মাথায় আছে। হ্যাঁ, সেই ঠিক! রবীন, কাগজ-কলম নিয়ে বোসো। যা বলি, লিখে নাও!'

রবীন কথামতো কাজ করলে। হেমন্ত বলতে লাগল :

"শক্তিপদবাবু,

আপনি অবনীকান্ত রায়চৌধুরী ও বিধুভূষণ বসুর গুরুভাই। আপনার মাথার উপরে বিপদের খাঁড়া ঝুলছে। যদি নিজের প্রাণরক্ষা করতে আর বন্ধুহত্যার প্রতিশোধ নিতে চান, তাহলে বিনা বিলম্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। ইতি—"

তলায় রইল হেমন্তের নাম ও ঠিকানা।

রবীন বললে, "তুমি বোধহয় চিঠিখানা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় প্রকাশ করতে চাও?"

—"হ্যাঁ। সমস্ত বাংলা কাগজে।"

—"এ বিজ্ঞাপন হত্যাকারীদের চোখে পড়বে। তারাও সাবধান হয়ে যাবে।"

—"ডায়েরিতে দেখছি আর সুদর্শন প্রভৃতিরও মুখে শুনেছি, সন্ন্যাসীরা হিন্দুস্তানি। সম্ভবত তারা বাংলা পড়তে জানে না। তবে তুমি যা বললে, সে সম্ভাবনাও যে নেই তা নয়। তবু দৈবের উপরে নির্ভর করলুম, হয়তো দৈব আমাদের সহায় হবে।"

সতীশবাবু প্রশংসা ভরা স্বরে বললেন, "হেমন্তবাবু, আপনি এত তাড়াতাড়ি চিন্তা করতে আর পথ বাতলাতে পারেন যে, চমৎকৃত হতে হয়।"

হেমন্ত হাতজোড় করে বললে, "দোহাই সতীশবাবু, কথায় কথায় আমাকে এত উঁচু স্বর্গে তুলবেন না মশাই। আমি মর্ত্যের মানুষ। যদি মাথা ঘুরে যায়, পড়ে গতর চূর্ণ হয়ে যাবে!"

অষ্টম

ভাবেরও মূর্তি আছে

দিন তিনেক কাটবার পর।

হেমন্ত পাঠাগারের এককোণে একটি প্রকাণ্ড সোফার সুগভীর কোলের মধ্যে প্রায় যেন বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে একখানি পুস্তকপাঠে নিযুক্ত ছিল। তার সামনের গোল টেবিলের এবং পদতলের কার্পেটের উপরেও ছোট বড় মাঝারি ও রোগা মোটা দোহারা হরেক আকারের আর হরেক রঙের গ্রন্থ ছড়ানো রয়েছে।

রবীন ঘরের ভিতরে ঢুকে হেমন্তকে প্রথমে খুঁজেই পেলে না। সে আপন মনেই বললে, "তাই তো, বাড়ির কোথাও নেই! বন্ধু আমার যাত্রা করলেন কোন সিন্ধুপারে?"

—"কোথাও নয়! আপাতত বন্ধু তোমার স্তম্ভিত হয়ে আছে তোফা আরামে সোফার অন্তরালে।"

—"ওখানে! চোরের মতো চুপিচুপি কি করছ হে?"

—"প্রেতবিদ্যাচর্চা।"

—"প্রেতবিদ্যা—অর্থাৎ স্পিরিচুয়ালিজম? শরীরী তুমি, অশরীরীদের নিয়ে হঠাৎ মাথা ঘামানোর কারণ কি?"

—"কথায় কথায় তুমি বড্ড কারণ জানতে চাও রবীন।

মনে করো শেষের সেদিন কি ভয়ঙ্কর ছাঁদ
তুমি রইবে চুপটি করে, অন্যে করবে সিংহনাদ!

তারপর? সোনার না হোক—ননীর দেহ পুড়বে চিতার আগুনে। তারপর তোমাকে—আমাকে—সকলকেই হতে হবে অশরীরী। কাজেই শরীরটা বজায় থাকতে থাকতেই অশরীরীদের রহস্য একটু ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করছি।"

—"সাধু! কিন্তু কি বুঝছ?"

—"বুঝছি অনেক কিছুই। তবে একটা বড় কথা এই যে, শরীর নষ্ট হলে আত্মা অশরীরী হয় বটে, কিন্তু দরকার হলে সে আবার অস্থায়ীভাবে শরীর ধারণ করতে পারে।"

—"এইসব রাবিশে তুমি বিশ্বাস কর?"

—"বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি ভাই!" হেমন্ত একখানা মস্ত বড় বই টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে কতগুলো সচিত্র পাতা উল্টে বললে, "এগুলো কি দেখছ?"

—"ছবি।"

—"ছবি বটে, কিন্তু ফোটোগ্রাফ। প্রেতাত্মাদের ফোটো।"

—"জাল!"

হেমন্ত চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে উঠে বসল। রীতিমতো ক্রুদ্ধস্বরে বললে, "জাল? তুমি কি বিচার করে এ কথা বলছ? প্রেততত্ত্বের কী জান তুমি?"

—"কিছু না ভাই, কিছু না! জানতে চেও না। প্রেততত্ত্বে আমার বিশ্বাস নেই।"

—"তুমি খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাস কর?"

—"না।"

—"তুমি খ্রিস্টধর্মকে জাল মনে কর?"

—"না।"

—"কেন? তুমি তো খ্রিস্টধর্ম বিশ্বাস কর না?"

—"বিশ্বাস না করা এক কথা, জাল বলা আর এক কথা। খ্রিস্টধর্মের ভালমন্দ জানি না বলেই বিশ্বাস করি না।"

—"তবে প্রেততত্ত্বে তোমার বিশ্বাস নেই বলে এই ফোটোগুলোকে জাল বললে কেন?"

রবীন অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে রইল।

হেমন্ত বললে, "স্যর উইলিয়ম ক্রুকস, স্যর অলিভার লজ, স্যর কন্যান ডইল, ওয়ালেস, ফ্লামেরিয়ন আর স্টেড প্রমুখ পৃথিবীবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক, জ্যোতির্বিদ, দার্শনিক আর লেখকদের মতো পণ্ডিত লোকেরাও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রেততত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলে বুদ্ধি বা বিদ্যা কিছুরই পরিচয় দেওয়া হয় না। যা জান না, তাকে অবহেলা কোরো না। ও বাহাদুরি নয়, ও মূর্খতা।"

—"আমার দু' অক্ষরে একটিমাত্র কথার ওপরে তোমার অসংখ্য অক্ষরের এত বড় বক্তৃতা হচ্ছে, সানকির ওপরে বজ্রাঘাতের মতো। বেশ ভাই, অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা করো। ...কিন্তু যদি রাগ না কর, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

—"অনায়াসে।"

—"প্রেততত্ত্ব নিয়ে এত গভীর আলোচনা কেন?"

—"আমিও দেখতে চাই, কত ভাবে কত উপায়ে প্রেতাত্মারা স্থূল শরীর লাভ করতে পারে।"

—"দেখে তোমার লাভ।"

—"জ্ঞান।"

দু'জনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর হেমন্ত ধীরে ধীরে বললে, "প্রেততত্ত্ববিদরা আর একটা কথা বলেন, তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে রবীন।"

—"কি কথা?"

—"প্রত্যেক ভাব বা মানসিক চিন্তা হচ্ছে বস্তু।"

—"বুঝলুম না।"

—"প্রত্যেক ভাব বা মানসিক চিন্তার এক একটা নিজস্ব রূপ আছে। সেইসব রূপকে চোখের সামনে দেখানো যায়।"

—"আরও পরিষ্কার করে বলো। এসব বিষয়ে আমি হচ্ছি শিশুর মতো নির্বোধ।"

—"তোমাকে বোঝাবার জন্যে আমি খুব সহজ একটা উপমা দিচ্ছি। ধর, লক্ষ্মীদেবী। এই দেবীটি হিন্দুর সংসারে নিত্য পূজা পান বটে, কাব্যেও এঁর অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়, এঁকে স্বচক্ষে কেউ দেখেছে বলে শুনিনি। প্রেততত্ত্ববিদদের মত মানলে বলতে হয়, লক্ষ্মীদেবীকে স্থূলশরীরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করা যায়।"

—"কি বলছ হেমন্ত!"

—"লক্ষ্মীদেবীর একটি চিন্তার বা ভাবের প্রতিমা প্রত্যেক হিন্দুর মনেই বিরাজ করে। মানস চক্ষে সেই ভাবপ্রতিমা দেখে ভক্ত করে পূজা, কবি আঁকে শব্দছবি, শিল্পী গড়ে মূর্তি। ভক্তি বা শিল্পের রাজ্যে বাস্তবতা নেই—যথার্থ জীবন নেই। কিন্তু প্রেততত্ত্ববিদরা বলেন, আমরা ইচ্ছা করলে গভীর ধ্যান বা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা লক্ষ্মীদেবীকে শরীরিণী আর জীবন্ত করে তুলতে পারি। তিনি তখন কথা কইবেন, চলে বেড়াবেন, আমাদের স্পর্শ করবেন!"

—"রক্ষে কর ভাই, এসব কথা আমার মাথায় ঢুকছে না।"

—"কেন ঢুকবে না, পাঁকেও ফোটে পদ্মফুল।"

—"তার মানে, তুমি বলতে চাও আমার মাথাটি গোবর ভরা?"

—"যা বোঝো তাই।...রবীন, পাশ্চাত্য প্রেততত্ত্ববিদদের কথা ছেড়ে দাও, আমাদের শাস্ত্রকারদেরও কি এই মত নয় যে, সিদ্ধসাধকরা ধ্যানশক্তির দ্বারা মানসিক দেব-দেবতার মূর্তিকে বাইরের স্থূলচক্ষে জীবন্ত অবস্থায় দেখতে পান? তা যদি তাঁরা দেখতে না পেতেন, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি শত শত মহাজ্ঞানী সাধক যুগে যুগে কিসের পিছনে ছুটে নিজেদের সারাজীবন কাটিয়ে দিয়ে গিয়েছেন? আমার দৃঢ়বিশ্বাস, নাটোরের মহারাজা রামকৃষ্ণ, সাধক রামপ্রসাদ, একালের রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি বাইরের পৃথিবীতেই স্বচক্ষে জীবন্ত কালীদেবীকে দর্শন করেছেন!"

রবীন নাচারভাবে বললে, "তোমার কথার প্রতিবাদ করতে চাই না। কিন্তু যখন আমরা সাধক নই—কখনও হতেও পারব বলে মনে হয় না, তখন ওসব অজানা ব্যাপার নিয়ে তর্ক করবারও দরকার নেই। তুমি বললে, আমি শুনলুম—ব্যস, ফুরিয়ে গেল।"

—"ফুরিয়ে যায় না ভাই, ফুরিয়ে যায় না! অজানাকে জানবার চেষ্টাই হচ্ছে মানুষের প্রধান ধর্ম। অজানাকে জানবার চেষ্টা না করলে মানুষ আজ সভ্য হত না।"

মধু বেয়ারা ঘরে ঢুকে বললে, "একটি বাবু ডাকছেন।"

—"কেন? কি নাম?"

—"কেন তা জানি না, তবে নাম বললেন, শক্তিপদ মজুমদার।"

এক লাফে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে হেমন্ত বললে, "শক্তিপদ? যা, যা, এখানে ডেকে আন্!"

রবীন বললে, "শক্তিপদবাবুকে ধন্যবাদ! প্রেততত্ত্বের কবল থেকে নিস্তার পেলুম!"

নবম

ভয়াবহ মৃত্যুদূত

ঘরের মধ্যে যে লোকটি প্রবেশ করলে তার বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। রং শ্যাম, দেহ দোহারা, মাথায় কাঁচা পাকা চুল, পরনে চাদর, পাঞ্জাবি, কাপড়, ক্যাম্বিসের জুতো। চেহারায় উল্লেখযোগ্য কিছু নেই, দশজনের ভিড়ে হারিয়ে যায় অনায়াসেই। কিন্তু তার হাতের লাঠিগাছা উল্লেখযোগ্য, এত মোটা লাঠি নিয়ে ভদ্রলোকেরা পথে বেরোয় না।

হেমন্ত তার হাতের লাঠির দিকে চোখ রেখে বললে, "আপনিই শক্তিপদবাবু?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। হেমন্তবাবু কার নাম?"

—"আমার।"

—"কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন আপনি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। বসুন। লাঠিগাছা দিন—ঘরের কোণে রেখে দিই।"

শক্তিপদ ইতস্তত করলে।

হেমন্ত মুখ টিপে হেসে বললে, "ভয় নেই, এখানে আপনার আত্মরক্ষা করবার দরকার হবে না। শক্তিবাবু, কার ভয়ে আপনি অত বড় গুপ্তি নিয়ে পথে বেরিয়েছেন?"

শক্তিপদ প্রথমে চমকে উঠল। একটু চুপ করে থেকে মৃদুস্বরে বললে, "দিনকাল ভাল নয়, রাস্তায় আলো থাকে না। ফিরতে হয়তো সন্ধে উতরে যাবে। তাই—"

—"বুঝেছি। কিন্তু শক্তিবাবু, যাদের ভয়ে আপনি অস্ত্রধারণ করেছেন, ওই গুপ্তি দিয়ে তাদের ঠেকাতে পারবেন কি?"

শক্তিপদর মুখে ফুটল অতি করুণ ভাব। আস্তে আস্তে বললে, "আপনি কে?"

—"আপনার বন্ধু।"

—"কিন্তু আপনাকে তো আমি চিনি না।"

—"আমিও আপনাকে চিনি না, তবু আপনার গুপ্তকথা জানি।"

—"জানেন? কি করে জানলেন? এ কথা জানতেন শুধু আমার দুই বন্ধু।"

—"যদি বলি তাঁদের কারুর কাছ থেকেই আপনার কথা আমি জানতে পেরেছি?"

—"অসম্ভব।"

—"এ ক্ষেত্রে অসম্ভবও সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আপনার সব কথা এখনও আমি জানতে পারিনি—যা শোনবার জন্যে আপনাকে এখানে আমন্ত্রণ করেছি। আমাকে যদি বিশ্বাস না করেন, তাহলে খুব শীঘ্রই আপনাকেও অবনীবাবু আর বিধুবাবুর অনুসরণ করতে হবে।"

শক্তিপদ শিউরে উঠল! বললে "আমাকে রক্ষা করবার শক্তি যে আপনার আছে, এ কথা কেমন করে বিশ্বাস করব?"

—"বিশ্বাস করা, না করা আপনার হাত। তবে সন্ন্যাসীদের ষড়যন্ত্র থেকে আমিও যদি আপনাকে বাঁচাতে না পারি, তাহলে কলকাতায় আর কেউ বাঁচাতে পারবে বলে মনে হয় না।"

বিপুল বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে শক্তিপদ বললে, "সন্ন্যাসীদের কথাও আপনি জানেন?"

—"আপনার নরবলিভক্ত গুরুজিরও পরিচয় জানতে আমার বাকি নেই।"

শক্তিপদ আর ইতস্তত করলে না, একেবারে দাঁড়িয়ে উঠে দুই হাতে হেমন্তের দুই হাত চেপে ধরে আকুলকণ্ঠে বললে, "তাহলে আমাকে রক্ষা করুন!"

—"সেইজন্যেই আপনাকে ডেকেছি। কিছু না লুকিয়ে সমস্ত কথা আমাকে খুলে বলুন। কোনও ভাবনা নেই। আমি সত্যই আপনার বন্ধু।"

ইতিমধ্যে সতীশবাবুও এসে হাজির হলেন। শক্তিপদর পরিচয় পেয়ে একখানা আসন গ্রহণ করে কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শক্তিপদ চেয়ারের উপরে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বলতে আরম্ভ করলে :

—"অবনী, বিধু আর আমি—তিনজনেই বন্ধু। আমাদের তিনজনের রুচি আর প্রকৃতি প্রায় একরকম বলে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কও হয়ে উঠেছিল বেশি ঘনিষ্ঠ। আমাদের ভিতরে অবনী ছিল সবচেয়ে ধনবান। বিধুর আর আমার অর্থভাণ্ডার অফুরন্ত না হলেও ভাল ভাবে সংসার চালিয়ে অপব্যয় করবার ক্ষমতা আমাদেরও ছিল যথেষ্ট।

কিন্তু সাধারণ বিলাসী ধনীর মতো আমরা অর্থের অপব্যয় করতুম না। ছেলেবেলা থেকেই আমাদের তিনজনের ধর্মকর্ম আর সাধু-সন্ন্যাসীদের দিকে প্রাণের টান ছিল অত্যন্ত। সৎগুরুর সন্ধান করবার জন্যে আমরা প্রায়ই দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তুম। তীর্থক্ষেত্রে সাধুদের ভিড় হয় বলে আমরা ভারতের তীর্থে তীর্থে ঘুরে এসেছি বারংবার।

প্রায় পাঁচ বছর আগে বিন্ধ্যাচলে একজটা স্বামী নামে এক বামাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। বিপুল দেহ, দীপ্ত চক্ষু, বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর। তিনি বাক্যসংযমে অভ্যস্ত—প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় মিনিট কয়েকের জন্যে দু'চারটি মাত্র বাক্যব্যয় করেন। তাঁর মধ্যে এতটুকু শান্তভাব ছিল না, অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজ—দেখলে ভক্তির চেয়ে ভয় হয় বেশি।

সকলেরই মুখে শুনলুম, তিনি সিদ্ধপুরুষ, শবসাধনা করেছেন, শ্মশানকালীর বর পেয়েছেন, জলে-স্থলে-শূন্যে তাঁর অবাধ গতি। তাঁর এমন কয়েকটি কার্যকলাপও দেখবার সুযোগ পেলুম, সত্যসত্যই যা অলৌকিক বলে বিশ্বাস হল।

তাঁর শিষ্যের সংখ্যা হয় না। কি এক মর্মভেদী দৃষ্টির আকর্ষণে আমরা তিনজনেও তাঁর বশীভূত হয়ে শিষ্যের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে ফেললুম।

তারপর প্রতি বৎসরেই তিন চারবার করে আমরা তাঁর পায়ের ধুলো নিতে গিয়েছি। ভারতের কয়েকটি তীর্থক্ষেত্রে অজস্র অর্থব্যয় করে গুরুদেবের জন্যে নূতন নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছি। প্রণামীর জন্যেও তাঁর পায়ে যে কত টাকা ঢেলেছি, সে কথা ভাবলেও আজ দুঃখ হয়। গুরুদেবের আদেশ বহন করে বারংবার দলে দলে গুরুভাই সন্ন্যাসীরা বেশ কিছুকালের জন্যে আমাদের বাড়িতে এসে অতিথি হয়ে রাজভোগ লাভ করে গিয়েছে। গুরুদেবের কাছ থেকে বিনিময়ে পেয়েছি কেবল শূন্য আশীর্বাদ। এ কথাও বলে রাখা ভাল, মাঝে মাঝে গুরুদেব সম্বন্ধে এমন সব ভাসা ভাসা কথা শুনেছি, যা কদর্য। কিন্তু সে সব আমরা দুষ্ট লোকের মিথ্যা রটনা বলে উড়িয়ে দিয়েছি। কী মোহটানে বাঁধা পড়েছিলুম, কিছুতেই আমাদের গুরুভক্তি কমেনি।

আমরা শেষবার গুরুদেবের দর্শন করতে যাই মাসখানেক আগে।

গুরুদেব আমাদের দেখে বললেন, "বৎস, তোমরা এসেছ, ভাল করেছ। আমি এমন এক স্বপ্নাদেশ পেয়েছি যা পালন করতে গেলে তোমাদের সাহায্যের দরকার হবে।'

অবনী বললে, 'আমরা পতঙ্গের মতো তুচ্ছ। আপনার মতো মহাপুরুষকে আমরা কি সাহায্য করতে পারি?'

বলছি, গুরুদেব ছিলেন স্বল্পবাক আর কোনওরকম গৌরচন্দ্রিকা না করে তিনি বললেন, 'আজ তিনরাত্রি ধরে মহাকালী স্বপ্নে আমাকে আদেশ দিয়েছেন'—"

এইখানে হেমন্ত বাধা দিয়ে বললে, "শক্তিপদবাবু, একজটা স্বামী স্বপ্নে কি আদেশ পেয়েছেন তা আমি জানি। আপনারা তিনজনে যে তাঁর অনুরোধে বলির পশু অর্থাৎ মানুষ সংগ্রহে রাজি হননি, উল্টে পুলিসে খবর দেবার ভয় দেখিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন, তাও আমার অজানা নেই! একজটা স্বামীও যোগবলে আপনাদের সর্বনাশ করবেন বলেছেন, কেমন এই তো? তারপরের কথা বলুন—যা আমি জানি না!"

শক্তিপদ খানিকক্ষণ অবাক হয়ে হেমন্তের মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, "এত কথা আপনি জানেন? আশ্চর্য! কিন্তু এরও পরে তো আর বেশি কিছু বলবার নেই!"

—"আছে বৈকি! একজটা স্বামী কি স্বপ্নাদেশ পালন করতে—অর্থাৎ নরবলি দিতে আরম্ভ করেছেন?"

—"না। তাহলে আমরাও পুলিসে খবর দিতুম। আসছে কালীপুজোর রাত্রে তাঁর প্রথম নরবলি দেবার কথা।"

—"বেশ। এইবারে কলকাতার এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আপনার মতামত জানতেচাই।"

—"অবনী আর বিধু কেমন করে মারা পড়েছে, তা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কেবল খবরের কাগজে আমি দুই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের কথা পাঠ করেছি। তবে একটা বিষয়ে আমার খটকা লেগেছে আর নিজের জন্য যথেষ্ট ভয়ও হয়েছে।"

—"কি রকম?"

—"গুরুদেব আমাদের সর্বনাশ করবেন বলেছিলেন, সে কথা আমি ভুলিনি। আমার সন্দেহ হচ্ছে, এই দুই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে হয়তো গুরুদেব কিংবা তাঁর শিষ্যদের কোনও যোগাযোগ আছে।"

—"আপনার এ রকম সন্দেহের কারণ?"

—"কারণ, গুরুদেবের শিষ্যরা কলকাতায় এসে হাজির হয়েছে।"

—"তাই নাকি? আপনার সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছে?"

—"না। মাঝে আমি দিন চারেকের জন্যে কলকাতার বাইরে গিয়েছিলুম। ফিরে এসে বাড়ির লোকের মুখে শুনলুম, একদল সন্ন্যাসী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, আমি কলকাতায় নেই শুনে চলে গিয়েছে।"

—"কি করে জানলেন তারাই আপনার গুরুভাই?"

—"কারণ, গুরুদেবের শিষ্যরা ছাড়া দল বেঁধে আর কারা আমার বাড়িতে আসবে?"

—"সেটা কোন তারিখে?"

—"ঠিক তার পরের দিনেই অবনী আর সিধু মারা পড়েছে।"

হেমন্ত খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বললে, "শক্তিপদবাবু, সন্ন্যাসীরা কেন এসেছিল জানেন?"

—"ঠিক জানি না।"

—"তারা জানতে এসেছিল, নরবলি সম্বন্ধে আপনি মত পরিবর্তন করেছেন কিনা?"

—"তাদের সঙ্গে দেখা হলে বলতুম—না, আমি মত পরিবর্তন করিনি।"

—"তাহলে পরের দিন আপনাকেও পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হত।"

—"কী বলছেন আপনি?"

—"হ্যাঁ, এই আমার অনুমান। জানেন শক্তিপদবাবু, ঠিক ওই দিনে সন্ন্যাসীরা অবনীবাবুর বাড়িতেও গিয়েছিল?"

—"তাই নাকি? কেন?"

—"এ খবরও পেয়েছি, অবনীবাবুর সঙ্গে কোনও কারণে তাদের ঝগড়া হয়, তারা খাপ্পা হয়ে চলে যায়। আমার অনুমান, নরবলি সম্বন্ধে অবনীবাবু মত পরিবর্তন করেননি বলেই সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর বিবাদ হয়। আমার বিশ্বাস, তারপর তারা গিয়েছিল বিধুবাবুর বাড়িতে, আর সেখানেও তারা মনের মতন উত্তর পায়নি। ফল—পরদিনেই অবনী আর বিধুবাবুর মৃত্যু!"

—"কি ভয়ানক!"

—"আপনি যে তারিখ বললেন তাইতেই বোঝা যাচ্ছে, সন্ন্যাসীরা ওই দিনেই আপনারও বাড়িতে গিয়েছিল। আপনিও যদি তাদের বিপক্ষতা করতেন, পরদিন তাহলে অবনী আর বিধুবাবুর সঙ্গে আপনাকেও পরলোকে প্রস্থান করতে হত। কিন্তু আপনি যে এখনও সশরীরে আমাদের সামনে বিদ্যমান আছেন, তার কারণ হচ্ছে প্রথমত, সন্ন্যাসীরা আপনার মত জানতে পারেনি; দ্বিতীয়ত, তারা খবর পেয়েছিল, আপনি তাদের নাগালের—অর্থাৎ কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছেন।"

বিষম আতঙ্কে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে শক্তিপদ বললে, "বলেন কি হেমন্তবাবু! এতক্ষণ পরে আমি আপনার বিজ্ঞাপনের অর্থ বুঝতে পারলুম।"

—"যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে, কিন্তু এইবারে আমরা সাবধান হব। একজটা স্বামী যোগবলে আপনাদের সর্বনাশ করবেন বলেছিলেন, এ কথার অর্থ কি?"

—"জানি না। গুরুদেবের কিছু কিছু অলৌকিক শক্তি দেখে বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু এটাও জানা কথা যে, অনেক সময়ে ম্যাজিককেও অলৌকিক ব্যাপার বলে ভ্রম হয়!"

—"সন্ন্যাসীদের কলকাতায় আস্তানা কোথায়?"

—"গড়িয়াহাটা থেকে খানিক তফাতে জঙ্গলের ভেতরে একটি পুরনো ভাঙা কালীমন্দির আছে। একজটা স্বামীর অনেক চ্যালা সেইখানে এসে থাকেন। কলকাতায় সন্ন্যাসীদের আর কোনও আস্তানা আছে বলে জানি না।"

—"আচ্ছা, সে খোঁজ আমরা নেব। কালি-কলম নিয়ে বসুন দেখি! আমার কথামতো আপনাকে একখানি চিঠি লিখতে হবে।"

শক্তিপদ বিস্মিত চোখে হেমন্তের মুখের পানে তাকালে। কিন্তু কোনও প্রতিবাদ না করে কালি-কলম নিয়ে বসল।

হেমন্তের কথামতো যে পত্রখানা লেখা হল, তা হচ্ছে এই :

শ্রীশ্রীএকজটা স্বামীজি সমীপেষু,

প্রভু,

আমি যখন কলিকাতায় ছিলাম না, তখন আপনার কয়েকজন শিষ্য আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। ইহার কারণ কি জানিনা। এখন আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছি। আপনার কোনও আদেশ থাকিলে অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে বাধিত হইব।

প্রভুর চরণে আর একটি নিবেদন করিতেছি। মহাকালীর স্বপ্নাদেশ মানিবার ইচ্ছা আমার নাই। আপনার অভিপ্রায়ের কথাও শীঘ্রই পুলিসকে জানাইতে চাই। ইতি

সেবক—শ্রীশক্তিপদ মজুমদার

হেমন্ত উৎসাহিতভাবে বললে, "সন্ন্যাসীরা যদি গড়িয়াহাটার কাছে থাকে, চিঠিখানা কাল বৈকালের মধ্যেই পাবে।"

সতীশবাবু এতক্ষণ পরে মুখ খুলে বললেন, "তারপর?"

"তারপর? অবনী আর বিধুবাবুর বাড়িতে রাত্রে যে বা যারা হানা দিয়েছিল, শক্তিপদবাবুর বাড়িতেও তার বা তাদের আসবার সম্ভাবনা আছে—অবশ্য, এ ব্যাপারের সঙ্গে সত্যই যদি সন্ন্যাসীদের কোনও যোগাযোগ থাকে!"

শক্তিপদ শিউরে উঠে বললে, "কি সর্বনাশ! আপনি কি আমাকেও যমালয়ে পাঠাতে চান?"

—"মোটেই নয়, যম-দ্বার থেকে আপনাকে ফিরিয়ে আনতে চাই। কাল আপনাকে সপরিবারে আমার আতিথ্য স্বীকার করতে হবে।"

—"আমাকে? সপরিবারে?"

—"হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ। কাল সন্ধ্যার আগেই আপনি সপরিবারে আমার বাড়িতে এসে রাত্রি যাপন করবেন। আপনার বাড়ির ভার নেব আমরা।"

সতীশবাবু বললেন, "সুন্দর ফন্দি! কিন্তু এত সহজ চালে আমরা কি কিস্তিমাত করতে পারব?"

—"অনেক সময়ে বোড়ের চালেই দাবা মরে। সতীশবাবু, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ মামলাটার মধ্যে এমন কোনও অদ্ভুত, অজানা রহস্য আছে, যা সাধারণ গোয়েন্দার ধারণার বাইরে। তাই সম্পূর্ণ নূতন দিক দিয়ে এই মামলাটাকে দেখবার চেষ্টা করছি। শেষ পর্যন্ত যদিও-বা রহস্য ভেদ করতে পারি, আসামীদের আইনের কবলে আনতে পারব কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

—"হত্যাকারীকে জানতে পারলেও?"

—"হত্যাকারীকে জানতে পারলেও। যথার্থ আসামী হয়তো হত্যাকারী নয়।"

—"তাহলে সে কি কোনও দূতকে পাঠায়?"

—"ধরুন তাই। কিন্তু এ হচ্ছে এমন ভয়াবহ মৃত্যুদূত, কোনও কারাগারের পাথরের দেওয়ালও তাকে ধরে রাখতে পারবে না। অন্তত আমি সেই সন্দেহ করছি। আমার সন্দেহ মিথ্যা হতেও পারে।"

সতীশবাবু হতাশভাবে বললেন, "মশাই, আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনার সঙ্গে আজ আমার প্রথম পরিচয় নয়, নইলে আপনাকে আমি পাগল বলে মনে করতুম। যাক ও কথা। এখন আমাদের কি করতে হবে বলুন।"

—"আমি, আপনি আর রবীন, আমাদের দল হবে কেবল এই তিনজনকে নিয়ে। আমরা আশ্রয় নেব শক্তিপদবাবুর বাড়ির আশেপাশে কোথাও।"

—"আর, ভূপতি?"

—"ঠিক বলেছেন, এ মামলার ভার পেয়েছেন ভূপতিবাবু। তাঁকে দলে না নিলে তিনি আবার অভিমান করতে পারেন!"

—"আমাদের সঙ্গে জনকয় পাহারাওয়ালা নিলে ভাল হয় না? হত্যাকারীর যে অমানুষিক শক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে—"

—"তার কাছে লালপাগড়িদের সব জারিজুরি ব্যর্থ হওয়াই সম্ভব। তবু ইচ্ছা যদি করেন তাদের নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু তাদের তফাতে লুকিয়ে রাখবেন আর বলে দেবেন যে, সঙ্কেত-বাঁশি না বাজালে তারা যেন কিছুতেই আত্মপ্রকাশ না করে।"

শক্তিপদর মুখ তখন মড়ার মতো সাদা হয়ে গেছে। তাকে উৎসাহ দেবার জন্যে সতীশবাবু বললেন, "আপনার কোনও ভয় নেই মশাই! আপনি এখানে নিরাপদেই থাকবেন, কারণ, হত্যাকারীরা এ ঠিকানা জানে না। আপনার বিপদের ভার গ্রহণ করব আমরাই।"

দশম

ভূপতির ক্ষুধা সর্বদাই জাগ্রত

শক্তিপদর বাড়ির সদর দরজায় ঢুকতে গেলে ছোট্ট একটি জমি পার হতে হয়। জমির উপরে দু'টি গাছ আছে—একটি জাম, আর একটি কাঁঠাল গাছ। সেই দুই গাছের মাঝখান দিয়ে পথ।

জমির এপারে রাজপথ। তারও এপাশে একখানা প্রায় সম্পূর্ণ তিনতলা বাড়ি, এখনও তার ভিতরে-বাহিরে বালির কাজ আরম্ভ হয়নি—বাড়ির নিচে থেকে উপর পর্যন্ত মিস্ত্রীদের বাঁশের ভারা বাঁধা। স্থির হয়েছে, এই বাড়ির দোতলার একখানা ঘরের ভিতরে আশ্রয় নেবে হেমন্ত ও তার সঙ্গীরা।

যাদের অভ্যর্থনার জন্যে আজ তাদের এখানে আগমন, ব্ল্যাক আউট ও রাতের আঁধারে গা ঢেকে কখন যে তারা শক্তিপদর বাড়ির সদর দরজার সামনে গিয়ে সাংঘাতিক অভিনয় আরম্ভ করবে, কেউ তা বুঝতে পারবে না। যথাসময়ে তাদের উপস্থিতি আবিষ্কারের জন্যে হেমন্ত এক সহজ, কিন্তু ফলপ্রদ কৌশল অবলম্বন করলে। সন্ধ্যার পরেই কুলিদের দ্বারা ছোট্ট জমিটুকুর উপরে প্রায় একহাত পুরু করে বিছিয়ে রাখলে রাশি রাশি শুকনো পাতা! যে কেহ আসুক, মড়মড় ধ্বনি না জাগিয়ে নিঃশব্দে বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারবে না।

সতীশবাবু বললেন, "ছোট ছোট ব্যাপারে আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে মুগ্ধ হতে হয়! আজ এখানে পাহারাওয়ালার কাজ করবে শুকনো ঝরাপাতারা! চমৎকার!"

এমন সময়ে মোটা ভুঁড়ি নিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে ভূপতির আবির্ভাব। তিনি এসে ঘনায়মান অন্ধকার ভেদ করে চারিদিকটা দেখবার চেষ্টা করে ভুরু কুঁচকে বললেন, "পাহারাওয়ালারা কোথায়? তাদের সাড়া পাচ্ছি না বড় যে?"

সতীশবাবু বললেন, "তারা তফাতে লুকিয়ে আছে।"

—"তফাতে? তারা কাছে থাকলেই ভাল হত না?"

হেমন্ত বললে, "না। হত্যাকারীর পথ আমি খোলা রাখতে চাই।...কেবল তাই নয়, আমি পাহারাওয়ালাদের প্রাণরক্ষা করতে চাই।"

—"মানে?"

—"হত্যাকারীর প্রকৃতি কিছু কিছু আপনারও তো জানা আছে! তারপরেও 'মানে' জানতে চাইবেন না।"

—"চাইব না কি রকম? আমাদের প্রাণের বুঝি কোনও দাম নেই?"

সতীশবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, "থামো ভূপতি, বাজে বোকো না! তোমাকে জবাই করবার জন্যে এখানে আনা হয়নি। আমরা থাকব ওই বাড়ির দোতলায়। এসো!"

সকলে সেই প্রায় সম্পূর্ণ বাড়ির দোতলায় গিয়ে উঠলেন। নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে দেখা গেল, এককোণে জ্বলছে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন।

ভূপতি খুঁতখুঁত করতে লাগলেন!—"মোটে একটা টিমটিমে হারিকেন! এর মানেই হয় না!"

হেমন্ত বললে, "একটু পরে এও নিবিয়ে দেওয়া হবে।"

—"ও বাবা! মানে?"

—"বলেন তো হত্যাকারীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে চার পাঁচটা লণ্ঠনও আনতে পারি।"

—"থাক মশাই, অতটা উপকার নাই-বা করলেন! আমার অন্ধকারই ভাল।"

ঘরটা বেশ বড়সড়। রাস্তার দিকে ছয়টা জানলা। কোনও জানলাতেই গরাদে নেই। তাদের ভিতর দিয়ে চোখ চালালে শক্তিপদর বাড়িটা আঁধারে ছায়া ছায়া দেখা যায়।

ভূপতি বললেন, "ঘরের কোণে ওটা আবার কি?"

হেমন্ত বললে, "ক্যামেরা।"

—"জানিনে বাপু, আপনার সবই যেন কেমনধারা! আমরা কি জন্যে এখানে এসেছি, শুনি? ছবি তুলতে, না খুনি ধরতে?"

—"হয়তো খুনিকে আমরা ধরতে পারব না!"

—"মানে?"

—"হয়তো খুনিকে ধরবার শক্তি আমাদের হবে না—ধরবার আগেই সে অদৃশ্য হবে!"

—"মানে?"

—"ভাবচি যদি পারি, তার একখানা ফোটো তুলে রাখব।"

—"এই অন্ধকারে?"

—"ফোটো উঠবে ফ্ল্যাশ-লাইটে।"

—"জানিনে বাপু!"

—"আপনার কিছু জানবার দরকার নেই। আমাদের জানবার কথা হচ্ছে, আপনার ক্ষিদে-টিদে পেয়েছে কি?"

ভূপতির দুই চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, "আজকালকার ছেলেদের মতো আমি ডিসপেপটিক নই। আমার ক্ষিদে সর্বদাই জাগ্রত।"

—"তাহলে ডানহাত বার করুন। এ কাজটা সময় থাকতে সেরে নেওয়া যাক।"

ভূপতি একগাল হেসে বললেন, "ভারি সমজদার মানুষ আপনি! এইখানে আপনার সঙ্গে আমার ভারি মেলে। পেটে খেলে, পিঠে সয়। কিন্তু এসে পড়েছি বেমক্কা জায়গায়, খাবারের ফর্দ নিশ্চয়ই খুব ছোট?"

—"নিশ্চয়ই বড় নয়। ফিস স্যালাড, চিকেন ওমলেট, চিকেন রোস্ট, কিমা কারি আর কাশ্মিরী পোলাও!"

—"বলেন কি, বলেন কি! এই মরুভূমিতে এ যে রীতিমতো সরস ভোজ! কই, কই দু'একখানা ডিশ ধীরে ধীরে ছুড়ে মারুন না!"

আহারাদি সমাপ্ত। খানিকক্ষণ হত্যাকারী সম্বন্ধে আলোচনা চলল। ভূপতি যতই শোনেন, ততই মুষড়ে পড়েন। মাঝে মাঝে খাবারের শূন্য পাত্রগুলোর দিকে করুণ চক্ষে তাকিয়ে ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে চেয়ে রবীন বললে, "হেমন্ত, রাত এগারটা।"

—"তাহলে আলো নেবাও।"

ঘর অন্ধকার—বাইরেও চোখ প্রায় অচল। কেবল আকাশে জেগে আছে আলোকের ম্লান স্মৃতি মাত্র।

ভূপতি সকলের অগোচরে চুরি করে একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্যে দেওয়ালে ঠেস দিলেন। তিনি হেমন্ত ও রবীনের জন্যে নির্দিষ্ট চিকেন রোস্ট আর ফিস স্যালাড পর্যন্ত নিজের পাতে টেনে নিয়েছেন। আর কাশ্মীরী পোলাও এত বেশি পেটে ঠেসেছেন যে সকলেরই ভাগে কম পড়ে গিয়েছিল। এর পরে মানুষের আর সজাগ হয়ে থাকা অসম্ভব।...সতীশবাবু মৃদুস্বরে হেমন্ত ও রবীনের সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন।...

রাত বারটা। ইতিমধ্যে গ্যাসের ক্ষীণ শিখাগুলো একেবারে নিবিয়ে দিয়ে গেল—পুরো ব্ল্যাক আউট! রাজপথে নেই জনপ্রাণীর পদশব্দ। অন্ধকার আর অন্ধকার! রাস্তার ধারের বাড়িগুলো যেন অধিকতর নিবিড় অন্ধকারের নিরেট প্রাচীর।

কী স্তব্ধতা—যেন শরীরী, যেন চেষ্টা করলে তাকে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরা যায়, যেন হিংস্র জন্তুর মতো সে বুকের উপরে বসে দম বন্ধ করে দিতে পারে।

সেই নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতার অদৃশ্য অন্তঃপুরে বসে নিশীথিনী যেন একটানা গান গেয়ে চলেছে ঝিম ঝিম ঝিম ঝিম ঝিম ঝিম ঝিম ঝিম!

যারা প্রাণের কানে শুনতে পায়, তারাই বোঝে সেই মৃত্যুসঙ্গীতের অর্থ কি!

কিন্তু সেই ভয়ভরা মনদমানো স্তব্ধতাকেও যেন অস্থির করে তুলেছে, ভূপতির বিস্ময়কর নাসাযন্ত্রের অবিরাম ঘড়র ঘড়র ঘড়র ঘড়র গর্জন!

মানুষের অতটুকু নাক অত বেশি গর্জন করতে পারে? রবীন বিস্মিতভাবে সেই কথাই ভাবছিল। তারপর সে আর সইতে পারলে না, ভূপতিকে ধাঁ করে এক ধাক্কা মেরে বললে, "উঠুন ভূপতিবাবু! আপনার নাসিকার বেয়াড়া হুঙ্কার শুনলে খুনি আর এ পাড়া মাড়াবে না!"

ভূপতি ধড়ফড় করে উঠে বসে তাড়াতাড়ি রিভলবারে হাত দিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, "কি বললে পতিত, সে এসেছে? ভয় নেই, আমার নাক ডাকলেও আমি ভয়ঙ্কর জেগে থাকি।"

সতীশবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "চুপ করো ভূপতি, তোমার পতিত এখানে নেই।"

ঊর্ধতন কর্মচারীর কণ্ঠস্বর শুনেই ভূপতি প্রাণপণে সজাগ হয়ে বললেন, "ভুল হয়েছে স্যার, আমিও জানি, পতিতের ছুটি এখনও মঞ্জুর হয়নি—সে গিয়েছে পাজির পা-ঝাড়া একজটা স্বামীর আখড়ার ওপরে কড়া পাহারা দিতে!"

সতীশবাবু বললেন, "দোহাই তোমার, চুপ করো!"

এরপরে নাকডাকানো বা কথা বলা কিছুই চলে না। সুপিরিয়র অফিসারের হুকুম! ভূপতি সত্যসত্যই চুপ!

অন্ধকার—ঘুট ঘুট ঘুট! স্তব্ধতা থম থম থম! রাত গাইছে ঝিম ঝিম ঝিম ঝিম! কোথাকার একটা প্রকাণ্ড ঘড়ি আচম্বিতে বেরসিকের মতো চেঁচিয়ে উঠল—ঢং! একটা,—রাত একটা।

আকাশের তারাগুলো হঠাৎ যেন মহা আতঙ্কে সচকিত! তিন চারটে জোনাকি নিবে আর জ্বলে বাজাচ্ছিল আলো-আঁধারের নীরব নূপুর, হঠাৎ তারা এলোমেলো গতিতে উড়ে পালাল কে জানে কোথায়! অন্ধকারও যেন বিপুলদেহ এক আহত গরুড়ের মতো অসহ্য যাতনায় করতে লাগল ছটফট ছটফট! মৃত রাজপথও যেন কোনও বিপুল পদভরে জ্যান্ত হয়ে উঠল!

হেমন্ত ফিস ফিস শব্দে বললে, "সতীশবাবু!"

সতীশবাবু তেমনই স্বরেই বললেন, "শুনেছি!"

ভূপতি সজোরে রবীনের হাত চেপে ধরে শিউরে উঠে বললেন, "বাপরে! কিসের শব্দ?"

রবীন বললে, "চুপ!"

ধুড়ুম, ধুড়ুম, ধুড়ুম, ধুড়ুম! ওকি কারুর পদধ্বনি,—না, কম্পিত পৃথিবীর স্তম্ভিত আত্মার উপরে ভেঙে পড়ছে কোনও প্রচণ্ড উপগ্রহ? ও শব্দ আর এক রাত্রে শুনেছে হেমন্ত ও রবীন। আর এক রাত্রে, সেই রক্তাক্ত অসম্ভব রাত্রে!

কোথা থেকে তিন চারটে নিদ্রোত্থিত কুকুরের অতি কাতর, যেন নেতিয়ে পড়া আর্তনাদ ডাকল—ঘেউ ঘেউ ঘেউ!

থেমে গেল ঝিম ঝিম ঝিম ঝিম রাতের কণ্ঠস্বর! কেঁদে কেঁদে উঠল যেন স্তব্ধতা, কেঁপে কেঁপে উঠল কাতর অন্ধকার!

মড় মড় মড় মড়—শুকনো পাতাদের অন্তিম আর্তনাদ! কে চলছে তাদের পাণ্ডুর ভঙ্গুর দেহ মাড়িয়ে, মাড়িয়ে, মাড়িয়ে!

দপ করে জ্বলে উঠল ভীষণ তীব্র ফ্ল্যাশ লাইটের অতি ক্ষণিক বিদ্যুৎ দীপ্তি! ছিন্নভিন্ন আঁধার পটে সিকি সেকেন্ডের জন্যে জেগে উঠেই মিলিয়ে গেল কী এক অতিকায় অপচ্ছায়া— তাকে দেখা গেল এবং দেখা গেল না—তাকে বোঝা গেল, কিন্তু বোঝা গেল না! সঙ্গে সঙ্গেই সে কী গগনভেদী চিৎকার! সে কি গর্জন? সে কি আর্তনাদ? সে কি সিংহনাদ? সে কি? সে কি? সে কি?

আবার অতি—অতি—অতি—দ্রুত ধুড়ুম-ধুড়ুম ধুড়ুম-ধুড়ুম শব্দ,—সে কি পদশব্দ, না ভূমিকম্প?......কিন্তু কে এল, কে গেল?

একাদশ

বক্তা হেমন্ত

রাত তখনও ফুরোয়নি। বাইরে তখনও দুঃস্বপ্নের মতো অন্ধকার। শহর তখনও ঘুমন্ত। কিন্তু হেমন্তের বৈঠকখানার ভিতরটা আলোর আশীর্বাদে আনন্দময়।

মাঝখানকার বড় গোল টেবিলটা ঘিরে বসে আছেন সতীশবাবু, ভূপতি, রবীন ও শক্তিপদ। হেমন্ত দাঁড়িয়ে আছে টেবিলের উপরে দু'হাত রেখে।

হেমন্ত বলছিল, "আমি যা বলি, মন দিয়ে শুনুন। বিশ্বাস না হলেও দয়া করে প্রতিবাদ করবেন না। যে ঘটনাগুলো ঘটে গেল, আমার কথার সঙ্গে মনে মনে সেগুলো মিলিয়ে দেখুন। তাহলে নিজেদের মন থেকেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

প্রথম থেকেই আমার ধারণা হয়েছিল, বর্তমান মামলার সঙ্গে অলৌকিক রহস্যের সম্পর্ক আছে। কেন আমার এমন ধারণা হয়েছিল, তা যুক্তি দিয়ে বোঝাবার দরকার নেই, কারণ, তার প্রমাণ আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।

আমি বুঝলুম, যিনি এ মামলার কিনারা করতে চাইবেন, তিনি খালি গোয়েন্দা হলে চলবে না, তাঁকে আরও কিছু হতে হবে। গোয়েন্দার কাজ, সাধারণ অপরাধী ধরা। অলৌকিক রহস্যের মীমাংসা করবার শক্তি তাঁর নেই।

এই মামলার সাধারণ দিকটা খুবই সহজ। যে কোনও নিম্নশ্রেণীর পুলিস কর্মচারীরও সন্দেহ আর দৃষ্টি আকৃষ্ট হত সন্ন্যাসীদের দিকে। তিনি সন্ন্যাসীদেরই অপরাধী বলে সন্দেহ করতেন, কিন্তু তবু তাদের ধরতে বা স্পর্শ করতে পারতেন না। কারণ, তাদের ধরবার প্রমাণ কেবল মাত্র গোয়েন্দাগিরির দ্বারা পাওয়া অসম্ভব! এমন কি, আইনের সাহায্যেও তাদের অপরাধ প্রমাণিত হবে না। আমিও তাদের গ্রেপ্তার করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না, তবে আপনাদের কাছে তাদের অপরাধ যে প্রমাণিত করতে পারব এমন আশা আমার আছে।

প্রথমেই আমি দেখলুম, হাতির মতো বা তার চেয়ে উঁচু কোনও জীব,—যে সিংহের মতো গর্জন করে, যার হাত-পা মানুষের মতো, অথচ তীক্ষ্ণ আর বৃহৎ নখওয়ালা—এ হচ্ছে কল্পনারও অগোচর। এমন জীব একালে কি সেকালে—অর্থাৎ ইতিহাসপূর্ব দানব-জীবের যুগেও—কখনও সত্যিকার পৃথিবীর মাটির উপরে বিচরণ করেনি। অথচ এমনই একটা উদ্ভট জীবকে আমি খুব অস্পষ্টভাবে স্বচক্ষে দেখেছি। সুদর্শনবাবুও দেখেছেন। রবীন তার স্পর্শ পেয়েছে। আপনারা অন্তত তার আশ্চর্য হাত আর পায়ের ছাপ দেখে বিস্মিত হয়েছেন।

তার আসুরিক—এমন কি অলৌকিক শক্তির প্রমাণ পেয়েছি আমরা সকলেই।

তখন আমার একমাত্র প্রশ্ন হল, বাস্তব জগতে এমন অসম্ভব জীবের আবির্ভাব সম্ভবপর হল কেমন করে? এর সহজ উত্তর এসেছিল, ভূপতিবাবু আর পতিতের মুখ থেকে।—'এ হচ্ছে নাকি ভৌতিক কাণ্ড!'

সতীশবাবু আর রবীনের বোধহয় অজানা নেই, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই কিছু কিছু আনাগোনা করবার চেষ্টা আমি করি। এ আমার চিরকালের অভ্যাস। আর আমার মত হচ্ছে, প্রত্যেক গোয়েন্দারই এই অভ্যাস থাকা উচিত।

সাধারণ কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে স্পিরিচুয়ালিজম বা প্রেতবিদ্যা নিয়েও আলোচনা করেছি অল্পবিস্তর। কিন্তু কোনও কিম্ভূতকিমাকার প্রেত যে মানুষের হুকুমের দাস হয়ে যেখানে-সেখানে নরহত্যা করে বেড়ায়, প্রেতবিজ্ঞান আজ পর্যন্ত তার দৃষ্টান্ত দেয়নি। সুতরাং ধরে নিলুম, রামা-শ্যামা, যদু-মধু যেসব তথাকথিত কাল্পনিক ভূতের ভয়ে রাত্রে লেপ মুড়ি দিয়ে কেঁপে মরে, আমাদের হত্যাকারী সে শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। প্রেততত্ত্ববিদরা চক্রে বসে যেসব দুরাত্মার শরীরী প্রকাশ দেখেছেন, এই হত্যাকারী তাদের দল থেকেও আত্মপ্রকাশ করেনি। মোট কথা, একে প্রেতাত্মাই বলা চলে না।

তবে এ কী? এর অস্তিত্বের চাক্ষুষ প্রমাণ যখন পেয়েছি, একে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়াও চলে না। এ কে?

আবার ভাল করে প্রেতবিদ্যা নিয়ে নাড়াচাড়া আরম্ভ করলুম। হঠাৎ একটি নতুন তথ্য পেলুম।

অনেক বিখ্যাত প্রেততত্ত্ববিদের মত হচ্ছে, বিভিন্ন ভাবের আর চিন্তারও বিশেষ বিশেষ রূপ আছে। গভীর ধ্যান বা প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বিশেষ বিশেষ ভাবরূপকে মূর্তিমান করা যায়।

এই কথা প্রসঙ্গেই দু'তিনদিন আগে রবীনকে আমি বলেছিলুম, কালী-তারা-দুর্গা প্রভৃতি দেবী এক একটি বিশেষ ভাবের বিশেষ মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নন। হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা সিদ্ধসাধক, সাধনার দ্বারা তাঁরা অর্জন করেছেন অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি। আর সেই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে তাঁরা ইষ্টদেবতাদের মানসিক মূর্তিকে চোখের সামনে দেখতে পান জীবন্ত শরীরী রূপে।

ভাবতে লাগলুম, কোনও সাধু যদি শক্তি অর্জন করবার পর সাধনপথচ্যুত হয়ে দুষ্ট অভিপ্রায়ে ভীষণ কোনও হিংস্র ভাবকে জীবন্ত আর মূর্তিমান করতে চান, তাহলে সে চেষ্টাও তো অনায়াসেই সফল হতে পারে!

কথাটা শুনতে অদ্ভুত বটে, কিন্তু অসম্ভব নয়। অলৌকিক শক্তিশালী পাপাচারী বহু কাপালিকের কথা শোনা গিয়েছে। ভাবতে ভাবতে আমার সন্দেহ পরিণত হল দৃঢ়বিশ্বাসে। তারপর বিধুবাবুর ডায়েরির লেখাটুকু পড়ে আমার মন বলে উঠল, 'এক্ষেত্রেও যখন এক দুরাচার কাপালিকের সন্ধান পাওয়া গেল, তখন সকল সন্দেহ ধুলোর মতো উড়িয়ে দাও ঝোড়ো বাতাসে!'

সূত্র পেলুম—যদিও এ সূত্র আদালতে গ্রাহ্য হবে না। কিন্তু আদালতে প্রমাণিত হয় না বহু সত্যকথাই। আমরা সকলেই হিপ্‌নটিজম বা যোগনিদ্রা বা সম্মোহনবিদ্যার শক্তি দেখেছি। তাকে অলৌকিক শক্তি বললেও মিথ্যা হবে না। অপরাধের ক্ষেত্রে বহুবার নিশ্চিন্ত রূপে জানা গিয়েছে, দুষ্ট সম্মোহনকারীর ইচ্ছাশক্তির দ্বারা চালিত হয়ে অনেকে নরহত্যা বা চুরি করেছে, আদালত তবু সম্মোহনবিদ্যাকে সত্য জেনেও সত্য বলে মেনে নেয় না, সম্মোহনকারী শাস্তি পায় না।

আন্দাজ করলুম, পাপী একজটা স্বামী কোনও বিভীষণ ভাবরূপকে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা দেহী ও জ্যান্ত করে তুলেছে, আর তার দ্বারাই পথের কাঁটা সরাবার আশ্চর্য চেষ্টা করছে। সে বামাচারী কাপালিক, ধর্মোন্মাদের বশবর্তী হয়ে বারটি নরবলি দিতে চায়, কিন্তু অবনী, বিধু আর শক্তিপদ চান পুলিসে খবর দিয়ে তার এই ভীষণ ব্রত ভঙ্গ করতে। একজটা স্থির করেছে, এই তিনজনকেই বধ করবে। এমন কি, সে নিজের মুখেই বলেছে, এঁদের সর্বনাশ করবে—যোগবলের দ্বারা।

একজটার সম্বন্ধে সন্দেহ রইল না বটে, কিন্তু তবু আমার দুর্ভাবনা কমল না। এক্ষেত্রে কোন বিভীষণকে সৃষ্টি করা হয়েছে? তার প্রকৃতি আন্দাজ করতে পারি, কিন্তু তার আকৃতি কি? তার আকৃতি তো খালি আন্দাজ [illegible] চলবে না, গোয়েন্দার কাজে সর্বাগ্রে দরকার, চাক্ষুষ প্রমাণ। নইলে আর সমস্ত আন্দাজি কথাকেই লোকে বলবে, পাগলের আজগুবি প্রলাপ।

অনেক ভেবেচিন্তে যে উপায় আবিষ্কার করলুম, আপনারা তা জানেন। বিভীষণ যতই রাত-আঁধারে গা ঢেকে আসুক, ফ্ল্যাশলাইটে ফোটো তুললে তার ভয়াবহ মূর্তিকে অন্তত ক্যামেরার কারাগারে বন্দী করতে পারব—এই হল আমার সিদ্ধান্ত।

আজ সে এসেছিল। আমি তার ছবি তুলেছি—ডেভালপও করেছি। একটু পরেই সকলে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন সে কি প্রচণ্ড, ভৈরব মূর্তি!

আজকের অভাবিত কাণ্ড সম্বন্ধে আমার যা ধারণা, তাও বলে রাখি। যাকে পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের দৈহিক শক্তি বাধা দিতে পারে না, সেই বিভীষণ আজ হঠাৎ অমন গগনভেদী আর্তনাদ করে পালিয়ে গেল কেন?

প্রেততত্ত্ববিদরা যখন 'চক্রে' বসেন, তখন ঘর করে রাখেন অন্ধকার বা প্রায়ান্ধকার। তাঁদের মতে, যে শক্তিকে তাঁরা চোখের সামনে শরীরী দেখতে চান, তার উৎপত্তি হয় ইথারের কম্পন (vibration of ether) থেকে। সাধারণ আলোক সে সইতে পারে না, ফ্ল্যাশ-লাইটের মতো অতি প্রখর আলোকের তো কথাই নেই। এই বিশ্বাস আমারও ছিল বলেই সেই মূর্তিমান মৃত্যুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সাহস করেছিলুম।

তারপর শেষ কথা। বাইরে দেখছি, ভোরের আলো ফুটছে। শুনতে পাচ্ছি পাখিদের ঘুম-ভাঙানো গান। এখনই বোধহয় পতিত এসে একজটা স্বামীর আশ্রমের খবর দেবে। সে কোন শ্রেণীর খবর আনবে বলতে পারি না, তবে আমার একটি সন্দেহ হচ্ছে।

আপনারা "Casting the Runes" বলে ব্যাপারটার রহস্য জানেন?...জানেন না? অল্প কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছি।

'রুন' হচ্ছে ইউরোপের একরকম আদিম ভাষার নাম। এ ভাষা এখন মৃত। কিন্তু মধ্যযুগেও এ ভাষা চলিত না হলেও ইউরোপের যাদুকররা এই ভাষার সাহায্যে নাকি নানারকম রহস্যময় অপকর্ম করত। 'রুন' অক্ষরের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র লিখে তারা হয়তো কোনও কাল্পনিক দানবকে জীবন্ত আর মূর্ত করে তুলত। যাদুকরের যে কোনও শত্রুকে সেই দানব বধ করে আসত। দেখছেন, কাল্পনিক ভীষণতাকে মূর্তিমান করবার চেষ্টা আর কাহিনী আছে পৃথিবীর সব দেশেই?

তারপর 'রুন' মন্ত্রে সঞ্জীবিত দানবের একটা বিশেষত্বের কথাও শুনুন। বিশেষজ্ঞরা তাকে বিফল করবার পদ্ধতিও জানতেন। কিন্তু সে বিফল হলেও তার মৃত্যু ক্ষুধা কমত না। তখন নিজের সৃষ্ট দানবের কবলে পড়ে প্রাণ দিতে হত যাদুকরকেই!

আজ আমাদের বিভীষণ ব্যর্থ হয়েছে। যদিও সে 'রুন' মন্ত্রে সৃষ্ট হয়নি, তবু তার অশান্ত রক্ততৃষ্ণা কেমন করে তৃপ্ত হবে, বুঝতে পারছি না।

আমার দরজায় একখানা গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দ হল না? উঠে দেখো তো রবীন, বোধহয় শ্রীমান পতিতপাবন আসছেন রিপোর্ট দাখিল করতে।"

দ্বাদশ

পতিতের রিপোর্ট

হ্যাঁ, পতিতই বটে! কিন্তু কী তার চেহারা! তার চোখ দু'টো উদভ্রান্ত, মুখের ভাব কাঁদো-কাঁদো, দেহ কাঁপছে থর থর করে! জামাকাপড় ছেঁড়াখোঁড়া, চুল উস্কোখুস্কো।

ভূপতি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "পতিত, পতিত, কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে নাকি? তোমার অত শখের টেরি গেল কোথায় হে?"

পতিত ধপাস করে একখানা চেয়ারের উপর বসে পড়ে অর্ধ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, "আর সখের টেরি! স্যর, স্যর, ছুটির দরখাস্ত করেছিলুম, কিন্তু ছুটি দিলেন না কি আমাকে যমালয়ে পাঠাবার জন্যে?"

ভূপতি বললেন, "কিন্তু তুমি তো যমালয়ে যাওনি পতিত। জলজ্যান্ত বেঁচে আছ!"

—"সেটা বাপের পুণ্যে স্যর, বাপের পুণ্যে! নইলে এতক্ষণে হত পতিতের পতন!"

সকলে হেসে উঠল।

—"আবার হাসছেন স্যর? আমি যা দেখেছি স্যর, তা দেখলে আর কোনও মানুষ বাঁচে না।"

হেমন্ত বললে, "পতিতবাবু, আপনার বীরত্ব আর সাহসকে আমরা ধন্যবাদ দিতে রাজি আছি—যদি তাড়াতাড়ি সংক্ষেপে সব কথা খুলে বলেন!"

—"বলছি স্যর, বলছি—সব কথা বলবার জন্যেই তো বেঁচে ফিরে এসেছি। আগে এক গেলাস জল দিন, নইলে এই কাঠ গলায় কথা কইতে পারব না!"

জলপান করে কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হয়ে পতিত যা বললে তা হচ্ছে এই :

"রীতিমতো জঙ্গলের মধ্যে এক পোড়ো কালীমন্দির। সেইখানেই পাঁচ ছয়খানা মাটির ঘর বানিয়ে আড্ডা গেড়েছে দশ-বারজন হিন্দুস্তানি সন্ন্যাসী। বেটাদের চেহারা দেখলেই ভয় হয়।

সন্ধের আগেই আমি পাহারাওয়ালাদের নিয়ে চুপিচুপি চারিদিক ঘেরাও করে ফেললুম। আমি নিজে গিয়ে উঠলুম একটা বটগাছের উপরে। সেখান থেকে আখড়ার সমস্তটা দেখা যায়।

তারপর সন্ধে হল, আর এল ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমারও চোখ হয়ে গেল অন্ধ। বলতে লজ্জা নেই স্যর, আমি একটু-আধটু ভূত বিশ্বাস করি। মনের ভিতর যা হচ্ছিল, তা আর বলবার নয়। কিন্তু কি করব—ডিউটি ইজ ডিউটি!

রাত প্রায় আটটার সময়ে দেখলুম, সন্ন্যাসীরা মন্দিরের সামনের জমিতে গোল হয়ে বসে আছে। তারা একটা ধুনি জ্বালিয়েছিল—তার ভিতর থেকে যদিও আগুনের শিখা বেরুচ্ছিল না, তবু জাগছিল কেবল একটু একটু আলোর আভা। সেই আভায় সন্ন্যাসীদের মূর্তি ঝাপসা ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছিল।...দেখা যাচ্ছিল বললেও ভুল হয়, একদল কালি দিয়ে আঁকা মানুষ যে ওখানে এসে বসে আছে, আমি খালি এইটুকুই আন্দাজ করতে পারছিলুম!

তারপরেই শুনতে পেলুম, সন্ন্যাসীরা একসঙ্গে বিড়বিড় করে কি মন্ত্র পড়ছে।

এইভাবে কেটে গেল কতক্ষণ! মশা আর নানারকম পোকামাকড়ের কামড়ে ছটফট করতে করতে আমি তখন ভাবছি, কতকগুলো বাজে সন্ন্যাসীর একঘেয়ে মন্ত্রপড়া শোনবার জন্যে কেন নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে এখানে পাঠানো হল, তখন হঠাৎ চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি, সন্ন্যাসীদের মণ্ডলের মাঝখান থেকে দুলে দুলে উঠছে যেন একটা বিদকুটে ছায়া!

খুব তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলুম, তবু বুঝতে পারলুম না, সে ছায়াটা কিসের! আরও আশ্চর্য এই যে, দেখতে দেখতে ছায়াটা ক্রমেই যেন ঘন হয়ে দেখাতে লাগল অন্ধকারের চেয়েও কালো অন্ধকারের মতো! তখন মনে হল, সেটা সাধারণ ছায়া নয়—মস্ত এক ছায়ামূর্তি! সে লম্বায় হবে

প্রায় তের-চৌদ্দ হাত। বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন না, ছায়া মূর্তিটাকে মনে হচ্ছিল যেন নিরেট, আর তার উপরদিকে জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল দুটো নীল আগুনের গোলা!

তারপরেই শব্দ শুনলুম হুম হুম হুম হুম। ঠিক যেন প্রকাণ্ড হাঁড়ির মধ্যে ফাটছে বুমবুম করে বোমার পরে বোমা! সন্ন্যাসীদেরও মন্ত্র পড়ার ধুম বেড়ে উঠল—সে তো মন্ত্র পড়া নয়, যেন সংস্কৃত ভাষায় তর্জন গর্জন!

বারবার আমার মনের অবস্থার কথা বলে আপনাদের আর বিরক্ত করব না। আমার মন যে কেমন করছিল, কথায় তা বোঝানোও অসম্ভব। ওইসব দেখেশুনে আমি বেঁচে ছিলুম, এইমাত্র! যাকে বলে—কণ্ঠাগতপ্রাণ।

হঠাৎ দেখি ছায়ামূর্তিটা অদৃশ্য! কানে শুধু শব্দ জাগল, ধড়াম ধড়াম ধড়াম ধড়াম! কার পায়ের চাপে হচ্ছে থরথর ভূমিকম্প।

ভয়ে আমি গাছের ডালের সঙ্গে একেবারে যেন মিশিয়ে রইলুম।

ধড়াম ধড়াম শব্দ আর ভূমিকম্প থামল, কিন্তু সন্ন্যাসীদের মন্ত্রপড়া থামল না! তখন তারা যেন ক্ষেপে গিয়ে দস্তুরমতো চিৎকার করে মন্ত্র পড়ছিল। তারপর যে আরও কতক্ষণ ধরে আমি সেই ভুতুড়ে মন্ত্রপাঠ শুনলুম তা জানেন খালি ভগবান। নিজের সময়জ্ঞান আমি একেবারে হারিয়ে ফেলেছিলুম।...

হঠাৎ আবার সেই বিশ্রী কাণ্ড! ধড়াম ধড়াম আওয়াজ আর সেই ভূমিকম্প! আমার খানিক তফাৎ দিয়ে বয়ে গেল যেন একটা দমকা ঝড়! গাছের পাখিরা পর্যন্ত আঁতকে চেঁচিয়ে উঠল।

তারপরেই যা হল, বর্ণনা করতে পারব না। মন্ত্রপাঠের ধ্বনি গেল থেমে, তার বদলে জাগল আচম্বিতে আকাশফাটানো সিংহনাদ, হুঙ্কারের পর হুঙ্কার, অট্টহাস্যের পর অট্টহাস্য, বীভৎস আর্তনাদ, অনেক লোকের হাঁউমাউ চিৎকার, হুটোপুটি ছুটোছুটির শব্দ! ভীষণ আতঙ্কে আমি গাছের উপর থেকে একেবারে মাটির উপরে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলুম!...

যখন জ্ঞান হল, তখনও আকাশ ভাল করে ফরসা হয়নি! ভয়ে ভয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে কোথাও কারুকে দেখতে পেলুম না। তখন সাহস করে পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে মন্দিরের কাছে এগিয়ে গিয়ে যা দেখলুম, সেও এক বীভৎস দৃশ্য!

একটা নিবে যাওয়া ছাই ভরা ধুনির চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ে আছে কোনও মানুষের খণ্ড-খণ্ড দেহ! কোথাও চূর্ণবিচূর্ণ মুণ্ড, কোথাও হাতের, কোথাও পায়ের, কোথাও বা দেহের অন্যান্য কুচি কুচি অঙ্গপ্রতঙ্গ! ঠিক এমনই দৃশ্য দেখেছিলুম অবনীবাবুর ঘরে ঢুকে!

মাটির ঘরের ভিতরে পাওয়া গেল কেবল দু'জন ভয়ে আধমরা সন্ন্যাসীকে—তাদের ধরে এনেছি। আর সবাই পিটটান দিয়েছে।

শুনছি ওই খণ্ড খণ্ড লাশ হচ্ছে একজটা স্বামীর!"

হেমন্ত বলে উঠল, "যা ভেবেছি তাই। হিংস্র দানব তার স্রষ্টাকেই সংহার করেছে।"

সতীশবাবু রুদ্ধশ্বাসে বললেন, "আপনি ফ্ল্যাশ লাইটে কার ফোটো তুলেছেন?

হেমন্ত পকেট থেকে একখানা প্লেট বার করে দেখালে। সকলে বিষম আগ্রহে তার উপরে ঝুঁকে পড়ল।

সতীশবাবু ভয়স্তম্ভিত স্বরে বললেন, "ভয়ানক, ভয়ানক। এ যে নৃসিংহ মূর্তি! মানুষের দেহে সিংহের মুণ্ড!"

হেমন্ত বললে, "হ্যাঁ। একজটা স্বামীর ইচ্ছাশক্তি জীবন্ত করেছিল এই মূর্তিকেই!"

রবীন বললে, "ভগবান তো নৃসিংহরূপ ধারণ করেছিলেন, পাপীকে শাস্তি দেবার জন্যে!"

"এ মূর্তি ভগবানের নয় রবীন, এ কেবল সেই মূর্তির বাইরেকার খোলস! এর মধ্যে আত্মাও ছিল না, পরমাত্মাও ছিলেন না, ছিল কেবল দুরাত্মার দুরন্ত ইচ্ছাশক্তি!"

রবীন বললে, "এই দানব এখন কোথায়?"

হেমন্ত বললে, "ভাবের রাজ্যে।"

ভূপতি বললে, "মানে?"

হেমন্ত বললে, "এ মূর্তি এখন হাওয়ার সঙ্গে মিশে গিয়েছে।"

পতিত সানন্দে নেচে উঠে বললে, "আপদ গেছে স্যর, আপদ গেছে! আর আমাকে তদন্তে যেতে হবে না! ওই মূর্তি এখনও জ্যান্ত থাকলে আমি আর ছুটির জন্যে দরখাস্ত করতুম না, পুলিসের চাকরিতে একেবারে ইস্তফা দিতুম!"

এখন যাঁদের দেখছি

প্রথম পরিচ্ছেদ

নির্মলচন্দ্র চন্দ্র

সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মিলনস্থানকে কেউ যদি 'আড্ডা' বলে মনে করতেন, তাহলে 'ভারতী' সম্পাদক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিবাদ করে বলতেন, "সাহিত্যিকদের আসরকে আড্ডা বলা উচিত নয়। আড্ডা শব্দটির মধ্যে কিছুমাত্র আভিজাত্য নেই। নানা স্থলে তার কদর্থও হতে পারে।"

মণিলালের মত সমর্থনযোগ্য।

কিন্তু আটত্রিশ নম্বর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে দুই যুগ আগে স্বর্গীয় গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের ভবনে প্রতিদিন বৈকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যে বৈঠকটি বসত, তাকে আড্ডা বললে অন্যায় হবে না। কারণ সেখানে এসে ওঠাবসা করতেন বটে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ, সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ও সঙ্গীতাচার্য করমতুল্লা খাঁ প্রমুখ তখনকার অধিকাংশ প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও নানাশ্রেণীর শিল্পিগণ, কিন্তু সেই সঙ্গে সেখানে আড্ডা মারতে আসতেন এমন সব ব্যক্তিও অনায়াসেই যাঁদের গোলা লোক বলে গণ্য করা চলে। জ্ঞানী-গুণী-নামীদের সঙ্গে তথাকথিত র‍্যাম-শ্যামের সম্মিলন গজেনবাবুর বৈঠকটিকে করে তুলেছিল রীতিমতো বিচিত্র। সে বৈঠকে বাদ পড়ত না কোনও কিছুই—জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত।

ওইখানেই প্রথম আলাপ হয় শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্রের সঙ্গে।

তক্তাপোশের উপর ফরাশ পাতা। মাথার উপরে ঘুরছে বিজলিপাখা। ফরাশের উপরে তাকিয়া এবং তাকিয়ার উপরে আড় হয়ে হেলান দিয়ে আলবালার নলে মাঝে মাঝে টান দিচ্ছেন এবং মাঝে মাঝে কথা কইছেন নির্মলচন্দ্র। দোহারা দেহ। গৌরবর্ণ। সৌম্য, প্রসন্ন মুখ। সম্প্রতি পত্রিকায় পত্রিকায় তাঁর যেসব প্রতিকৃতি বেরিয়েছে, তার ভিতর থেকে তখনকার নির্মলচন্দ্রের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না বললেও চলে। বহুকাল পরে কিছুদিন আগে মিনার্ভা থিয়েটারে এক সভায় নির্মলচন্দ্রের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। 'হেমেনদা' বলে তিনি যখন আমাকে সম্ভাষণ করলেন, তখন প্রথমটা তাঁকে আমি চিনতেই পারিনি। প্রৌঢ়ত্বের পরে দেহের এই দ্রুত অধঃপতন একটা ট্রাজেডির মতো। আমার পনের বৎসর আগেকার ফোটোর মধ্যে আমার আজকের চেহারা খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ এই পনের বৎসরের মধ্যে একটুও বদলায়নি আমার মন। মনে হয়, বিধাতার এটা সুবিচার নয়।

বন্ধুবান্ধবদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আলবলার নল হাতে করে নির্মলচন্দ্র ধীরেসুস্থে বসে বসে সকলের সঙ্গে গল্প করছেন এবং যখন-তখন ভিতরে থেকে বাড়ির গৃহিণী বৈঠকধারীদের জন্যে পাঠিয়ে দিচ্ছেন চায়ের পেয়ালা ভরা 'ট্রে'র পর 'ট্রে' আর রাশিকৃত পানের খিলি ভরা রেকাবির পর রেকাবি। পেয়ালা আর রেকাবি খালি হয়ে যায় ঘন ঘন।

ধোপদস্ত গিলে করা ফিনফিনে পাঞ্জাবি ও চুনট করা তাঁতের ধুতি এবং দামী জুতো পরে প্রবেশ করেন এক বিপুলবপু সুপুরুষ। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় কোনও ফুর্তিবাজ শৌখিন

যুবক—আসলে কিন্তু তিনি হচ্ছেন পৃথিবীখ্যাত প্রত্নবিদ্যাবিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মৌখিক ভাষণেও থাকে না প্রত্নতত্ত্বের ছিটেফোঁটা, বরং জাহির হয় অল্পবিস্তর খিস্তিখেউড়!

আসেন নরহস্তীর মতো বিশাল চেহারা নিয়ে আমাদের 'চিদ্দা'—জনসাধারণের কাছে যিনি হাস্যসাগর চিত্তরঞ্জন গোস্বামী। তাঁর জন্যে আসে শ্বেতপাথরের পেয়ালায় ঢালা চা এবং চায়ে চুমুক দিতে দিতে তিনি শুরু করেন ছেবলামিভরা চুটকি গালগল্প এবং কথার পর কথা সাজিয়ে কথার খেল। রাখালের মনের মতো জুড়ি। বৈঠকী হাস্যরসাভিনয়ে চিত্তরঞ্জন ছিলেন একেবারেই অতুলনীয়।

আসেন সর্বজনপ্রিয় 'দাদাঠাকুর' বা শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত। তিনিও একটি অসাধারণ চরিত্র। তাঁর একটি হাসির রচনায় পরিপূর্ণ পত্রিকা ছিল, নাম 'বিদূষক'। তিনি একাই ছিলেন 'বিদূষকে'র সম্পাদক, লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশক ও ফেরিওয়ালা। পথে পথে ঘুরে নিজের কাগজ নিজেই বিক্রি করতেন। অতি সাদাসিধে মানুষ। একহারা দেহ। টকটকে গৌরবর্ণ। নগ্ন পদ। গায়ে জামার বদলে চাদর। হাসিখুশি, গালগল্পে মাতিয়ে রাখেন সবাইকে।

একদিন তিনি বৈঠকে বসে আছেন, এমন সময়ে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তিনি বললেন, "এই যে, 'বিদূষক' শরৎচন্দ্র।"

দাদাঠাকুর তৎক্ষণাৎ পাল্টা সম্ভাষণ করলেন, "এসো এসো 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্র!" তার কিছুকাল আগে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাস বাজারে বেরিয়েছিল।

মুখের মতো জবাব পেয়ে শরৎদা নির্বাক।

এমনই নানা শ্রেণীর গুণীরা এসে আসর ক্রমে জাঁকিয়ে তোলেন। এবং তাঁদের মাঝখানে আসীন হয়ে আলবলার নল হাতে নিয়ে নির্মলচন্দ্র করতে থাকেন সকলের সঙ্গে সরস বাক্যালাপ। কেটে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। নেই কোনও ব্যস্ততা বা তাড়াহুড়ো। যে চেনে না সে মনে করবে, তিনি কোনও কমলবিলাসী, পরম আরামী ব্যক্তি—ধার ধারেন না কোনও ঝুঁকির। অথচ কত দিকে তাঁর কত কর্মশীলতা! তিনি বিখ্যাত আইনব্যবসায়ী, রাজনৈতিক এবং দেশের নেতা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কর্মসহচর, মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী। কলকাতার পৌরসভার সভ্য। বঙ্গীয় আইনসভার এবং ভারতীয় আইনসভার সদস্য হয়েছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আপাতত আমার আর কিছু বলবার নেই। বর্তমান প্রবন্ধমালার উদ্দেশ্যও নয়, কারুর জীবনকাহিনী বর্ণনা করা। আমি কেবল আঁকতে চাই এক একজন গুণীর এক একখানি রেখাছবি।

সে সময়ে বাংলাদেশের ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঘটছে চিত্তোত্তেজক ঘটনার পর ঘটনা। দেশব্যাপী অশান্তি, অবিচার ও নির্যাতিতের আর্তনাদ। কালাপানির ওপারে বসে ক্রুদ্ধ গর্জন করছে জনবুলের পোষা ব্রিটিশ সিংহ এবং তার প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে কন্যা-কুমারিকা পার হয়ে রাহুগ্রস্ত জম্বুদ্বীপে। ইংরেজ ভেবেছিল এ দেশে তার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত পাকা করে গাঁথা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই জীর্ণ ভিত যে ভিতর-ফোঁপরা হয়ে এসেছে, এ সন্দেহ তখনও সে করতে পারেনি। প্রদেশে প্রদেশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সন্ত্রাসবাদীরা—বিশেষ করে বাংলা দেশে। তার উপরে মহাত্মা গান্ধী শুরু করলেন অসহযোগ আন্দোলন—নিরস্ত্রের পক্ষে এক নূতন অস্ত্র। অহিংসার দ্বারা হিংসাকে দমন। একদিকে সন্ত্রাসবাদ আর

একদিকে অসহযোগ আন্দোলন, মাঝখানে পড়ে রক্তশোষক বিদেশি শাসকদের অবস্থা হল অত্যন্ত কাহিল। সিপাহী যুদ্ধের সময়ে সহস্র সহস্র অস্ত্রধারী সিপাহীরাও ইংরেজদের এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তুলতে পারেনি। তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেল। হন্তদন্ত হয়ে তারা অবলম্বন করলে দমননীতি। ভাবলে, জেলে পুরে, নির্বাসনে পাঠিয়ে ও বুলেট চালিয়ে ভেঙে দেবে দুরন্তদের মেরুদণ্ড।

সেই চিরস্মরণীয় মুক্তিসংগ্রামের যোদ্ধাদের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন, নির্মলচন্দ্র হচ্ছেন তাঁদেরই অন্যতম। এক একদিন এক একটি ঘটনার সংবাদ বিদ্যুতের মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে, আর নির্মলচন্দ্র এলেই আমরা চারিদিক থেকে সাগ্রহে তাঁকে ঘিরে বসি, তাঁর মুখ থেকে ভিতরের কথা শুনতে পাব বলে। তিনিও আমাদের আগ্রহ নিবারণ করতে আপত্তি করতেন না। বেশ গুছিয়ে গুছিয়ে আমাদের শোনাতেন তখনকার নানা রাজনৈতিক ঘটনার কথা। তাঁর মুখে আমরা সে যুগের প্রখ্যাত রাজনীতিজ্ঞদের ব্যক্তিগত জীবনেরও অনেক কথা শ্রবণ করেছি।

কিন্তু কেবল রাজনীতি, আইন ব্যবসায় বা দেশহিতকর বিবিধ কর্তব্য নিয়েই নির্মলচন্দ্র নিজেকে ব্যাপৃত রাখেননি। সাহিত্যিক না হয়েও তিনি সাহিত্যরসিক। নইলে কর্মব্যস্ততার ভিতর থেকে ছুটি নিয়ে যখন-তখন সাহিত্যিকদের সঙ্গে উঠতে বসতে আসতেন না। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ববন্ধন সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল। শরৎচন্দ্রও কিছুকাল রাজনীতি নিয়ে যায়পরনাই মাথা ঘামিয়ে ছিলেন। প্রায়ই গিয়ে হাজির হতেন নির্মলচন্দ্রের ভবনে। তাঁদের দু'জনের মধ্যে কে বেশি করে কার প্রেমে মশগুল হয়েছিলেন, সে কথা আমি বলতে পারব না।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও নির্মলচন্দ্রের দেখা পেয়েছি। তিনি প্রকাশ করেছিলেন একখানি দৈনিক পত্রিকা। বৈকালে দেখা দিত বলে তার নাম হয়েছিল 'বৈকালী'। বোধ করি সে হচ্ছে ঊনত্রিশ-ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। সম্পাদনায় তাঁকে সাহায্য করতেন শ্রী প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (পরে 'ভারত' সম্পাদক)। শ্রী পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁদের দলে ছিলেন বলে মনে হচ্ছে। কিছুদিন আমিও ছিলুম 'বৈকালী'র নিয়মিত নিবন্ধলেখক।

মাঝে মাঝে শখ করে 'বৈকালী' কার্যালয়ে বেড়াতে যেতুম। 'বৈকালী' কার্যালয় বলতে বুঝায় 'বসুমতী' কার্যালয়। 'বসুমতী সাহিত্যমন্দিরে'র দ্বিতলের দালানের একদিকে বসে কাজ করতেন 'বৈকালী'র কর্মীরা। এখন সে জায়গাটা ঘিরে নিয়ে হয়েছে 'বসুমতী'র বিজ্ঞাপন বিভাগের আপিস। 'বৈকালী' ছাপা হত 'বসুমতী' প্রেসেই।

সেইখানে আলাপ-পরিচয় হয় 'বসুমতী'র কর্ণধার স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি সংবাদপত্র চালনা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করলেন। তাঁর সঙ্গে হয়েছিল আরও কোনও কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা। এতদিন পরে সব কথা মনে পড়ে না। ইউরোপ থেকে 'দৈনিক বসুমতী'র জন্যে মস্ত বড় এক নতুন প্রেস এসেছে, একদিন তিনি আমাদের নিয়ে নিচে নেমে তাই দেখিয়ে আনলেন। বেশ সদালাপী মানুষ।

নাট্যকলার জন্যেও নির্মলচন্দ্রের মনের মধ্যে ছিল যথেষ্ট প্রেরণা। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে শিশিরকুমারের আবির্ভাবের ফলে গিরিশোত্তর যুগের বাংলা রঙ্গালয়ের পুরনো বনিয়াদ নড়বড়ে হয়ে যায়। তবে সে যাত্রা শিশিরকুমার এখানে স্থায়ী হতে পারেননি। সকলকে অভিভূত করে

তিনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্য হন ধূমকেতুর মতো। কিন্তু নাট্যরসিক বাঙালির মন তখন সচেতন হয়ে উঠেছে। অভিনয়ের নামে ছেলেখেলা নিয়ে ভুলে থাকতে তারা আর রাজি হল না। চাইলে সবাই নবযুগের অভিনব অবদান।

সেই চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে বাইরে থেকে যাঁরা বাংলা রঙ্গালয়ের অন্দরমহলে প্রবেশ করলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন নির্মলচন্দ্রও। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও বাংলা রঙ্গালয়ের অনুরাগী ছিলেন। মনে মনে তিনি এখানে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পও পোষণ করতেন, কিন্তু তা বিফল হয় তাঁর অকালমৃত্যুর জন্যে। দেশবন্ধুর অনুগামী নির্মলচন্দ্রও যে নাট্যকলারসিক হবেন, সেটা কিছু বিস্ময়কর নয়। তিনিও হলেন নবগঠিত আর্ট থিয়েটারের অন্যতম পরিচালক।

এই নব প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরা প্রথমেই বুঝে নিলেন, একান্তভাবে সেকেলে মালের বেসাতি আর চলবে না। চাই আধুনিকতা, চাই তাজা মুখ, চাই নূতন রক্ত। অতএব তাঁদের আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন স্বর্গীয় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় ইন্দু মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় তিনকড়ি চক্রবর্তী, শ্রী নরেশচন্দ্র মিত্র ও শ্রী অহীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি। সুফল ফলতেও বিলম্ব হল না। নাটক হিসাবে 'কর্ণার্জুন' কিছুমাত্র অসাধারণ না হয়েও কেবল নূতন রক্তের জোরেই একাদিক্রমে শতাধিক রজনী অভিনীত হবার গৌরব অর্জন করলে।

আর্ট থিয়েটারের সকলেই শিশিরকুমারের পক্ষে ছিলেন না। নিজের সম্প্রদায় নিয়ে তিনি যখন নাট্যজগতে পুনরাগমন করলেন, তখন তাঁরা সাধ্যমতো বাধা দিতে ছাড়েননি। কিন্তু ওখানকার অন্যতম পরিচালক হয়েও নির্মলচন্দ্র ছিলেন শিশিরকুমারের অনুরাগী বন্ধু। তাই শিশিরকুমারের যাত্রাপথ সুগম করবার জন্যে তিনি আর্থিক সাহায্য দান করতেও বিরত হননি।

সামাজিকতার দিকেও তিনি যথেষ্ট সচেতন। ক্রিয়াকর্মে বহু বন্ধুবান্ধবকে সাদর আমন্ত্রণ করতে ভোলেন না। একাধিকবার আমাকেও স্মরণ করেছিলেন। তাঁর রসালাপ শুনে ও ভূরিভোজন করে ফিরে এসেছি। ভূরিভোজন! এই 'রেশনে'র যুগে কথাটাকে আজব বলে মনে হয়।

একবার তাঁর একসঙ্গে জোড়া পুত্রলাভ হয়। তিনি ঘটা করে এক দোলযাত্রার দিনে স্টিমার-পার্টির আয়োজন করলেন। আমন্ত্রিত হলেন বহু বিখ্যাত ব্যক্তি। আমিও বিখ্যাত না হলেও উপেক্ষিত হইনি। যাত্রা শুরু হল সকাল বেলায়। ত্রিবেণী পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলুম সারাদিন কাটিয়ে। জলযানে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ, মুক্তবায়ু সেবন, বন্ধু-সম্মিলন, রসভাষণ, শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দে'র সঙ্গীত শ্রবণ এবং ভূরিভোজন। সেই আনন্দময় দিনটিকে আজও মনে করে রেখেছি।

সবদিক দিয়ে শিষ্ট, মিষ্ট ও বিশিষ্ট এই মানুষটি কলকাতার পুরাধ্যক্ষ বা মেয়র পদে বৃত হয়েছেন। নির্বাচকরা করেছেন যথার্থ গুণীর আদর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেরাইকেলার রাজাসাহেব

উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ও পাটনা প্রভৃতির মতো সেরাইকেলাও এতদিন ছিল একটি করদ রাজ্য। আকরে বৃহৎ নয়। সম্প্রতি ভারতের অন্তর্গত হয়েছে।

কিছুকাল আগে সেরাইকেলাকে বিহারের ভিতরে চালান করে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু তার উপরে আছে উড়িষ্যার ন্যায়সঙ্গত দাবি। কারণ সেখানকার বাসিন্দারা নিজেদের উড়িয়া বলেই মনে করে এবং উড়িয়া ভাষাতেই কথা কয়। বাংলাদেশের সঙ্গেও তার যথেষ্ট সংস্রব আছে, কারণ সে বাংলারই প্রতিবেশী এবং সেরাইকেলার বাসিন্দারা বাংলাভাষাও বেশ বোঝে।

কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিবেশী হলেও তের-চোদ্দ বৎসর আগেও আমি সেরাইকেলার নাম পর্যন্ত জানতুম না, কারণ তার কোনও বিশেষ অবদান বাংলাদেশের ভিতরে এসে পৌঁছয়নি।

তাই স্বর্গত প্রমোদ-পরিচালক হরেন ঘোষ যখন প্রস্তাব করলেন, "সেরাইকেলার রাজাসাহেবের কাছ থেকে আমন্ত্রণ এসেছে। ওখানকার স্থানীয় নাচ দেখতে যাবেন?" আমি প্রলুব্ধ হলুম না। বহুকাল আগে ইংলন্ডের এক যুবরাজের কলকাতা আগমন উপলক্ষে এখানে ময়ূরভঞ্জের পাইকদের নাচ দেখানো হয়েছিল এবং সে নাচ হয়েছিল অত্যন্ত লোকপ্রিয়। কিন্তু সেরাইকেলার নাচ কখনও দেখিনি বা তার কথাও কারুর মুখে শুনিনি। কাজেই অবহেলাভরে হরেনের প্রস্তাব প্রত্যাখান করলুম। পরের বৎসরে আবার এল রাজাসাহেবের আমন্ত্রণ। ইতিমধ্যে নৃত্যবিশেষজ্ঞ হরেন ঘোষের মুখে সেরাইকেলার ছৌ নাচের উজ্জ্বল বর্ণনা শ্রবণ করে মনের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে প্রভূত কৌতূহল। গ্রহণ করলুম দ্বিতীয়বারের আমন্ত্রণ। কলকাতা থেকেই রাজাসাহেবের অতিথিরূপে ট্রেনে গিয়ে আরোহণ করলুম।

ছৌ নাচ দেখলুম যথাসময়ে। পাহাড়, প্রান্তর, কান্তার ও নদীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝখানে শহর থেকে দূরে গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে মনুষ্যসৃষ্ট চারুকলার এত ঐশ্বর্য যে লুকিয়ে থাকতে পারে, এমন কল্পনা মনেও আসেনি। কেবল পরিকল্পনার মাধুর্যে ও বিস্ময়প্রাচুর্যে নয়, ছন্দসৌকুমার্যে, ভঙ্গি বৈচিত্র্যে ও কাব্যলালিত্যেও সেরাইকেলার এই ছৌ নৃত্য আমার চিত্তকে করে তুললে সমৃদ্ধ ও উৎসবময়। ভারতের অধিকাংশ প্রাদেশিক নৃত্যের মতো এ নাচ একদেশদর্শী নয়, মানুষের বিচিত্র জীবনকে এ দেখতে ও দেখাতে চেয়েছে সকল দিক দিয়েই। পৌরাণিক, আধুনিক, লৌকিক, আধ্যাত্মিক, ঐতিহাসিক, সাংসারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, কাল্পনিক ও বস্তুতান্ত্রিক তাবৎ চিত্রই ফুটে ওঠে এই নাচের ছন্দোবদ্ধ আঙ্গিক অভিনয়ের ভিতর দিয়ে। উদয়শঙ্করের আবির্ভাবের আগেই এমন এক সর্বতোমুখ নৃত্য বাংলাদেশের পাশেই সেরাইকেলার সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে লালিত হয়ে এসেছে, অথচ সে সংবাদ বাইরের কেহই পায়নি। বাংলা দেশে এই অপূর্ব নৃত্যের কাহিনী সর্বপ্রথমে প্রকাশিত হয় আমার দ্বারা সম্পাদিত 'ছন্দা' পত্রিকায়, সে হচ্ছে মাত্র এক যুগ আগেকার কথা।

ভারতনাট্যম, কথাকলি, মণিপুরী বা কথক প্রভৃতি নৃত্য প্রচুর প্রশস্তি লাভ করেছে, কিন্তু ওদের কোনটির মধ্যেই প্রকাশ পায় না আধুনিক যুগধর্ম, ওরা প্রাণপণে আঁকড়ে আছে অতীতকেই। আমরা ওদের দেখি, খুশি হই, উপভোগ করি, অভিনন্দন দিই, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার কোলে মানুষ হয়ে ওদের প্রাণের আত্মীয় বলে মনে করতে পারি না, কারণ ওদের মধ্যে খুঁজে পাই না বর্তমানের প্রাণবস্তু। এইজন্যেই উদয়শঙ্কর যখন অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রেখে নব নব পরিকল্পনায় আধুনিক মনের খোরাক জোগাবার ভারগ্রহণ করলেন, তখনই তিনি হয়ে উঠলেন আবালবৃদ্ধবনিতার প্রেয় স্বজন। তাঁরও বিশেষ গুণপনা এবং সৃষ্টিক্ষম প্রতিভার দিকে সর্বপ্রথমে বাংলা দেশের রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল মৎসম্পাদিত 'নাচঘর' পত্রিকাতেই।

কিন্তু উদয়শঙ্করের আগেও যে অতীতের ঐতিহ্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ না করেও গোঁড়ামির শৃঙ্খল ছিঁড়ে ভারতীয় নৃত্যকলার মধ্যে যুগোপযোগী নূতনত্ব আনবার চেষ্টা হয়েছিল, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই ছৌ নাচ। তবে সে সত্য বহুদিন পর্যন্ত সকলের অগোচরে থেকে গিয়েছিল চক্ষুষ্মান সমালোচকের অভাবে।

ছৌ নাচের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিপালক হচ্ছেন সেরাইকেলার রাজা শ্রী আদিত্যপ্রতাপ সিং দেও বাহাদুর। নাচ দেখবার পর তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হল। আমি বললুম, "রাজাসাহেব, সেরাইকেলার এমন একটা অপূর্ব অবদানের কথা বাইরের লোক জানে না। দুঃখের বিষয়, তাঁদের জানাবার জন্যে কোনও উল্লেখযোগ্য চেষ্টাও হয়নি।"

সেখানে আরও কেউ কেউ উপস্থিত ছিলেন। কে একজন বললেন, "এ নাচকে আমরা সেরাইকেলার নিজস্ব বলে মনে করি। একে দেশের বাইরে নিয়ে গেলে আরও অনেকেই এর নকল করতে পারে।" অর্থাৎ তাঁর ধারণা, সাত নকলে আসল খাস্তা হওয়ার সম্ভাবনা।

ভারতবর্ষে আর্টের কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই রকম সংকীর্ণ মনোবৃত্তি পোষণ করা হয়—বিশেষ করে 'ক্লাসিকাল' সঙ্গীতকলার। ওস্তাদরা সঙ্গীতের বিশেষ বিশেষ গুপ্তকথা বাইরে কারুর কাছে ব্যক্ত করতে চাননি, তা জানতে পেরেছে বংশানুক্রমে কেবল তাঁদের উত্তরাধিকারীরাই।

পরমাণু বোমার নির্মাণপদ্ধতি লুকিয়ে রাখা উচিত, কারণ তা সুলভ হলে পৃথিবী থেকে মনুষ্যজাতি লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ললিতকলা করে বিশ্বের কল্যাণসাধন। যা সর্বজনভোগ্য, তাকে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বন্দী রাখা স্বার্থপরতা।

উপরন্তু অনুকরণের দ্বারা শ্রেষ্ঠ আর্টের মহিমা কোনদিনই ক্ষুণ্ণ হয়নি। অননুকরণীয় হচ্ছেন কাব্যে রবীন্দ্রনাথ, চিত্রে অবনীন্দ্রনাথ, অভিনয়ে শিশিরকুমার, নৃত্যে উদয়শঙ্কর প্রভৃতি। অনুকারীরা যখনই এঁদের অবলম্বন করেছেন, হাস্যাস্পদ ছাড়া আর কিছুই হতে পারেননি। পরে আমি ছৌ নাচেরও ('শ্রীদুর্গা' নৃত্যের) অনুকরণ দেখেছি। কিন্তু সে অনুকৃতি দেখে আমার মনে পড়েছে চেরাগের তলায় অন্ধকারের কথা।

হরেন ঘোষের চেষ্টায় অবশেষে রাজা আদিত্যপ্রতাপের মত পরিবর্তন হয়। সেরাইকেলায় নির্মোক ভেঙে ছৌ নাচ প্রথমে কলকাতায় আসে এবং তারপর যায় ইউরোপেও।

সেরাইকেলার যে প্রতিবেশের মধ্যে ছৌ নাচ অনুষ্ঠিত হয়, দেশের বাইরে গিয়ে তার থেকে তাকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল। ছৌ নাচের স্বাভাবিক আসর হচ্ছে যাত্রার আসরের মতো, শিল্পীদের চারিদিকেই দর্শকরা আসন গ্রহণ করে মণ্ডলাকারে। আধুনিক নাচঘরের অপ্রশস্ত আবেষ্টনের মধ্যে তার আবেদন ও স্বাধীনতা কতকটা ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারে না। কিন্তু তবু এখানে এবং পাশ্চাত্য দেশেও ছৌ নাচ দেখে সবাই তুলেছিল ধন্য ধন্য রব। তাইতেই বোঝা যায় তার আবেদন হচ্ছে সর্বজনীন এবং তাকে প্রাদেশিক নৃত্য বলে গণ্য করা যেতে পারে না। আমাদের অধিকাংশ প্রাদেশিক নৃত্য সম্বন্ধে এমন কথা বলা যায় না। জন্মভূমির—বিশেষত ভারতের—বাইরে গেলে তাদের পক্ষে জনপ্রিয়তা অর্জন করা কঠিন হয়ে উঠবে। কারুর প্রধান ভাষা হচ্ছে মুদ্রা, কারুর ভঙ্গি এবং কারুর বা নূপুরের বোল। যারা অধ্যবসায় সহকারে সে সব ভাষা শেখেনি, তাদের কাছে মাঠে মারা যায় নাচের সৌন্দর্য।

ছৌ নাচ একটি বারংবার প্রমাণিত সত্যকে প্রমাণিত করেছে পুনর্বার। ললিতকলার মাধ্যমে কেবল ব্যক্তিবিশেষের নয়, কোনও অজানা দেশ বা জাতিও প্রখ্যাত হয়ে উঠতে পারে। পনের বৎসর আগে ক্ষুদ্র রাজ্য সেরাইকেলার নাম জানত কয়জন? কিন্তু ছৌ নাচের প্রসাদে সেরাইকেলার নাম আজ ভারতের সর্বত্র এবং ইউরোপেও সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। একেই বলতে পারি সাংস্কৃতিক দিগ্বিজয়।

রাজা আদিত্যপ্রতাপ এবং তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় বিজয়প্রতাপের তত্ত্বাবধানে যে সব ছৌ নৃত্য পরিকল্পিত হয়েছে, সংখ্যায় সেগুলি অসামান্য। ভারতনাট্যম ও কথাকলির নৃত্যসংখ্যা আমি জানি না, কিন্তু যে বিশ্ববিখ্যাত রুশিয় নৃত্যসম্প্রদায় পৃথিবীভ্রমণ করেছিল, তার চেয়ে ছৌ নাচের সংখ্যা অনেক বেশি। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে সেরাইকেলা নৃত্যসম্প্রদায় মোট একচল্লিশটি নাচ নিয়ে গিয়েছিল ইতালি, ফ্রান্স ও ইংলন্ডে। কিন্তু সেরাইকেলার নৃত্য তালিকা এর চেয়ে ঢের বেশি দীর্ঘ—বোধ করি শতাধিক হবে।

সাধারণত রাজা-মহারাজারা নিজেরাও শিল্পী হবার জন্যে আগ্রহপ্রকাশ করেন না, তাঁরা হন নানা কলাবিদ্যার পৃষ্ঠপোষকমাত্র। শিল্পীদের উৎসাহ দেন, অর্থসাহায্য করেন, তার বেশি আর কিছু নয়। কিন্তু সেরাইকেলা নৃত্যসম্প্রদায়ের মধ্যে রাজা এবং রাজবংশীয় অন্যান্য ব্যক্তিগণ শিল্পীরূপেই যোগদান করেন। রাজা আদিত্যপ্রতাপ কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র নন, নিজেও একজন নৃত্যশিল্পী এবং চিত্রবিদ্যাতেও সুনিপুণ। বিশেষজ্ঞ সমালোচকরা জানেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের দ্বারা যে সব মুখোশ গঠিত ও চিত্রিত হয়েছে, ললিতকলায় তা উচ্চস্থান অধিকার করে আছে। সেরাইকেলার নর্তকরা নাচের সময়ে মুখোস ব্যবহার করেন। অধিকাংশ মুখোশই রাজা আদিত্যপ্রতাপের নিজের হাতেই তৈরি। বিভিন্ন রসাশ্রিত নৃত্যনাট্যের পাত্র-পাত্রীদের চারিত্রিক বিশেষত্ব সেই সব মুখোশের উপরে ফুটে উঠেছে যথাযথ বর্ণের আলেপনে ও তুলির টানে চমৎকার ভাবে।

রাজভ্রাতা স্বর্গীয় কুমার বিজয়প্রতাপও ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী এবং উড়িয়া ভাষার একজন সুলেখক। তিনি কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন রাজাসাহেবের দক্ষিণ হস্তের মতো। সেরাইকেলার অধিকাংশ নৃত্যনাট্য পরিকল্পনা ও রচনা করেছেন তিনিই এবং সেই সঙ্গে নিয়েছেন নাচ শেখাবারও ভার।

স্বর্গীয় কুমার শুভেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন রাজাসাহেবের পুত্র ও সম্প্রদায়ের প্রধান শিল্পী। তাঁর মধ্যে ছিল প্রথম শ্রেণীর নৃত্যপ্রতিভা। শুভেন্দ্রনারায়ণের নাচ দেখে বিলাতের সমালোচক উদয়শঙ্করের সঙ্গে তাঁর তুলনা করেছিলেন। তাঁর রাধাকৃষ্ণ, ময়ূর, চন্দ্রভাগা, দুর্গা, নাবিক ও সাগর প্রভৃতি অমৃতায়মান নাচের কথা কখনও ভুলতে পারব না। আজ তিনি অকালে গিয়েছেন পরলোকে, কিন্তু আজও মনের মধ্যে জীবন্ত হয়ে আছে নৃত্যপর শুভেন্দ্রনারায়ণের লীলায়িত মূর্তি।

রাজাসাহেবের আরও দুই নৃত্যপটু পুত্র নৃত্যনাট্যে বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই রাজবংশের আর এক অসাধারণ নৃত্যশিল্পী হচ্ছেন কুমার শ্রী হীরেন্দ্রনারায়ণ। রৌদ্র ও বীর রসের নাচে তাঁর অতুলনীয় দক্ষতা।

বহু রাজপরিবারের কথা জানি, কিন্তু এমন শিল্পী রাজপরিবার আর দেখিনি। আমাদের দেশিয় নৃপতিদের বিলাস-ব্যসনের কথা পরিণত হয়েছে প্রবাদবচনে। কিন্তু এই এক অদ্বিতীয়

রাজপরিবার, যেখানে সকলেই অবহিত হয়ে থাকেন শিল্পসাধনায়। তাঁরা কেবল শিল্পী নন, প্রত্যেকেই কৃতবিদ্য, বিনয়ী ও সদালাপী। সেরাইকেলার রানীসাহেবও শিল্পী স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী। স্বর্গত পুত্র শুভেন্দ্রনারায়ণের জন্যে তিনি যে স্মৃতিসৌধের মডেল স্বহস্তে গড়েছিলেন, তা দেখেই আমি তাঁর শিল্পবোধের পরিচয় পেয়েছিলুম। সেরাইকেলার যুবরাজও নট এবং নাট্যকার। রাজা আদিত্যপ্রতাপের প্রেরণাতেই এই পরিবারের মধ্যে যে উপ্ত হয়েছে সাহিত্য ও ললিতকলার বীজ, এটুকু অনুমান করা যায় অনায়াসেই।

চৈত্র মাসে এখানে যে বসন্তোৎসব হয়, তার নাম 'চৈত্র-পর্ব'। গাছে গাছে পাখিরা গান গায়। বনে বনে ফুল ফোটে। চোখের সামনে জাগে তরুণ শ্যামলতা। সুগন্ধনন্দিত সমীরণে পাওয়া যায় যে আনন্দের ছন্দ, তারই প্রতিধ্বনি বাজতে থাকে নরনারীর অন্তরে অন্তরে। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে মিলে যায় অন্তঃপ্রকৃতি এবং ছৌ নাচের নূপুরে নূপুরে সেই মিলনেরই বাণী ধ্বনিত হয়ে ওঠে। তখন বাজে বংশী, বাজে মৃদঙ্গ এবং জাঁকিয়ে বসে নাচের সভা। সভানায়ক হন স্বয়ং রাজাসাহেব।

ছয়-সাত বৎসর আগে চৈত্র-পর্বের সময়ে শুভেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রাজাসাহেবের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে আমি দ্বিতীয়বার সেরাইকেলায় যাই এবং তাঁর অনুরোধে একটি বৃহৎ সভায় শুভেন্দ্রনারায়ণের নৃত্যকুশলতা নিয়ে আলোচনা করি। যথাসময়ে সেই আলোচনাটি 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে।

সেরাইকেলা থেকে সিনি স্টেশনে আনাগোনা করবার পথটিও আমার বড় ভাল লাগে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোহিতলাল মজুমদার

আমার বয়স তখন কত? ঠিক মনে নেই, তবে অর্ধশতাব্দী আগেকার কথা বলছি নিশ্চয়ই। এবং এটাও ঠিক, তখনও আমি কৈশোর অতিক্রম করিনি।

স্বর্গীয় ডক্টর সত্যানন্দ রায় ছিলেন আমার প্রতিবেশী ও দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। ছেলেবেলায় তাঁর চেয়ে ঘনিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সুহৃদ আমার আর কেউ ছিলেন না। সত্যানন্দ পরে বিলাতে যান এবং সেখান থেকে ফিরে এসে কলকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগে প্রধান কর্মচারীর পদে অধিষ্ঠিত হন।

সত্যানন্দের সঙ্গে সেই কিশোর বয়স থেকেই শুরু হয়েছিল আমার সাহিত্যসাধনা। বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ বিখ্যাত রচনা তখনই আমরা পড়ে ফেলেছি এবং বিলাত থেকেও আনাতুম বালকদের উপযোগী ভাল ভাল বই। তখনকার এক চমৎকার গ্রন্থমালার কথা আজও আমার মনে আছে, তা হচ্ছে বিখ্যাত ডবলিউ টি স্টেডের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'দি বুক ফর দি বের্নস'। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রখ্যাত কথাগ্রন্থগুলি ছোটদের উপযোগী করে পরিবেশন করা হত। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্যও ছিল যৎসামান্য।

সত্যানন্দ ও আমার, দুজনেরই ছিল একখানি করে হাতে লেখা পত্রিকা। সত্যানন্দ ছিলেন কেবল প্রবন্ধকার, কিন্তু আমি সমান বিক্রমে আক্রমণ করতুম প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা প্রভৃতি

বিভাগকে। লেখাগুলিকে অবশ্য ছাইভস্ম বললে অত্যুক্তি হবে না। যদিও আমার সেই হস্তলিখিত পত্রিকারই একটি গল্প দু' তিন বৎসর পরে ছাপার হরফে 'বসুধা' মাসিকপত্রে স্থান পায়। সেই-ই আমার প্রকাশিত প্রথম রচনা। আর এক বিষয়েও সত্যানন্দ আমার কাছে হেরে যেতেন। তিনি তুলি ধরতে পারতেন না, আমি পারতুম। (এবং আঁকতুম কেবল কাকের ছানা বকের ছানা)। কাজেই আমার পত্রিকা ছিল সচিত্র।

আমাদের সেই সাহিত্যসাধনার উদ্যোগ-পর্বে সত্যানন্দের বাড়িতেই প্রথম দেখি মোহিতলাল মজুমদারকে। সত্যানন্দের সঙ্গে তাঁরও কি যেন একটা দূর-সম্পর্ক ছিল। সে বয়সে আলাপ জমতে দেরি হয় না। বালকরা কথায় কথায় বন্ধু পায় এবং বন্ধু হারায় (আর বলতে কি সাহিত্যক্ষেত্রে তরলমতি বুড়ো খোকারও অভাব নেই)। মোহিতলাল সেখানে গিয়েছিলেন দুই-তিনবার। সে সময়ে কিরকম বিষয়বস্তু আমরা আলাপ্য বলে মনে করতুম, আজ আর তা স্মরণে আসছে না। মোহিতলাল সেই বয়সেই কাব্যকুঞ্জবনে প্রবেশ করেছিলেন কিনা, তাও আমি বলতে পারব না। অন্তত তাঁর মুখ থেকে এ সম্পর্কে কোনও কথা শুনেছিলুম বলে মনে হচ্ছে না। তবে তাঁর দিকে যে আমি আকৃষ্ট হয়েছিলুম, তাতে আর সন্দেহ নেই।

আমাদের সেই সাহিত্যের বেলেখেলাঘরেই মাঝে মাঝে আর একটি বালক আসতেন, পরে যিনি এখানকার সাহিত্য সমাজে বিশেষ আলোড়ন উপস্থিত করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন 'কল্লোল' সম্পাদক স্বর্গীয় দীনেশরঞ্জন দাস। কিন্তু তিনি তখন কালিকলম নিয়ে সুবোধ বালকের মতো ইস্কুলের লেখাপড়া ছাড়া আর কিছু করতেন বলে মনে হয় না।

বালক হল যুবক, কাঁচা হল পাকা। কেটে গেল কয়েকটা বছর। আমার নানাশ্রেণীর রচনা প্রকাশিত হয় 'ভারতী', 'নব্যভারত', 'মানসী', 'বাণী', 'ঐতিহাসিক চিত্র', 'অর্চনা', 'জন্মভূমি' ও অন্যান্য পত্রিকায়। সেই সময়ে একদিন আধুনালুপ্ত প্রখ্যাত বিদ্যায়তন 'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা'র ত্রিতলের ঘরে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখলুম কবির এক পরম সাধক মূর্তি। দেখলুম শয্যাগত, উত্থানশক্তিহীন বৃদ্ধ কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনকে। তাঁর দৃষ্টি প্রায় অন্ধ, সর্বাঙ্গ বাতে পঙ্গু, হাতে কলম পর্যন্ত ধরতে পারেন না, তবু নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যে প্রশান্ত আননে মুখে মুখেই তিনি রচনা করে যাচ্ছেন কবিতার পর কবিতা। কোনও কবিতার মধ্যেই নেই ব্যাধিজর্জর দেহের দুঃখ-বেদনার সুর, কোনও কবিতাতেই নেই অন্ধকারের ছোপ, প্রত্যেক কবিতাই হচ্ছে আলোর কবিতা, যার প্রভাবে হাহাকারও হয় নন্দিত ও নিস্তব্ধ। মন করলে নতিস্বীকার।

কবির রোগশয্যার পার্শ্বেই আবার দেখা পেলুম বাল্যবন্ধু মোহিতলালের।

তীর্থযাত্রীর মতো প্রায় প্রত্যহই যেতুম দেবেন্দ্রসদনে। প্রতিদিন না হোক, প্রায়ই সেখানে মোহিতলালের সঙ্গে দেখাশুনো হতে লাগল, এবং অবিলম্বেই আবিষ্কার করলুম তিনি তখন হয়েছেন কাব্যগতপ্রাণ। কেবল কবিতা-পাঠক নন, কবিতা-লেখকও—যদিও সাময়িক পত্রিকায় তাঁর কোনও কবিতা তখনও আমার চোখে পড়েনি। তিনি নিজেই স্বলিখিত কবিতা পাঠ করে শোনালেন। ভাল লাগল।

দিনে দিনে জমে উঠল আমাদের আলাপ, দৃঢ়তর হল আমাদের মৈত্রীবন্ধন। দেখা হলেই কবিতার প্রসঙ্গ, সময় কাটে কাব্যালোচনায়। কোনও কোনও দিন এক সঙ্গেই যাই কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি বা কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। সেখানেও হত নতুন নতুন

কবিতা শোনা, উঠত স্বদেশি-বিদেশি নানা কবি ও কবিতার প্রসঙ্গ। জীবন হয়ে উঠেছিল কবিতাময়। দু'জনের কেহই তখনও সংসারে লব্ধপ্রবেশ হতে পারিনি, কারুকেই ঝড়-ঝাপটাও সহ্য করতে হয়নি, তাই এটা আমাদের ধারণার বাইরে থেকে গিয়েছিল যে, কবিতা যতই মহত্তম হোক, জীবনের যাত্রাপথে তাকে সম্বল করে পথ চলতে হলে যথেষ্ট বিড়ম্বনার সম্ভাবনা আছে। মোহিতলালের মনের কথা বলতে পারি না, তবে নিজে আমি এ সত্যটি উপলব্ধি করেছি বহু বিলম্বে, অত্যন্ত অসময়ে। তিনকাল গিয়ে যখন এক কালে ঠেকে, তখন আর কেঁচে গণ্ডুষ করা চলে না।

'যমুনা' পত্রিকার কার্যালয়ে বসল আমাদের বৃহৎ আসর। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৈঠক হয়ে উঠল জমজমাট। সেখানেও সর্বদাই কাব্যকৌমুদীতে মন হয়ে থাকে প্রসন্ন। নিয়মিতভাবে আসা-যাওয়া করেন মোহিতলাল। তাঁর লেখনীও কবিতা প্রসব করে ঘন ঘন। তিনি কেবল লিখেই তুষ্ট থাকতে পারেন না, স্বরচিত কবিতা অপরকে শোনাবার জন্যেও আগ্রহ তাঁর উদগ্র। হয়তো সন্ধ্যা উতরে গিয়েছে। কলকাতার পথে গ্যাসের আলো জ্বলেছে। মোহিতলাল চলেছেন পদব্রজে। তাঁর পকেটে আছে একটি নূতন কবিতা। বুঝি সেটি তখনও কারুকে শোনানো হয়নি। হঠাৎ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। মোহিতলাল অমনি ফুটপাথের উপরে একটা গ্যাসপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর সেই জনাকীর্ণ পথকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনেই বন্ধুকে সামনে রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন।

'যমুনা' পত্রিকা উঠে গেল। সেখানেই বসল সাপ্তাহিক সাহিত্যপত্রিকা 'মর্মবাণী'র বৈঠক। সভ্যের সংখ্যা আরও বেড়ে উঠল। এলেন কথাশিল্পী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, এলেন কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ও আসতেন মাঝে মাঝে। করুণানিধান ও অন্যান্য কবিরাও আসতেন। সেইখানেই শ্রী কালিদাস রায়কেও প্রথম দেখি। মোহিতলাল আসতেন। তিনি তখন উদীয়মান কবি হিসাবে সুপরিচিত হয়েছেন।

অধিকাংশ বাংলা পত্রিকাই দীর্ঘজীবন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে না। খোঁটার জোর থাকলেও অকালমৃত্যু তাদের ছিনিয়ে নেয়। আমাদের সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস হচ্ছে ঘন ঘন জন্ম ও মৃত্যুর ইতিহাস। নাটোরাধীশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেও 'মর্মবাণী' আত্মরক্ষা করতে পারলে না। এক বৎসর পরে মাসিক 'মানসী'র সঙ্গে মিলে কোনরকমে তখনকার মতো মানরক্ষা করলে। এখন 'মানসী ও মর্মবাণী'ও অতীতের স্মৃতি।

'ভারতী' সম্পাদনার ভার গ্রহণ করলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে আহূত হলুম আমি। 'ভারতী' কার্যালয়েই বসল আমাদের নতুন বৈঠক—রবীন্দ্রনাথের ভক্ত না হলে সেখানে কেউ বৈঠকধারী হতে পারতেন না। সেখানেও মোহিতলাল যোগ দিলেন আমাদের দলে। এই সময়েই তাঁর কবিতাপুস্তক 'স্বপনপসারী' প্রকাশিত হয়।

মোহিতলাল আধুনিক কবি হলেও এবং তিনি আধুনিক যুগধর্মকে স্বীকার করলেও, তাঁর কবিতার মূল সুরের মধ্যে পাওয়া যাবে পুরাতন যুগেরই প্রতিধ্বনি। কি পদ্যে এবং কি গদ্যে তাঁর ভাষাও মেনে চলে অতীতের ঐতিহ্য। তথাকথিত নূতনত্ব দেখাতে গিয়ে কোথাও তিনি যথেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেন না। এই নূতনত্বের মোহে একেলে অনেকের কবিতা হয়ে ওঠে রীতিমতো উদ্ভট। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আধুনিক কবি এখনও এদেশে জন্মগ্রহণ করেননি। ভাবে

ও ভাষায় তাঁকে ডিঙিয়ে আর কেউ এগিয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোথাও উদ্ভট নন। শ্রেষ্ঠ কবিরা উদ্ভট হতে পারেন না। মোহিতলালেরও এ দোষ নেই।

কবিরূপে মোহিতলালের আসন যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে, তখন তিনি হাত দেন সাহিত্যের অন্য এক বিভাগে। পদ্যে নয়, গদ্যে। তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময়েই বুঝতে পারতুম, তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যবোদ্ধা। দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ তিনি কেবল সাগ্রহে অধ্যয়নই করেন না, অধীত বিষয় নিয়ে স্বাধীনভাবে যথেষ্ট চিন্তাও করেন। সমালোচক হবার অনেক গুণ পূর্বেই তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছিলুম, কিন্তু গোড়ার দিকে প্রকাশ্যভাবে তিনি সমালোচকের আসনের দিকে দৃষ্টিপাত করেননি, মশগুল হয়ে ছিলেন কবিতার প্রেমেই।

বাংলা দেশে আজকাল সাহিত্যপ্রবন্ধের এবং সমালোচনার অভাব হয়েছে অত্যন্ত। প্রবন্ধের দৈন্য বেড়ে উঠছে দিনে দিনে এবং যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তার অধিকাংশেরই মধ্যে থাকে না সাহিত্যরস। মাসিকপত্রগুলি হাতে নিলে দেখি, রাশি রাশি গল্প আর উপন্যাসের ভিড়ে দু'একটা চুটকি নিবন্ধ কোনরকমে কোণঠাসা হয়ে আছে। আগেকার ধারা ছিল আলাদা। আগে গল্প বা উপন্যাস নয়, পত্রিকার গৌরববর্ধন করত প্রবন্ধই। এদেশে যাঁরা শ্রেষ্ঠ সমালোচক ও প্রবন্ধকার বলে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের কেহই অতিআধুনিক যুগের মানুষ নন। গল্প ও উপন্যাস সাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ বটে, কিন্তু প্রবন্ধদৈন্য ও স্থায়ী সমালোচনার অভাব থাকলে কোনও সাহিত্যই উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হতে পারে না।

মোহিতলাল মানুষ হয়েছেন গত যুগেরই প্রতিবেশ-প্রভাবের মধ্যে। তাই অতিআধুনিকদের ছোঁয়াচ লাগেনি তাঁর মনে। তিনি এই সাহিত্যপ্রবন্ধের দুর্ভিক্ষের যুগেও অবহিতভাবে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে করে যাচ্ছেন প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ রচনা। প্রাচীন বয়সেও এ বিভাগে মোহিতলালের সাহিত্যশ্রম দেখলে বিস্মিত হতে হয়। আজকাল কবিরূপে নয়, সমালোচকরূপেই তাঁর দেখা পা'ওয়া যায় যখন তখন। তাঁর সব মতের সঙ্গে যে সকলের মত মিলবে, এমন আশা কেউ করে না। বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি হয় বিভিন্ন। কিন্তু নির্ভীক, নিরপেক্ষভাবে সাহিত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা রেখে যিনি নিজের কর্তব্য পালন করবেন, তাঁকে অনায়াসেই অভিনন্দন দেওয়া চলে।

বলেছি, প্রাচীন বয়সেও মোহিতলালের সাহিত্যশ্রম হচ্ছে বিস্ময়কর। কিন্তু যখন তিনি ঠিক বৃদ্ধত্ব লাভ করেননি, তখনই তাঁর মনে জেগেছিল নিরাশার সুর। ষোল বৎসর আগে ঢাকা থেকে একখানি পত্রে তিনি লিখেছিলেন : "ভাই হেমেন্দ্রকুমার, তোমার অতীত স্মৃতির আবেগভরা স্নেহপূর্ণ পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমাদের কাল এখন 'সেকাল' হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে যুগ এখনই কাব্যস্মৃতিময় হইয়া উঠিয়াছে। দুই চারিজন এখনও যাহারা এখানে-ওখানে ছড়াইয়া আছি, তাহাদের মধ্যে প্রাণের সূক্ষ্মতন্ত্রীর যোগ অদৃশ্য হইলেও দৃঢ় ও অটুট হইয়া আছে, বরং জীবনসায়াহ্নে প্রভাতের সেই অরুণ রাগ ক্রমেই করুণ ও কোমল হইয়া উঠিতেছে, তার প্রমাণ তোমার ও আরও দুই-একজন বন্ধুর চিঠি। তুমি জানো, সাহিত্য আমার ধর্মব্রত ছিল; যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, তাহার জন্য নির্মমভাবে নিজের সকল স্বার্থ, আত্মপ্রীতি ও মমতা সকলই বর্জন করিয়াছি। সেজন্য 'কত বান্ধব হয়েছে বিমুখ'। কিন্তু আজ আমি ক্লান্ত শ্রান্ত অবসন্ন, আমার শরীর একেবারে ভাঙিয়াছে, মনের উৎসাহ আবেগ আর

নাই, গত কয়েক মাস যাবৎ আমি লেখনীকর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। যদি একটু সুস্থ হইতে পারি, তবে হয়তো জন্মগত ব্যবসায় আবার কিছু কিছু করিতে হইবে। তুমি যে এখনও সমান উৎসাহে সাহিত্যব্রত উদযাপন করিতেছ, ইহা কম কৃতিত্বের কথা নয়। প্রার্থনা করি, তোমার আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হউক এবং আমাদের বিদায় গ্রহণের বহু পরেও গত যুগের সাক্ষীরূপে তুমি মাঝে মাঝে আমাদিগকে স্মরণ করিও। সেজন্যও তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করি'' প্রভৃতি।

কিন্তু মহাকালের কবলে 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান'—মোহিতলাল, না আমি? তারই যখন নিশ্চয়তা নেই, তখন মোহিতলাল ইহলোকে বিদ্যমান থাকতে থাকতেই বন্ধুকৃত্যটা সেরে ফেলাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কার্য। তিনি তো আমারই সমবয়সী, কার ডাক কবে আসবে, কে জানে?